সচিত্র
পারস্য উপন্যাস

সম্পাদনায়ঃ

সৈয়দ নূরুল হুদা

প্রতিভা বিকাশ
৫৩/২, নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

প্রকাশনায় :
মোঃ জাকির হোসেন
প্রতিভা বিকাশ
৫৩/২, নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

তৃতীয় সংস্করণ :
আগষ্ট—১৯৭২

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে :
তাওয়াক্কাল প্রেস
নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা—১

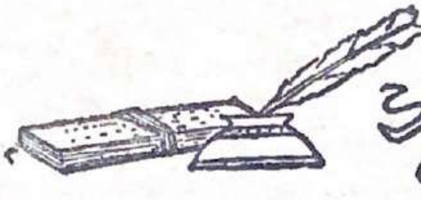

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অবতরণিকা ... ... ১—১১

আবুলকাসেমের কাহিনী ... ... ১২—২২

আবুলকাসেমের আদি বৃত্তান্ত ... ... ২৩—২৬

দার্দেনির কাহিনী ... ... ২৭—৩৪

সুলতান কন্যার কাহিনী ... ... ৩৫—৩৮

আবুলকাসেমের গুপ্তধন ... ... ৩৯—৪৭

বসরার উজীর ও তাঁর কন্যা বালকেশী ... ৪৮—৫২

উজীরের কারামোচন ... ... ৫৩—৫৪

বসরার রাজমন্ত্রী আবুল ফাতার ষড়যন্ত্র ... ৫৫—৫৯

দার্দেনির সাথে পুনর্মিলন ... ... ৬০—৬৫

রাজা রাজবনশাহ এবং চিরস্থানী রাজকন্যার কাহিনী... ৬৬—৭১

তিব্বত দেশীয় রাজা ও রাণীর কাহিনী ... ৭২—৮০

কার্বাসা উজীরের কাহিনী ... ... ৮১—৮৪

নৈমান রাজকন্যার কাহিনী (পুর্বানুবৃত্তি) ... ৮৫—৮৯

বহুরূপার জীবন বৃত্তান্ত ... ... ৯০—১০১

রাজবনশাহ ও চিরস্থানী রাজকন্যার কাহিনী (পরিশেষ) ১০২—১১৮

কৌলফ ও দেলেরার কাহিনী ... ... ১১৯—১৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

যুবরাজ কালেফের কাহিনী ... ... ১৪৫—১৪৮
ফয়জুল্লার কাহিনী ... ... ১৪৯—১৬৭
যুবরাজ কালেফের কাহিনী (পরিশেষ) ... ১৬৮—১৭৪
রাজা বদরুদ্দীন ও তার উজীর ... ... —১৭৫
আতাউল মুলক উজীরের কাহিনী ... ... ১৭৬—১৮৪
রাজকন্যা জেলেখার কাহিনী ... ... ১৮৫—১৯৪
ছয়ফলমুলুক রাজকুমারের কাহিনী ... ... ১৯৫—২০৮
মালেক তন্তুবায় ও সেরিনী রাজকন্যার কাহিনী ... ২০৯—২৩০
হর্মজ রাজার কাহিনী ... ... ২৩১—২৪৪
অরোয়া রূপসীর কাহিনী ... ... ২৪৫—২৫২
এডিস ও ডেহী দৈত্যের কাহিনী ... ... ২৫৩—২৫৮
বাদশাহ নাসিরদ্দৌলা, আবদুর রহমান ও তার প্রেমিকা জয়নবের কাহিনী ... ... ২৫৯—২৬২
রেপসিমার কাহিনী ... ... ২৬৩—২৬৭
আবুল ফাউরিসের প্রথম বাণিজ্য যাত্রা ... ২৬৮—২৭৫
আবুল ফাউরিসের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা ... ২৭৬—২৮৩
ফরোখনাজ রাজকন্যার বিবাহ ... ... ২৮৪—২৮৬

সচিত্র
পারস্য উপন্যাস

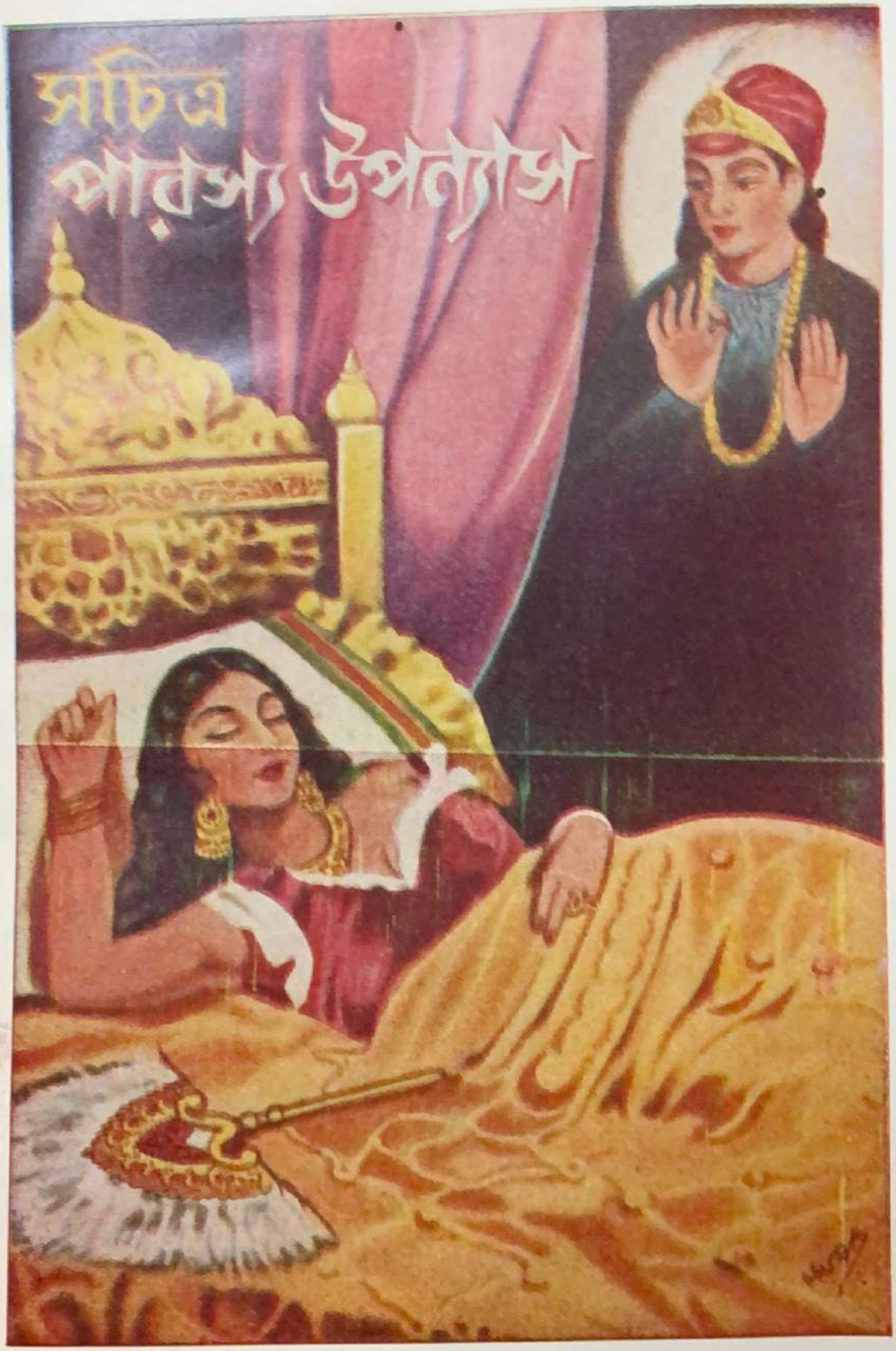
সচিত্র
পারস্য উপন্যাস

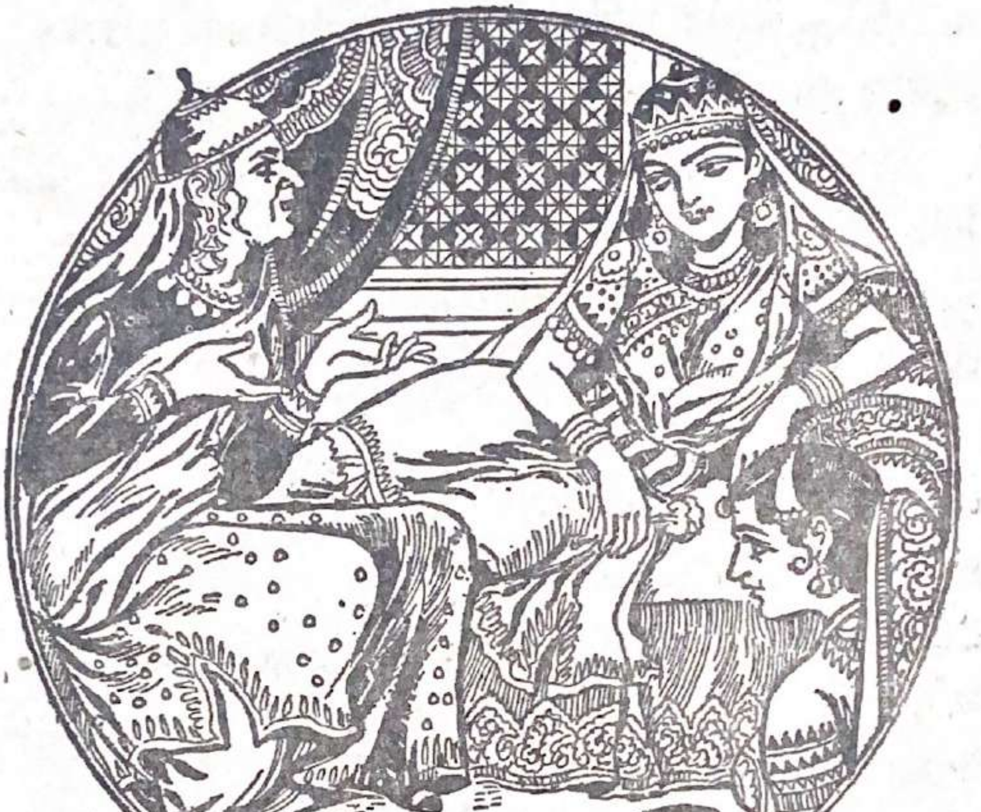

অবতরণিকা

অতি প্রাচীনকালে তওঙ্গরন্নবী নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ্ পারস্থ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর পরাক্রমে নিকটবর্তী রাজারা ত্রস্ত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। প্রজারাও বাদশাহকে পিতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

বাদশাহের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রও পিতার মতই বীর ও সর্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। আরবী, ফারসী, গ্রীক, ইটালিয়ান,

জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ হয়েও ঐ সব দেশের রাজনীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে একদা বিদেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

মেয়ের নাম ফরোখনাজ। তিনিও বড় ভাইয়ের মত নানা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। অশ্বারোহণেও তাঁর বিশেষ পটুতা দেখা যেত। তার ওপর তীর ধনুকের লক্ষ্যও ছিল তাঁর অব্যর্থ। প্রায়ই তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ায় বের হতেন। শীকার ছিল শাহজাদীর অত্যন্ত প্রিয়।

এসব গুণ ছাড়াও তিনি ছিলেন পরম রূপবতী। তাঁর রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা-দেশ থেকে বহু লোক বাদশাজাদীর পাণি-প্রত্যাশী হয়ে পারস্য রাজ্যে আসতেন। কানে শোনা রূপের খ্যাতি চোখে দেখে মিলিয়ে নেবার জন্য প্রবল আশায় পথে পথে তারা ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা জানতেন, বাদশাজাদীর মিছিল বেরুলেই তাঁদের আশা চরিতার্থ হবে।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন শাহজাদী ফরোখনাজ তাঁর দুই শত যৌবনবতী রূপসী কিন্নরীকে সঙ্গে নিয়ে তিন-চারিশত দেহরক্ষী সৈন্য দলে পরিবেষ্টিত হয়ে শোভাযাত্রা করে মৃগয়ায় যাত্রা করিতেন! এদিকে সুলতান-কন্যা ও তাঁর কিন্নরীদের দেখবার জন্যে পথের দুধারে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ ঘটত। পারস্য রাজ্যের প্রজারা ত বটেই, পৃথিবীর বহুদুর দেশ থেকেও বহু লোক আসত তাঁদের দেখে জীবন ধন্য করতে। ঘোড়ায় চড়ে যখন শাহজাদী ও তাঁর কিন্নরীরা এগিয়ে চলতেন, তখন পথের দু'পাশে যে হাজার হাজার লোকের ভীড় হতো

তাদের চাপে পথ বন্ধ হয়ে যেত। তখন ফরোখনাজের দেহরক্ষী সৈন্যরা তরবারি চালিয়ে পথ পরিষ্কার করতে বাধ্য হ'ত। এর ফলে শাহজাদীর দর্শন প্রত্যাশীদের অনেকেই হতাহত হয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দিনের পর দিন বাদশাজাদীকে দেখবার জন্যে লোকের ভীড় বাড়তে থাকে। তাদের অবস্থা হয়ে উঠে ঠিক পাবকমুখী পতঙ্গের মত, নিজেদের মৃত্যু অবধারিত জানা সত্বেও দুর দুরান্তর থেকে হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখবার আশা নিয়ে নগরাতে এগিয়ে আসে এবং তার মৃগয়া যাত্রার দিন সঙ্গে মিশে প্রাণসঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি করে। তবু লোকের চৈতন্য হয় না, এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ক্রমশঃ নিবিড় হতে থাকে।

ক্রমে এই নিদারুণ দুর্ঘটনা বাদশাহ্ তওঙ্গরন্নবীর অন্তরে নিদারুণ বেদনার সঞ্চার করে। তিনি নিজের প্রজাদের পুত্রের মতই ভালবাসতেন। এই দুঃসংবাদ তাঁহার বুকে শেলের মতই আঘাত হানল। কিভাবে এই নরহত্যা বন্ধ করা যায় অর্থাৎ কন্যা মৃগয়ায় বের না হয়, এই চিন্তা তাঁকে বিব্রত করে তুলল। অথচ সুলতান-কন্যা মৃগয়া এত ভালবাসেন যে, তাঁকে বাধা দিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তিনি তখন প্রধান উজিরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করে একটা যুক্তি পেয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে কন্যাকে ডেকে নিজের পাশে বসিয়ে নানা কথার পর বললেন—তোমার সঙ্গে একটা কথা নিয়ে আলোচনা করব বলে মনস্থ করেছি মা! যদি কিছু মনে না কর···

শাহজাদী হেসে বললেন—আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন তাতে এত চিন্তার কি আছে বাবা? হাজার হলেও আপনি আমার পিতা। আমার প্রতি আপনার স্নেহের অন্ত নাই। আপনি যা বলবেন, আমি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবার চেষ্টা করব।

সুলতান বললেন—দেখ মা, আমি যা বলব তা তোমার মঙ্গলের জন্যই। প্রতিদিন তুমি মৃগয়ায় বের হলে প্রজারা এবং নানাদেশের উৎসুক লোকেরা তোমাকে দেখবার জন্য পথে ভীড় করে দাঁড়ায়। এতে রক্ষীরা পথ পরিষ্কার করবার জন্যে অনেক লোককে হত্যা করতে বাধ্য হয়। এই নরহত্যার জন্যে আল্লার দরবারে আমাদের যে কত পাপ সঞ্চিত হচ্ছে, তা তুমি জান মা! এতে আমার এবং তোমার উভয়েরই আত্মার অমঙ্গল হতে পারে! পৃথিবীর মানুষ আমাদের প্রবল শক্তির কাছে মাথা নত করে আছে বলেই কোন প্রতিবাদ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সবার উপরে সেই পরম শক্তিধর ও করুণাময় আল্লার দরবারে এর কৈফিয়ৎ কি দেবে মা? তাই আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি এখন থেকে মৃগয়ায় যাওয়া বন্ধ কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে।

সুলতানের কথা শুনে সুলতান-দুহিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আগেই যখন আপনাকে কথা দিয়েছি বাবা, তখন আপনার কথা নিশ্চয়ই রাখব। আজ থেকে মৃগয়া গমন আমি বন্ধ করলাম।

কন্যার কথা শুনে আনন্দিত মনে সুলতান ধীরে ধীরে অন্তঃপুর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন।

সুলতানের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেও সুলতান দুহিতার মনে

কিন্তু এর জন্য বড় আঘাত লাগল। কিশোর বয়স থেকেই শাহজাদী ছিলেন মৃগয়াপ্রিয়। সেই মৃগয়া এভাবে বন্ধ হওয়ায় তাঁর মনের যত বিক্ষোভ পড়ল পুরুষদের উপরে। কেবলই মনে হতে লাগল, পুরুষেরা চিরদিনই নারীদের পীড়ন করে থাকে। তাদের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর জোর করে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করে। পিতার কথায় সম্মতি না দিলে তিনি হয়তো জোর করেই মৃগয়া বন্ধ করে দিতেন। এই সব ভেবে, সেইদিন থেকে শাহজাদী মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনি যতদূর সম্ভব পুরুষদের সঙ্গ এড়িয়ে চলবেন।

এই সব ভাবতে ভাবতে সুলতান-কন্যা নিজের অজ্ঞাতেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন পূর্বের মতই মৃগয়ায় বের হয়েছেন। কিঙ্করীগণ-পরিবৃত হয়ে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি যেন এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সে গতির সামনে বাধা দেবার সাধ্য নেই কারো! হঠাৎ এক জায়গায় এসে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর ঠিত সামনেই এক ব্যাধের জালে একটি হরিণ আটকে গেছে। প্রাণপণে সে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করেও সেই কঠিন বাঁধন হতে মুক্ত হবার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। এমন সময় সাথী হরিণীটি এসে অনেক কষ্টে তার বাঁধন মুক্ত করে দিল। কিন্তু প্রিয় সাথীকে মুক্ত করতে গিয়ে সে নিজেই ব্যাধের জালে বাঁধা পড়ল। হরিণী তখন কাতর চোখে প্রিয়তম স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার কাছে মুক্তির জন্যে মিনতি করতে লাগল। কিন্তু তাকে উদ্ধার করা ত দুরের

কথা, হরিণটি প্রাণপণে ছুটে দূরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হরিণীটি তখন সেই অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণতে লাগল। পাশবদ্ধা হরিণীর বিপদ দেখে শাহজাদী নিজেই তার বাঁধন খুলে দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম থেকে উঠে সুলতান-কন্যার মন কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—এই তবে পুরুষের ভালবাসা? শুধুমাত্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই পুরুষ এই অকপট ভালবাসা দিয়ে নারীদের মন জয় করবার চেষ্টা করে। আর অন্ধ নারীরা তাদের ছলনায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দেয়। মনের এই অনুভূতি শাহজাদীকে এমনই অভিভূত করল যে, তিনিও মনে মনে সঙ্কল্প করলেন—প্রাণ থাকতে আমি কখনও পুরুষের কপট ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না।

অবশ্যি, শাহজাদীর এ প্রতিজ্ঞার কথা আর কেউ জানতে পারল না। বাদশাহ্ও নিজে এ বিষয়ে কিছুই জানবার সুযোগ পেলেন না। সুতরাং যথানিয়মেই বিদেশী বাদশাহ্রা সুলতান-কন্যার রূপের কথা শুনে পারস্য রাজ্যে দূত পাঠাতে লাগলেন। আফগানিস্থান, আরব, তুর্কী প্রভৃতি দূর দূরান্তর দেশ থেকে সুলতান-কন্যার পরিণয় প্রসঙ্গে দূত আসতে লাগল। একদিন বাদশাহ্ আপন মনে দরবারে বসে কাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন চিন্তা করছেন, এমন সময় শাহজাদী নিজেই আলুলায়িত বেশে অশ্রুভরা চোখে পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করে দণ্ডায়মান হলেন।

বাদশাহ্ পরম স্নেহে কন্যাকে পাশে বসিয়ে গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তোমার চোখে পানি কেন? তুমি কি চাও বল। তোমার কোন প্রার্থনাই আমি অপূর্ণ রাখব না।

পিতার মুখে এ কথা শুনে শাহজাদী আশ্বস্ত হয়ে কোমল স্বরে বললেন—বাবা, আপনি আমাকে এই কথা দিন যে, আমার সম্মতি না নিয়ে কোনও পাত্রের সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবেন না।

কন্যার মনের ভাব ঠিকমত বুঝতে না পেরে বাদশাহ্ ঈষৎ হেসে বললেন—এই কথা? কিন্তু মা, এর জন্যে মিথ্যা দুশ্চিন্তা করে মন খারাপ করছ কেন? আমি শপথ করছি যে, তোমার মত না নিয়ে কারও সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব না।

শাহজাদী ফরোখনাজ পিতার কথায় আস্বস্ত হয়ে প্রফুল্ল মনে তাঁকে কুর্নিশ করে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। অনেকদিন পরে আবার তাঁর মুখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। তিনি আপন মনেই বলতে লাগলেন—পিতা যখন আমাকে এভাবে কথা দিয়েছেন, তখন আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পিতা কখনও প্রাণ থাকতে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করবেন না। সুতরাং আমাকেও আর স্বার্থপর পুরুষজাতির নিকট আত্মদান করতে হবে না।

এই দিন থেকে আবার তিনি মনের আনন্দে সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, গীত-বাদ্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হলেন; পূর্বের মত পরমসুখে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

কিছুকাল পরে একদিন পশ্চিমদেশের পরাক্রমশালী বাদশাহ্

হিরাতশাহ্ বাদশাহের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করবার জন্য দূত পাঠালেন। দূত সভাস্থলে এসে বাদশাহ্‌কে নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়ে অবশেষে তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বলল —জাহাপনা, আমার প্রভু বাদশাহ্ হিরাতশাহ্ আপনাকে এই চিঠিখানি দিয়েছেন। আশা করি, আপনি এর উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

পারস্যরাজ হিরাতশাহের চিঠিখানি পাঠ করে যথেষ্ট আনন্দিত হলেন! তিনি রাজদূতকে দরবারে অপেক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এ-বিষয়ে কন্যার সঙ্গে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে আনন্দিত মনে অন্তঃপুরে গেলেন। শাহজাদীকে ঘিরে তাঁর সঙ্গীগণ তখন মনের আনন্দে পাশা খেলছিলেন। বাদশাহকে আসতে দেখে সখীরা খেলা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। বাদশাহ তাদের সকলকে বসতে বলে কন্যাকে লক্ষ্য করে সস্নেহে বললেন—দেখ মা, বাদশাহ্ হিরাতশাহ্ তাঁর রূপবান, সুবিদ্বান ও বহুগুণ সম্পন্ন পুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করবার জন্য দূত পাঠিয়েছেন। এ-সম্বন্ধটি আমার মনঃপুত হয়েছে। হিরাতশাহ পশ্চিম দেশের একজন মহাপরাক্রমশালী ও ধনবান বাদশাহ্। এখন তোমার মতের উপরই সব নির্ভর করছে। তুমি সম্মতি দিলেই আমি দূতকে গিয়ে আমার সম্মতির কথা জানাব।

পিতার কথা শুনে শাহজাদী বললেন—পিতা, হিরাতশাহের পুত্র সুন্দর না কুশ্রী, বিদ্বান কি মুর্খ, বলবান কিম্বা কাপুরুষ—এ সবের কিছুই আমি জ্ঞাত নই। কাজেই কি করে আমি এ বিবাহে সম্মতি-জ্ঞাপন করি

বলুন? তবে বিবাহের উপযুক্ত পাত্র দেখলেই আমি আপনাকে জানাব!

কন্যার মুখে এ কথা শুনে বাদশাহ্ ক্ষুব্ধমনে অন্তঃপুর থেকে সভাগৃহে ফিরে এসে দূতকে বললেন—দূত, তুমি তোমার প্রভু হিরাতশাহকে তাঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার এই উত্তর দিয়ো যে, আমার কন্যার বর্তমানে বিবাহ ইচ্ছা নাই। তিনি স্বয়ম্বরা হতে চান। তার দিন ধার্য হলেই আমি পত্র দিয়ে তাঁকে জানাবো। দূত একথা শুনে ক্ষুণ্ণ-মনে পারস্য ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেল।

যদিও মেয়ের কথা অনুসারেই বাদশাহ্ কাজ করলেন, তবুও তার মনে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার উদয় হ'ল। তিনি চিন্তিত হ'লেন পাছে তাঁর নির্মল কুলে কলঙ্কের কালি এসে স্পর্শ করে। তিনি ভীত হয়ে কন্যার প্রধান ধাত্রী ফাতিমা বিবিকে গোপনে ডেকে এ সবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলল, জাঁহাপনা, জ্বলন্ত পাবক যেমন পঙ্কিল পদার্থ সংযোগে কলঙ্কিত হতে পারে না, তেমনি শাহজাদীর নির্মল চরিত্রেও কখনও দুরভিসন্ধি বা অসৎ অভিপ্রায় স্থান পেতে পারে না। তবে বিবাহের বিষয়ে তিনি যে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তার একটি কারণ আছে।

বাদশাহ্ উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন—ফাতিমা, তোমার নিকট আমার কোনও কিছুই গোপন নাই। এতদিন পর্যন্ত আমি পরম সুখে তোমাকে প্রতিপালন করেছি। শাহজাদীর এই ভ্রান্তিমূলক ধারণাটি কি? তুমি আমার কাছে তা অকপটে প্রকাশ করে বলতে পার। তোমার কোনও ভয় নেই।

ধাত্রী বলিল—জাঁহাপনা, যে দিন থেকে আপনি আপনার কন্যাকে মৃগয়ায় যেতে নিষেধ করেছেন, সেইদিন থেকেই আমি তাঁর মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আপনি হয়ত শুনে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, তাঁর এই পরিবর্তনের মূলে ঘুম-ঘোরে স্বপ্নে দেখা একটা ঘটনা। ধাত্রী এরপর ধীরে ধীরে শাহজাদীর সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বাদশাহের কাছে খুলে বললেন। সুলতান-কন্যা কথাচ্ছলে বিশ্বস্তা ধাত্রী ফাতিমাকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিলেন।

পারস্য অধিপতি ধাত্রীর কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বললেন—ফাতিমা, এ সমস্ত কথাই আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এখন শাহজাদীর এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা দূর করবার উপায় কি?

ধাত্রী করজোড়ে বলল—জাঁহাপনা, আপনি যদি আমাকে আর এক পক্ষ সময় দেন, তবে আমি শাহজাদীর নিকট কতকগুলি সচ্চরিত্র পত্নীপ্রাণ ও প্রেমিক পুরুষের গল্প বলে তার এই ভ্রম দূর করতে পারি। এ ছাড়া আর কোনও উপায় দেখি না। বিশেষ করে আপনি যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তার অনুমতি ছাড়া কারও হাতে তাকে সমর্পণ করবেন না।

বাদশাহ এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন—ফাতিমা, তুমি যদি সত্যিই আমার কন্যাকে এই ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পার তবে তোমাকে দশ হাজার আসরফি পুরস্কার দেব।

ধাত্রী এ কথা শুনে গভীর শ্রদ্ধায় বাদশাহকে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সান্ধ্য-উপাসনার পর শাহজাদী নিজের ঘরে সখী-পরিবৃতা হয়ে হাস্য-পরিহাসে মত্ত। কেউ গানের সুর ভাঁজছে, কেউ নাচের মহরা দিচ্ছে, কেউ পাশা খেলার সরঞ্জাম খুলছে। এমনি সময় ফাতিমা এসে বলল, এখন ওসব থাক বাছারা, নাচ গান হুল্লোড় তো রোজই হয়, পাশাও চলে প্রতিদিন। আজ আমি নতুন একটা আমোদের কথা বলছি। তাতে সবাই ভারি আনন্দ পাবে।

সখীরা ধাত্রীমার কথা শুনে নীরবে শাহজাদীর দিকে তাকাল। শাহজাদী সহাস্যে বললেন—তাই নাকি ধাত্রীমা, নতুন রকমের আনন্দ পাব! বেশ ত, বল তুমি—সেটি কি? মনে লাগলে এখনি মঞ্জুর করব আমি।

ফাতিমা বলল—দেখ বাছা, কতকগুলো ভালো ভালো মজার মজার গল্পের কথা হঠাৎ আমার মনে পড়েছে। সেগুলো যদি শুনতে সুরু করো, আর ছাড়তে পারবে না। বল তো আমি আরম্ভ করি।

একথা শুনে সখীরা একসঙ্গে আগেই বলে উঠল—বল ধাত্রীমা, বল; আমরা গল্প শুনব ধাত্রীমা। সখীদের কথা শুনে রাজকন্যাও বললেন—বেশ তো, তোমার গল্প শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই, ধাত্রীমা। তবে একটা কথা—যদি কোনও গল্প আমার ভাল না লাগে তবে আমি বললেই সে গল্প কিন্তু তখনি বন্ধ করতে হবে।

শাহজাদীর কথা শুনে ধাত্রী ফাতিমা বললেন—বেশ মা, তাই হবে। আমি প্রথমেই পরম দাতা মহানুভব আবুলকাসেমের গল্পটি বলছি তোমরা শোন:

আবুলকাসেমের কাহিনী

প্রাচীনকালে বোগদাদের অধিপতি ছিলেন মহাপরাক্রান্ত ও তীক্ষ্ণধী খলিফা হারুণ-অর-রশীদ। তাঁর নাম শোনে নি এমন লোক সে সময়ে সারা পৃথিবীতে কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। প্রজাদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দয়া, মায়া, মমতা। তিনি তাদের নিজ পুত্রের মতই স্নেহে যত্নে প্রতিপালন করতেন। শীতের রাত্রে তুষারপাত, বর্ষার প্রবল বারিবর্ষণ এবং গ্রীষ্মকালের প্রখর রোদ্রের প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা করে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যমধ্যে ঘুরে বেড়াতেন প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানবার জন্যে। সেজন্য তাঁর রাজ্যে কখনও দরিদ্রের উপরে কোনও ধনী অত্যাচার করতে সাহসী হ'ত না। কখন খলিফা কি বেশে যে কার গৃহে উপস্থিত হ'ন তার কোন স্থিরতাই ছিল না। এজন্যে উৎপীড়করা সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকত।

কিন্তু সর্বগুণ-মণ্ডিত নরপতি হওয়া সত্বেও এক সময় তাঁর মনে কেমন যেন একটা আত্মগরিমার ভাব এসে বাসা বাঁধে। প্রায়ই তিনি বিদেশীয় নৃপতিদের নিকটে মুক্তকণ্ঠে জাঁক করে বলতেন যে, তাঁর মত দয়ালু দানবীর এবং সুবিচারক নরপতি পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেনি। ইতিহাসে তিনিই এক-

মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে অভিহিত হবেন। এ ধরণের আত্মপ্রশংসা যে খুবই নিন্দনীয়, তা তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এজন্য সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও নানা দিক থেকে বাদশাহের নামে নিন্দা রটতে লাগল।

বাদশাহ হারুণ-অর-রশীদের প্রধান উজীরের নাম ছিল জাফর। তাঁর মত বহুদর্শী, বিচক্ষণ ও ন্যায়বান উজীর সত্যই দুর্লভ। তিনি একদিন বাদশাহকে গোপনে বললেন—জাঁহাপনা নিজের মুখে এ ধরণের আত্ম-প্রশংসা করা সঙ্গত নয়। এতে আপনার সুনামে নানা নিন্দা রটতে পারে। আত্ম-প্রশংসা করায় নিজের গৌরব বৃদ্ধি হয় না, বরং হ্রাস পায়। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি দয়া করে আজ থেকে এই দোষটি ত্যাগ করুন—এভাবে আর আত্ম-গুণ কীর্তন করবেন না।

উজীরের কথা শুনে বাদশাহের মনে কিন্তু ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠল। তিনি তখনি প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বল দেখি জাফর, এই পৃথিবীতে আমার মত দয়ালু ঐশ্বর্যশালী ও দানবীর আর কেউ আছে?

উজীর হেসে বললেন—জাঁহাপনা, আপনার রাজ্যমধ্যেই বসোরা নগরে আবুলকাসেম নামে আপনার যে প্রজা আছেন, তাঁর ঐশ্বর্য দয়া ও দানশীলতা দেখলে আপনার এ অহমিকা নিশ্চয়ই দূর হবে।

এ কথা শুনে বাদশাহ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—ও, তুমি সিংহের কাছে শৃগালের মহিমা কীর্তন করতে এসেছ? তোমার স্পর্ধা ত কম নয় জাফর। এই বলে তিনি তখনি সেনাপতিকে

ডেকে জাফরকে বন্দী করবার হুকুম দিলেন। বাদশাহের আদেশে বৃদ্ধ উজীর কারারুদ্ধ হলেন।

তারপর বাদশাহ অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁর বেগমের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন। বুদ্ধিমতী বেগম জোবেদী সমস্ত শুনে ঈষৎ হেসে বললেন—এ কথা শুনে এত ক্রুদ্ধ হলেন কেন জাঁহাপনা? যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। আগে আপনি বসোরায় গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে আসুন। তারপর যদি উজীরের কথা মিথ্যা বোঝেন, তখনি তার শাস্তিবিধান করবেন। আর যদি দেখেন উজীর যা বলেছেন তাই সত্যি, তবে আপনি ইচ্ছামত তাঁকে পুরস্কৃত করবেন।

খলিফা একথা শুনে খুশীমনে বুদ্ধিমতী বেগমকে প্রশংসা করে বললেন-তুমি ঠিক বলেছ বেগম। সব কিছুর শেষ না দেখে কোনও কাজ করাই উচিত নয়। আমি কাল প্রভাতেই ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে বসোরার দিকে যাত্রা করব। যদি উজীরের কথা সত্য হয়, তবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেব। আর যদি দেখি সে যা বলেছে তা মিথ্যা, তবে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করব।

সেইদিনই শেষরাত্রে খলিফা তাঁর সবচেয়ে তেজী ঘোড়াটিতে চড়ে ছদ্মবেশে যাত্রা করলেন বসোরার দিকে। অশ্বারোহণে খলিফার বেশ পটুতা ছিল। তাই পরদিন সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি বসোরার প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়ে একটি পান্থশালায় আশ্রয় নিলেন। একটু পরেই তিনি পান্থশালার অধ্যক্ষকে ডেকে কথা প্রসঙ্গে আবুলকাসেমের কথা তুললেন তার কাছে।

পান্থশালার অধ্যক্ষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—সে কি জনাব, আপনি মহাত্মা আবুলকাসেমের নাম শোনেন নি? এই পথ ধরে খানিকদুর এগিয়ে গেলেই বিরাট এক অট্টালিকা দেখতে পাবেন। বাহির থেকেই জানতে পারবেন, বাড়ীর মধ্যে দাস-দাসী সব গিজ্ গিজ্ করছে। আরও দেখবেন, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের কোন বাধাই নেই। যে কোনও লোকই ইচ্ছামত সে বাড়ীতে প্রবেশ করে মনোমত দান গ্রহণ করতে পারে।

ছদ্মবেশী খলিফা স্তব্ধ হয়েই এসব কথা শুনলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। পরদিন সকালেই তিনি অধ্যক্ষের কথামত আবুলকাসেমের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, অসংখ্য ভৃত্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে তিনি বললেন—ওহে, আমি তোমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে বহুদুর থেকে আস্ ছি। তাঁকে আমার এই খবরটি জানিয়ে দিতে পার কি?

খলিফার আকৃতি দেখেই ভৃত্য বুঝল যে লোকটি সামান্য নয়। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তক্ষুণি প্রভুকে গিয়ে এ-সংবাদ জ্ঞাপন করল। আবুলকাসেম এ সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে এসে সবিনয়ে বললেন, জনাব, আপনার আগমনে আজ আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। আমার সঙ্গে এসে উপযুক্ত কক্ষে বিশ্রাম করুন।

আবুলকাসেম পরক্ষণেই খলিফাকে একটি সুন্দর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব একটি পালঙ্কের উপর বসে খলিফা আবুলকাসেমকে লক্ষ্য করে

বললেন—জনাব, বহুদুর দেশ থেকে আপনার সুখ্যাতি শুনে আপনাকে দর্শন করবার ইচ্ছায় আজ আমি আপনার গৃহে এসেছি। আপনাকে দেখে আমার দীর্ঘ-দিনের কৌতুহল নিবৃত্ত হল।

আবুলকাসেম বললেন—আমার পরম সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। সবই করুণাময় আল্লার ইচ্ছা। জনাব, কতদূর থেকে আপনার আগমন হয়েছে জানতে পারি কি?

খলিফা বললেন—নিশ্চয়ই। আমি একজন পণ্যজীবী। বোগ্‌দাদ নগরে আমার বাসস্থান। কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে নগরের প্রান্তদেশের পান্থশালাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

দু'জনে এই ধরণের কথাবার্তা বলেছেন— এমন সময় প্রচুর মিষ্টান্ন ও নানা ধরণের সুরাপূর্ণ মণিময় পাত্র নিয়ে বারোজন পরিচারক ও পরিচারিকা সেই ঘরে প্রবেশ করল। আবুলকাসেমের নির্দেশে খলিফা কিছু খাদ্য ও পানীয় সেবন করে দেহের শ্রম ও ক্লান্তি দূর করলেন।

তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা সুরু হ'ল। আবুলকাসেম খলিফাকে পাশের আর একটি সুশোভিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। সেখানে অসংখ্য স্বর্ণ-রৌপ্যনির্মিত পাত্রে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ খাদ্য ও পানীয় সাজান ছিল। দু'জনে তখন একত্র মধ্যাহ্ন ভোজন সুরু করলেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁরা বিশ্রাম নেবার জন্যে আর একটি সুন্দর মণিময় কারুকার্যখচিত কক্ষে উপযুক্ত সুকোমল আসনে সুখে উপবিষ্ট হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনা নর্তকীরা তাদের সুমধুর সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা অতিথিকে আপ্যায়িত করল। নর্তকীদের অপূর্ব রূপ ও যৌবন

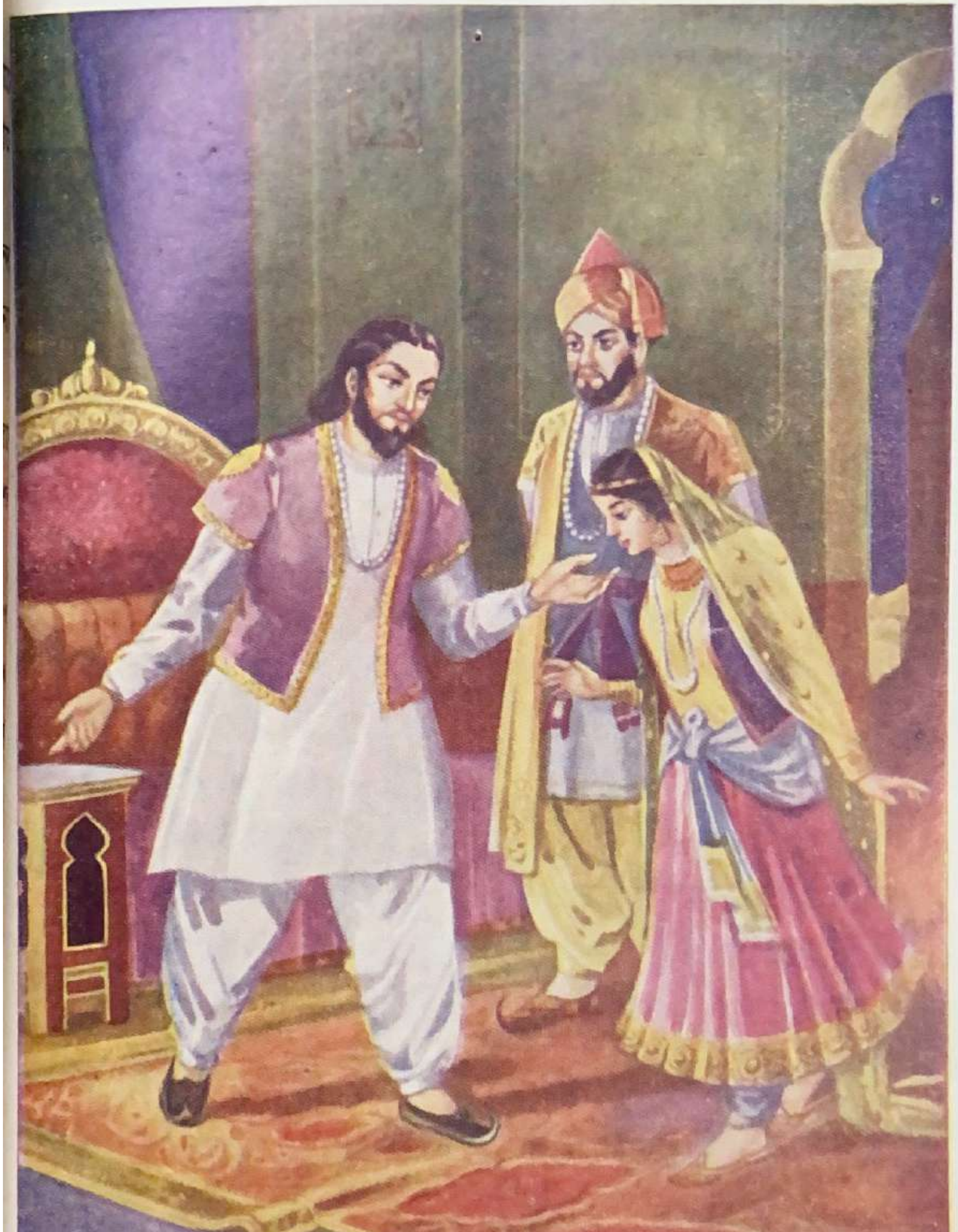

সেই নারীর অপরূপ শ্রী দেখে বাদশাহ উঠে গিয়ে তাকে...

দর্শনে খলিফা মোহিত হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন পৃথিবীতে এতগুলি নিখুঁত সুন্দরী নারী কি করে সম্ভব? সত্যিই কি এই পৃথিবীতে আবুলকাসেমের মত ধনী আর নেই?

খলিফা অবাক হয়ে নর্তকীদের দিকে চেয়েছিলেন এটা আবুলকাসেমের দৃষ্টিগোচর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আবুলকাসেম বাইরে গিয়ে বামহাতে একখানি লাঠি ও ডানহাতে একটি অপূর্ব বৃক্ষ নিয়ে পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। বৃক্ষটির নিম্নভাগ রৌপ্যনির্মিত। তার শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদি হীরকের তৈরী। ফলপুষ্পাদি রত্নময়! উপরিভাগে সুগন্ধি পদার্থে প্রস্তুত একটি ময়ূরী বসেছিল। আবুলকাসেম সেই লাঠিটির দ্বারা বৃক্ষ স্পর্শ করা মাত্রই ময়ূরীটি নৃত্য করতে লাগল এবং তার শরীরনির্গত সুগন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে উঠল। এ সমস্ত দেখে খলিফা হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে আবুলকাসেম হঠাৎ সেটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এতে খলিফা মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন —এই ব্যক্তি অত্যন্ত অভদ্র। আমি যখন দ্রব্যটির প্রশংসা করছিলাম, তখন সেটি আমাকে দান করা এর কর্তব্য ছিল। কিন্তু দান করা দুরে থাকুক ভাল করে আমার দেখার আগ্রহ চরিতার্থ না করেই কিনা সেটি নিয়ে চলে গেল। জাফর বলেছিল, আবুলকাসের মত দাতা নাকি পৃথিবীতে নাই। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

খলিফা মনে মনে এই সব আলোচনা করছিলেন, এমন সময় মণিখচিত পরিচ্ছেদ-শোভিত একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে আবুলকাসেম

ঘরে পুনরায় প্রবেশ করলেন। বালকের হাতে একটি মদ্যপাত্র। খলিফা মদ্যপান করে সেই পাত্রটি বালকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। অমনি সেটি আবার মদ্যপূর্ণ হয়ে গেল। খলিফা সেটুকু পান করে আবার পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু বালকের হাতের স্পর্শমাত্র আবার সেটি পূর্ণ হয়ে গেল। বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন—জনাব এ পাত্রটি ত চমৎকার। এর নির্মাতা কে ?

আবুলকাসেম বললেন—এক বিখ্যাত মনীষী এটা তৈরী করেছেন। এই কথা বলেই আবুলকাসেম বালক ও মদ্যপাত্রটি নিয়ে চলে গেলেন। তা দেখে খলিফার মন আবার বিরূপ হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন—ছি ছি, এই ধরণের সুন্দর দ্রব্যাদি দেখান এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে যাবার অর্থ কি ? লোকটির কি বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। এরই প্রশংসায় উজীর জাফর পঞ্চমুখ হয়েছিল। এ নাকি মস্ত দাতা ? আমি তো বলি এর মত কৃপণ আছে কিনা সন্দেহ।

খলিফা এই সব কথা ভাবছেন এমন সময় আবুলকাসেম একজন সুশোভিতা, সালঙ্কারা, অপরূপ-লাবণ্যময়ী নারীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই নারীর অপরূপ শ্রী দেখে বাদশাহ উঠে গিয়ে তাকে পরম সমাদরে নিজের পাশে বসালেন। তা দেখে আবুলকাসেম তাঁর হাতে একটি বীণা দিয়ে সেটি বাজাতে বললেন। বীণা বাজিয়ে সুমিষ্টকণ্ঠে সেই নারী যখন গান ধরলেন তখন তা শুনে খলিফা ভাবতে লাগলেন—এই পৃথিবীতে আবুলকাসেমের মত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আর আছে কিনা সন্দেহ। মনের এই কথা যেই মুখে

আবুলকাসেমকে বললেন, তখনই আবুলকাসেম যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আবুলকাসেমের এ ধরণের ব্যবহার বাদশাহকে পুনরায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করে তুলল। তিনি বিরক্ত মনে ভাবতে লাগলেন—আজই রাজ্যে ফিরে গিয়ে উজীর জাফরকে যোগ্য শাস্তি দেব। আমার সামনে সে কিনা এমন একজন কৃপণ ব্যক্তির উচ্চ প্রশংসা করেছে!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আবুলকাসেম উপযুক্ত শিষ্টাচার ও বিনয় সহকারে বাদশাহ্‌কে বিদায় দিলেন। বাদশাহ্ পথে আসতে আসতে ভাবতে লাগলেন—আবুলকাসেমের ধন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মন্ত্রী যা বলেছে তা মিথ্যা নয়। কিন্তু তার বদান্যতা সম্বন্ধে যে কথা সে বলেছে তা সবই মিথ্যা। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তার তুলনাই চলে না।

মনে মনে একই প্রকার চিন্তা করতে করতে বাদশাহ্ ধীরে ধীরে পান্থশালার দিকে চললেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করেই দেখলেন, সেই বীণাবাদিনী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে রয়েছে সেই সুরাপাত্রধারী বালক, দ্বাদশ জন নর্তকী ও ময়ূরীযুক্ত অদ্ভুত বৃক্ষটি। যুবতী বাদশাহের হাতে একটি পত্র দিলেন। বাদশাহ্ সেটি পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা আছে:

জনাব,

আপনি যে দয়া করে আমার গৃহে পদধূলি দিয়েছিলেন এতে আমি কৃতার্থ। এখন অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আমার দ্বারা আপনার সামান্যতম কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি বা শুশ্রূষার অভাবও হয়ে

থাকে দয়া করে নিজ গুণে আপনি তা মার্জনা করবেন। আপনি সামান্য যে সব জিনিস দেখে পরম প্রীত হয়েছেন, আমি সেগুলি আপনাকে প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়ে ধন্য হ'লাম। জনাব, যদি দয়া করে এগুলি গ্রহণ করেন ত কৃতার্থ হ'ব। আমার পূর্বাপর রীতি আছে যে, কোনও ভদ্রলোক কোনও জিনিসের প্রশংসা করলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে তা অর্পণ করা। সে জিনিসের উপর আমার কোনও অধিকার থাকে না। এখন দয়া করে আপনি এগুলি গ্রহণ পূর্বক অধীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
কাসেম।

পত্রটি পাঠ করে খলিফা একযোগে বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—ধন্য আবুলকাসেমের ঐশ্বর্য! ধন্য তার বদান্যতা—তার বিনয়, ভদ্রতা ও সৌজন্য। সত্যই সে অদ্বিতীয় দানবীর ও মহৎব্যক্তি। রাজ্যে গিয়েই আমি উজীরকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব। তার কাছে এ কথা না শুনলে এতবড় একজন মহৎ-প্রাণ লোকের সঙ্গে আমার কোনও দিনই পরিচয় হতো না। কিন্তু আবুলকাসেমের এত দানের উৎস কোথায় তা আমাকে দেখতেই হবে। সুলতান এই ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

পরদিন প্রভাতেই তিনি আবুলকাসেমের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে

তাঁকে বললেন—জনাব, আপনার এ দান গ্রহণ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

আবুলকাসেম বিনীতভাবে বললেন—সে কি জনাব, আমার এমন কি অপরাধ হয়েছে যে আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার এ দান প্রত্যাখ্যান করছেন।

আবুলকাসেমের কথা শুনে খলিফা বললেন—এতে ক্রোধের কোনও কারণই নেই জনাব, বরং আপনার ব্যবহারে আমি পরম প্রীত হয়েছি। আপনার মত অতিথিপরায়ণ লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। তবে আমার দান প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে, দাতা এভাবে মুক্তহস্তে দান করতে অভ্যস্ত, তাঁর পক্ষে নিঃস্ব হওয়া স্বাভাবিক। তাই দাতার পক্ষে বিড়ম্বনাজনক দান গ্রহণ করা কারও উচিত নয়।

এ কথা শুনে আবুলকাসেম মৃদু হেসে বললেন—ও, পাছে দান করে আমি নিঃস্ব হই, এই ভেবে আপনি আমার দান প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন! তাহলে আপনি সানন্দে অবগত হোন যে, সারা জীবন ধরেও যদি আমি এমনিভাবে দান করে চলি তবুও আমার নিঃস্ব হবার ভয় নেই। আমার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের এক অংশও তাতে হ্রাস হবে কিনা সন্দেহ।

খলিফা এ কথা শুনে বললেন—তাই নাকি? তবে তো আপনি সত্যই মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু জনাব, একথা শুনে আপনার এই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের গোপন কথা জানবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হচ্ছে। আমাকে জানাতে আপনার আপত্তি আছে কি?

আবুলকাসেম হেসে বললেন—না, না, আপত্তি কিসের! বেশ চলুন পাশের ঘরে। আমি আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য প্রাপ্তির ইতিহাস আপনাকে শোনাচ্ছি।

এই বলে তিনি খলিফাকে পাশের মণিময় কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনের পুরোণো কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

আবুলকাসেমের আদি বৃত্তান্ত

আবুলকাসেম বলতে লাগলেন—জনাব, মিসর-দেশের অন্তর্গত কায়রো নগরে ছিল আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান। আমার পিতার নাম আবদুল আজিজ। তিনি রত্ন-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু কায়রোর বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত প্রজাপীড়ক। তিনি প্রজাদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তাই তাঁহার ভয়ে আমার পিতা কায়রো ত্যাগ করে বসোরায় চলে আসেন এবং এক বণিক-কন্যাকে বিবাহ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে থাকেন।

সেই বণিক-কন্যাই আমার মা। আমার যৌবন-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতা দেহত্যাগ করেন। তখন পিতার অজস্র অর্থ আমার হাতে এসে পড়ল। আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিলাসব্যসনে মগ্ন হ'লাম। কারণে অকারণে প্রচুর অর্থব্যয় করে অল্পদিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়লাম। দেশে সে অবস্থায় দারিদ্র্যের মধ্যে কালযাপন করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। তাই আর কালবিলম্ব না করে অবশিষ্ট সামান্য সম্বল নিয়ে দেশ ত্যাগ করলাম।

নানাদেশ ঘুরে অবশেষে অধ্যুষিত কায়রো নগরে গিয়েই উপস্থিত

হ'লাম। সে নগরীর অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে আমার দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার পিতা ছিলেন এই নগরের শ্রেষ্ঠ ধনী, আর আমি আজ পথের ফকীর! আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি বাড়ীর কাছে এসে উপরের দিকে নজর পড়তেই আমি চম্‌কে উঠলাম। দেখলাম বাতায়নে দাঁড়িয়ে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক যুবতী। সর্বাঙ্গ তার ক্ষণপ্রভা দিয়ে যেন গড়া। আমাকে সেখানে দাঁড়াতে দেখেই চলে গেল সে। আবার আসতে পারে এই আশায় আমি সেই বাড়ীর সামনে আর একটি বাড়ীর বারান্দায় বসে রইলাম। তার অনবদ্য সৌন্দর্য আমার মনকে অদ্ভুতভাবে হরণ করে নিয়েছিল।

ক্রমে রাত্রি নামল। তারপর আবার প্রভাত হলো। কিন্তু আমি একই ভাবে সেইখানে বসে আছি। আমার তো আর কোন কাজ নেই, কি হবে আর তবে মিথ্যা ঘোরা-ঘুরি করে। সেইখানে সেইভাবে বসে রইলাম। সেদিন দুপুরে আবার জানালা খুলে গেল। যুবতী আমাকে দেখেই ক্রুদ্ধস্বরে বলল—তোমার কি ডর-ভয় নেই? তুমি কি জাননা এখানে কোন পুরুষ আসতে পারে না—সুলতানের নিষেধ আছে। রক্ষীরা দেখে ফেললে তোমার গর্দান যাবে যে!

আমি বললাম—সুন্দরী, সম্প্রতি আমি এ-দেশে এসেছি। তাই সুলতানের আদেশ আমার জানা নেই। তোমার কাছ থেকেই প্রথম কথা শুনতে পেলাম। কিন্তু তাতেও আমি ভীত নহি। তোমার অনুপম সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমার পক্ষে এখন এখান থেকে এক পাও নড়বার ক্ষমতা নেই।

যুবতী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল—বললাম তবু শুনলে না? দাঁড়াও আমি রক্ষীদের ডেকে আনছি। এই বলে সুন্দরী সেখান থেকে চলে গেল।

আমি ভাবলাম, যুবতী হয়তো শীঘ্রই রক্ষীদের ডেকে আনবে। মনে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হলো বটে। তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু সে আর ফিরে এলো না। তখন ভাবলাম তার কথাটা আন্তরিক নয়। মনে আশা নিয়ে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করব বলে স্থির করলাম। সেই রাত্রিও সেখানেই কাটালাম। পরদিন সকালে আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, সেই যুবতী এসে দাঁড়াল। আমার দিকে চেয়ে বলল —কাল তোমাকে অত নিষেধ করলাম তা কি শুনতে পাও নি? মিথ্যা কেন প্রাণটা খোয়াবে?

আমি বললাম—প্রাণ গেলেও এখান থেকে চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

যুবতী মৃদু হেসে বলল—এত দৃঢ় সংকল্প? বেশ তাহলে রাত্রিতে এখানে এসো। এ কথার পর জানালা বন্ধ করে চলে গেল সে। আমিও সন্তুষ্ট মনে যে পান্থনিবাসে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। সেখানে স্নানাহার সেরে সন্ধ্যার পর সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আবার যাত্রা করলাম সেই বাড়ীখানির দিকে।

সেখানে গিয়ে দেখলাম জানালা থেকে একগাছি মোটা দড়ি ঝুলছে। বুঝলাম এবার সেই যুবতীই এ অবস্থা করে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ সেটি অবলম্বন করে দোতলায় উঠে পড়লাম, তারপর দু'খানি ঘর পার হয়ে তৃতীয় ঘরখানিতে ঢুকেই বিস্ময়ানন্দে দেখলাম, সেটি অপরূপ শোভায়

মণ্ডিত। ঘরের এক দিকে একটি স্বর্ণনির্মিত আসনে সেই যুবতী হাসি মুখে বসে আছে। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে হাত ধরে সাদরে তার পাশে বসিয়ে বলল—এবার আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে জীবন কাহিনী বলুন। আমি তখন আমার সমস্ত পরিচয় এবং কিভাবে দৈন্য-দশায় পতিত হয়েছি সে সমস্তই খুলে বললাম।

সমস্ত শুনে যুবতী বলল—প্রিয়তম, আমাকে দেখে তোমার মনে যে প্রকার আসক্তির সঞ্চার হয়েছে, তোমাকে দেখে আমিও ঠিক তেমনি তোমার প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়েছি। যাক তোমার কাহিনী সমস্তই শুনলাম। এবার আমার জীবনের সমস্ত কাহিনীও তোমাকে প্রকাশ করে বলতে মনস্থ করেছি। আশা করি, তুমি সে সমস্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমি সম্মত হলে যুবতী বলতে আরম্ভ করল :

দার্দেনির কাহিনী

জনাব, আমার নাম দার্দেনি। দামাস্ক নগরের রাজমন্ত্রী আমার পিতা। তিনি ন্যায়পরায়ণ, নির্মল-চরিত্র এবং সুলতানের পরম হিতৈষী ছিলেন। সেজন্য সকলেই তাঁকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করত। তাঁর এই সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে কয়েকজন সভাসদ তাঁর প্রতি নানা প্রকার মিথ্যা দোষ আরোপ করে সুলতানের কাছে অভিযোগ উপস্থিত করল। সুলতান সেই ধূর্তদের চক্রান্ত বুঝতে না পেরে বিনাদোষে আমার পিতাকে পদচ্যুত করলেন। তখন তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আমি তখন সামান্য বালিকা মাত্র।

দেশত্যাগী হলেও পিতা কিন্তু আমাকে নানারূপ বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ। অল্পদিনের মধ্যে পিতা কালগ্রাসে পতিত হলেন। পিতার মৃত্যুর পরই মা অন্য একজন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আর্থিক

অস্বচ্ছলতার জন্য সেই লোকটিকে বিবাহ করতে পারছিলেন না। তখন একদিন তিনি এক কন্যা-ব্যবসায়ীর নিকট উচ্চমূল্যে আমাকে বিক্রী করে দিয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমি যুবতী হয়ে উঠলাম।

কন্যা-ব্যবসায়ী তখন আমাকে আরও কয়েকটি যুবতীর সঙ্গে বিক্রী করবার উদ্দেশ্যে এখানকার সুলতানের কাছে নিয়ে এলো। সুলতান আমাকেই মনোনিত করে প্রচুর মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন।

আমার রূপ দেখে সুলতান অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করলেন। আমার জন্য এই পৃথক বাড়ীখানিও তিনি তৈরী করিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য অনেকগুলি দাসদাসীও নিযুক্ত করলেন। দিন-কয়েক পরেই তিনি একদিন এসে আমাকে প্রণয় নিবেদন করলেন। কিন্তু আমি তাতে অসম্মত হলে তিনি চলে গেলেন। এতেও তিনি নিজকে অপমানিত মনে করলেন না, বরং তার ভালবাসা যেন আরও বেড়ে গেল। আমি কিন্তু আজ পর্যন্তও তাঁকে ভালবাসতে পারিনি বা তাঁর কাছে আত্মদানও করিনি। অন্য বেগমেরা এজন্য আমাকে খুবই ঈর্ষা করে। মাত্র সেদিন আমার মনে প্রথম অনুরাগ সঞ্চার হয় আপনাকে প্রথম দিন দেখেই। তাই আপনার পায়ে দেহ-মন অর্পণ করে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছি।

এইভাবে কথোপকথনে রাত গভীর হ'ল। আমরা শুয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন সজোরে দ্বারের কড়া ধরে নাড়তে আরম্ভ করল। তাতেও দ্বার না খোলাতে সজোরে দ্বারে

আঘাত হেনে 'দ্বার খোল' 'দ্বার খোল' বলে চীৎকার করতে লাগল।

দার্দেনি বলল—সর্বনাশ সুলতান উপস্থিত, এক্ষুণি আমাদের প্রাণ যাবে। এ কথা শুনে আমি স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। পালাবার কোনও উপায় নাই। দ্বারে সুলতান দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর তর্জন-গর্জন করছেন। তখন বাধ্য হয়ে সেই সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে পড়লাম। দার্দেনি ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে ক্রুদ্ধ সুলতান উন্মুক্ত তরবারী হাতে যমরাজের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর দার্দেনিকে লক্ষ করে বললেন—ভ্রষ্টা নারী, বল্‌ কাকে ঘরের মধ্যে এনেছিস্‌? এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তুই আমাকে এভাবে অনাদর করিস্‌। তোর মত নারীর মুখ দেখাও পাপ। কোথায় তোর ভালবাসার লোককে লুকিয়ে রেখেছিস্‌ বল।

প্রহরীরা সুলতানের সঙ্গে এসেছিল। সুলতান তাদের বললেন—তোরা খুঁজে দেখ ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। তাকে খুঁজে বের করা চাই।

সুলতানের আদেশে প্রহরীরা ঘরের চারিদিকে খুঁজতে লাগল। খানিক আগে আমরা যে রমণীয় সিংহাসনে পাশাপাশি বসেছিলাম, অবশেষে তারই তলা থেকে আমাকে খুঁজে বের করল। সুলতান আমাকে দেখে বললেন—পাপিষ্ঠ, তোর পাপ-বাসনা পূর্ণ করবার আর কি জায়গা খুঁজে পেলি না? শেষ পর্যন্ত কিনা রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিস্‌! আমার সমস্ত মান-সম্ভ্রম নষ্ট করতে উদ্যত

হয়েছিস্? তোর দুঃসাহসের দেখছি সীমা নেই। এই মুহূর্তে তোর পাপের উপযুক্ত প্রতিফল আমি স্বহস্তে দিতে চাই।

এই কথা বলে সুলতান আমাকে হত্যা করতে তরবারী আমার মাথার উপর উদ্যত করলেন। আমি ভাবলাম, আমার জীবনের শেষক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় বৃদ্ধা ধাত্রী এসে বলল—জাঁহাপনা, এই পাপাত্মাকে ওভাবে হত্যা করে আপনার তরবারীকে কলঙ্কিত করবেন না। এরা দু'জনেই সমান পাপী। তাই ওদের দু'জনকেই সমুদ্রের বুকে নিক্ষেপ করুন। ওদের পাপ-দেহ হাঙ্গর কুমীরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক।

সুলতান বৃদ্ধার কথা শুনে প্রহরীদের বললেন—এদের দু'জনের হাত পা বেঁধে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ কর। আদেশ দিয়েই দ্রুতপদে সুলতান ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন।

প্রহরীরা প্রভুর আদেশ ঠিকমতই পালন করল। হাত পা বেঁধে আমাদের দু'জনকেই প্রাসাদের চূড়া থেকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হ'ল।

আমি ছেলেবেলা থেকে ভাল সাঁতার জানতাম। অনেক কষ্টে নিজের বাঁধন খুলে সাঁতার কেটে তীরে এলাম। তারপর দাদেঁনির অন্বেষণে চারদিকে খুঁজে বেড়ালাম কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। পাগলের মত আবার সমুদ্রের পাড়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তবুও বিফল মনোরথ হতে হ'ল। প্রাণের দাদেনিকে না পেয়ে আমার চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রু পড়তে লাগল। শুধু মনে হতে

লাগল আমিই তার মৃত্যুর কারণ। খোদার কাছে প্রার্থনা করে বললাম—খোদা, তুমি আমাকেও কেন ওই সঙ্গে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে না? প্রিয়তমা দার্দেনির সঙ্গে যদি আমিও সমুদ্রের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করতাম তাহলেই ভাল হ'ত। আমাকে ভালবেসেই ত তার এই অকাল মৃত্যু ঘটল।

দার্দেনির চিন্তা আমাকে তখন উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেলল। তারই স্মৃতি সহায় করে কায়রো থেকে রওনা হ'লাম বোগদাদের দিকে। যেতে যেতে কেবলই দার্দেনিকে মনে পড়ে আর দু'চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। এইভাবে চলতে চলতে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে উপস্থিত হ'লাম। দূর থেকে দেখলাম, প্রান্তরের শেষপ্রান্তে একটি পর্বত। সেই পর্বত পার হতে না পারলে কোনও লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে সন্ধ্যাও সমাগত। তাই সে সময় পর্বত অতিক্রমের চেষ্টা না করে কাছেই একটি ছোট হ্রদের তীরে শয়ন করলাম। গভীর রাতে হঠাৎ দুর থেকে নারী-কণ্ঠের করুণ কান্না ভেসে এসে আমার নিদ্রা ভেঙ্গে দিল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম এবং স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। কিছুদুর গিয়েই বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দেখলাম একজন লোক একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে একটি পদার্থ রেখে সেটা মাটিচাপা দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই পূর্বের আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। আমি তখনই মাটি সরিয়ে ফেলতেই একটি প্রকাণ্ড বাক্স দেখতে পেলাম। তার মধ্যে শায়িতা রয়েছে রক্তাপ্লুত একটি নারীদেহ। তারপর নাকের

সামনে হাত দিয়ে বুঝলাম, তখনও অতি ধীর গতিতে নিঃশ্বাস পড়ছে। এখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, মৃত্যুর পূর্বেই একে এভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তবে আঘাত খুব সামান্য নয়। আমি তখনই তাকে তুলে এনে তার ক্ষতস্থান ভাল করে বেঁধে দিলাম। তারপর ধীরে ধীরে রক্তপাত বন্ধ হয়ে এলো, ক্রমে নারীরও জ্ঞান ফিরল। সে তখন আমার দিকে চেয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলল—একটু পানি।

আমি তখনই দ্রুতপদে হ্রদের ধারে গিয়ে আমার পাগড়ী ভিজিয়ে পানি এনে তাকে পান করালাম। আকৃতি-প্রকৃতিতে তাকে উচ্চ-বংশীয়া নারী বলেই মনে হ'ল! এমন নারীকে যে এভাবে আঘাত করতে পারে, সে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ সন্দেহ নাই।

নারী একটু সুস্থ হলে আমি তাকে লোকালয়ে নিয়ে গেলাম এবং তাকে আমার ভগ্নী বলে পরিচয় দিয়ে একটি পান্থনিবাসে আমরা আশ্রয় নিলাম। সেখানে একজন চিকিৎসক এনে তার চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করলাম। চিকিৎসার গুণে কয়েকদিনের মধ্যেই তার ক্ষত শুকিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সেই নারী একদিন আমাকে একটি পত্র দিয়ে বলল—এই নগরীতে মাহীর নামে একজন সওদাগর আছে, তুমি তার কাছে গিয়ে এই পত্রটি দাও। আমি তার নির্দেশে সেই সওদাগরকে খুঁজে বের করলাম এবং তাঁর হাতে চিঠিখানি দিতেই তিনি আনন্দিত হয়ে আমাকে দুইটি থলিপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। আমি ফিরে এসে তারই নির্দেশমত একটি স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করলাম এবং দু'জনে সেইখানেই বাস করতে লাগলাম।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পর যুবতী একদিন আমাকে আর একখানি চিঠি দিয়ে সেই সওদাগরের কাছে যেতে বলল। এবার তিনি আমাকে চারিটি থলিপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। এইভাবে সুখেই আমার দিন কাটতে লাগল। এই নারীও বেশ রূপলাবণ্যময়ী ছিল। কিন্তু তবুও দার্দেনির পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে আমি সংযত ও অনাসক্ত থেকে আমি তার সঙ্গে ঠিক নিজের ভগ্নীর মতই ব্যবহার করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমি তাকে তার পরিচয় এবং সেই আঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করতাম। কিন্তু তার উত্তরে সে নীরব থাকতো কিম্বা হয়ত অন্য কোন কথা তুলে প্রসঙ্গটি চাপা দিত।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেলে একদিন সেই নারী বলল—নগরে নামারণ নামে যে সওদাগর আছে তার দোকান থেকে কয়েকটি কাপড় কিনে নিয়ে এস। তবে সে যা দাম চাইবে ঠিক তাই তাকে দেবে। কোন দরদস্তুর করবে না।

আমি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করলাম। তিন চারদিন পর সে এভাবে আরও কতকগুলি কাপড় কিনে আনতে বলল। এবারেও আমি সেগুলি ঐভাবে কিনে আনলাম এবং সে যা দাবী করল, তাই দিয়ে দিলাম। আমার এই প্রকার সরল ও উদার ব্যবহারে বণিক আনন্দিত হ'ল এবং পরদিনই আমাকে তার বাড়ীতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করল। আমি ফিরে এসে একথা সেই নারীকে বললাম। সে বলল—নামারণের মত লোকের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা উচিত নয়। তুমি তার বাড়ীতে গিয়ে আহার কর এবং তাকেও একদিন আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ

সচিত্র পারস্য উপন্যাস

করে আন। আমি সেইদিনই তার বাড়ীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করলাম এবং তাকে বললাম—জনাব, আপনি আগামী পরশু আমাদের বাড়ীতে আহার করবেন। বণিক সম্মত হলে আমি বাড়ী ফিরে এলাম।

নির্দিষ্ট দিনে সওদাগর আমাদের বাড়ীতে এলো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমরা দু'জনে একত্রে বসে আহার করলাম। কিন্তু সেই নারীকে একবারও দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যার সময় সওদাগর বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি বললাম—অত অধীর হচ্ছেন কেন? আসুন, কিছুক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করা যাক। তখন দু'জনে সুরা পান করে নানা আলাপে মেতে উঠলাম। অল্পক্ষণ পরে তাঁকে একটি ঘরে ভাল বিছানায় শয়ন করিয়ে আমি পাশের ঘরে গিয়ে নিদ্রিত হ'লাম।

হঠাৎ মাঝরাতে সেই নারীর ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল—নামারণের কি অবস্থা হয়েছে একবার দেখে যাও।

আমি তার সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে দেখতে পেলাম, শয্যার উপরে সওদাগরের রক্তাক্ত মৃতদেহ। পালঙ্ক এবং ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তা দেখে আমি ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম—ছি ছি, বিনা কারণে ও লোকটিকে তুমি হত্যা করলে কেন? এখন আমি শুদ্ধ এ পাপের ভাগী হ'লাম!

উত্তরে হেসে বলল—একে এভাবে হত্যা করায় কোন পাপ নেই। এর মত পাষণ্ড পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। এই শয়তানই আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। যাক্ এবার আমার জীবন কাহিনী শুনুন তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

সুলতান কন্যার কাহিনী

জনাব, আপনি আমার জীবনদাতা। তাই আপনার কাছে আমি কোনও কথাই গোপন করব না। আমিই এ দেশের সুলতানের একমাত্র কন্যা। একদিন গোছলের জন্য রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে বের হ'তেই আমার হঠাৎ নজর পড়ল নামারণ তার দোকানে বসে আছে। তাকে দেখেই আমার অন্তরে তার প্রতি কেমন যেন একটা আসক্তির সঞ্চার হ'ল! কিন্তু আমি বাদশাহের মেয়ে আর সে সামান্য একজন বণিক মাত্র। এ-অবস্থায় তার সঙ্গে আমার প্রণয় হতে পারে না—এই চিন্তাই বাধার সৃষ্টি করল। আমি তখন আমার মনকে দৃঢ় করবার চেষ্টা করেও কোন ফল পেলাম না। ধীরে ধীরে আমি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম। তবে আমার ধাত্রী ছিল খুব চতুরা ও বুদ্ধিমতী। সে সমস্ত বুঝতে পেরে একদিন রাত্রে নামারণকে নারী সাজিয়ে আমার বাড়ীতে এনে উপস্থিত করল।

আমার আকাঙ্খিত পুরুষকে সামনে দেখতে পেয়ে আমি মনের আনন্দে সে রাত্রি তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করলাম। এমন কি সকাল হলেও আমি তাকে বাড়ী ফিরতে দিলাম না। দিনের বেলায় তাকে

অন্তঃপুরের গোপনীয় স্থানে লুকিয়ে রাখলাম। এই ভাবে কয়েকটি দিন এবং রাত সে আমার কাছেই যাপন করল। তারপর ধাত্রী আবার তাকে নারীবেশে সজ্জিত করে বাইরে রেখে এল।

এই ভাবে সে মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে আসত এবং দু' একদিন অন্তঃপুরে রেখে আবার বাইরে নিয়ে যেত। কিছুদিন পরে হঠাৎ এ ভাবে তার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নামারণের বিরহে আমি তখন মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে লাগলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে ধাত্রীকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই একদিন আমি নিজেই ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুর থেকে বাইরে বের হয়ে তার বাড়ীর সামনে উপস্থিত হ'লাম। দ্বার-রক্ষককে বললাম—আমি তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল।

সে বলল—আমার প্রভু এখন অন্য এক নারীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত আছেন। তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না। এ কথা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। আমি দ্বার-রক্ষককের নিষেধ উপেক্ষা করে সবেগে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম, সত্যই সে অন্য একটি নারীর সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত। আমি তখন মারমুখী হয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতেই নামারণ সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীকে বাড়ী থেকে বের করে দিল এবং আমার পায়ে ধরে বলল—আমার যা কিছু

অপরাধ হয়েছে সেজন্য মাপ চাইছি। আমি শপথ করে বলছি, আর কোনও্ দিন এমন কাজ করব না।

এতে আমি অনেকটা শান্ত হ'লাম। তারপর সে আমার সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর ভৃত্যকে ত্ব'জনের জন্য খাবার আনতে আদেশ করল। খাবার খাওয়া শেষ হলে সে আমাকে কৌশলে প্রচুর মদ্যপান করিয়ে আমাকে প্রায় সংজ্ঞাহীন করে ফেলল। আমি তখন নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় এইটুকু লক্ষ্য করি যে, নামারণ আমাকে একেবারে সংজ্ঞাহীনা ভেবে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি উঠে গেল, তারপর একখানা ছুরিকা হাতে করে এসেই আমার বুকে আঘাত করল। তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর আমার দেহ বার্কবন্দী করে কিভাবে সে মাটি চাপা দেয় এবং সৌভাগ্যক্রমে আপনার পরিচর্যায় ও কৃপায় আমি পুনরায় পৃথিবীর আলো দেখতে পাই, সে সব তো আপনি আগেই জেনেছেন। এরপর চিঠি দিয়ে আপনাকে যার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে আমার পিতার কোষাধ্যক্ষ। আমার ত্বর্ভাগ্যের কথা শুনে সে তখনই উপযুক্ত অর্থ আপনাক দিয়েছিল। সেই অর্থ পেয়ে আমি নামারণের কৃতকর্মের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এতদিনে আমি প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হয়েছি। আমি পিতার কোষাধ্যক্ষকে এ সব কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম। তাই তিনি কাউকে জানাননি। কাল সকালে পিতার কাছে গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে বলব। তা হলে তিনি খুশী হয়ে নিশ্চয়ই আপনাকে প্রচুর অর্থ দান করবেন।

আমি হেসে বললাম—তোমাকে যে আমি রক্ষা করতে পেরেছি, এটাই আমার পরম লাভ। টাকা-পয়সা আমি চাই না। তবে তুমি আগে এ কথা আমাকে খুলে বললে আমি ওই বণিককে আরও কঠোর শাস্তি দিতে পারতাম।

এরপর আমি নিহত বণিকের দেহ বাক্স মধ্যে আবদ্ধ করে এক প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করলাম। তার পরদিন প্রভাতে সুলতানের কাছে তাঁর কন্যাকে পৌঁছে দিয়ে আমি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আবুল কাসেমের গুপ্তধন

সুলতান কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্রমাগত পথ চলতে চলতে আমি নগরের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হলাম। সেখানে কয়েকজন সওদাগরের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হল। তাঁরা বোগ্‌দাদ নগরে বাণিজ্য করতে চলেছেন। আমিও তাঁদের সহযাত্রী হয়ে বোগ্‌দাদে উপস্থিত হলাম।

বোগ্‌দাদে এসেই ঘটনাচক্রে আমি এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হই। আমার সম্বল তো মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা। আমি সেটি খরচ না করে তার বিনিময়ে প্রচুর ফলমূল ও গন্ধ দ্রব্যাদি কিনে পথে পথে বিক্রী করতে থাকি। তাতে যে সামান্য লাভ হয় তা দিয়েই আমার দিন কোন রকমে চলতে থাকে।

এক জায়গায় প্রায়ই দেখি অনেকগুলি লোক এক সঙ্গে বসে আমোদ-প্রমোদ ও নানারূপ গল্প-গুজবে মত্ত থাকে। তাদের কাছে গেলেই তারা আমার কাছ থেকে নানারূপ জিনিস কিনত। সে দিন তাদের কাছে আমার জিনিস-পত্রের পশরা ধরতেই তারা প্রত্যেকেই

কিছু কিছু কিনল। কিন্তু এক কোণে যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন, সেদিকে আমার নজর পড়েনি। আমি তাঁকে এড়িয়েই চলে আসছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধটি আমাকে ডেকে বললেন—ওহে বাপু পশারী, আমার কাছে তোমার পশরা আনলে না যে! আমি কি কিছুই নিতাম না, বা মালের দাম তুমি পেতে না আমার কাছে ?

আমি একটু লজ্জিত হয়েই মৃদু হেসে বললাম—না না, তা নয়। আপনি এক কোণে বসে আছেন, তাই আপনাকে দেখতে পাইনি। বলেই আমি সমস্ত দ্রব্যপূর্ণ পশরাটি তাঁর সামনে রাখতেই তিনি তা থেকে বেছে বেছে একটি আতরের শিশি তুলে নিয়ে আমার হাতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক! আমার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর দামও এত বেশী টাকা নয়। আমি এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই, তিনি সেটা এড়িয়ে আমাকে নিয়েই পড়লেন, আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

আমি বললাম—দেখুন, আমি আমার পরিচয় দিতে চাই না। তাহলে আমাদের বংশগত পুরানো কথা সব মনে পড়বে। আমার এ অবস্থায় আমি তাতে মনে বড় ব্যথা পাব।

তিনি যেন অন্তর দিয়ে আমার কথাগুলি শুনলেন, কিন্তু সেদিন আর এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না, তবে আমি যাতে প্রত্যহই এখানে এসে তাঁর সামনে আমার মালপত্রের পশরাটি ধরি সে সম্বন্ধে অনুরোধ জানালেন। সেদিন এভাবে প্রচুর টাকা পাওয়ায় আমিও মনে মনে প্রচুর আনন্দ পেলাম।

এর পর থেকে প্রত্যেক দিনই আমার জিনিস-পত্রাদি নিয়ে প্রথমেই বৃদ্ধের কাছে যেতাম। তিনি কোনও সেরা জিনিস নিয়ে আমাকে প্রথম দিনের মতই প্রচুর অর্থ দিতেন। এই সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিনই তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু আমি কিছুতেই নিজের পরিচয় দিতাম না। ক্রমশঃ তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এতবড় উপকারী ও হিতার্থী ব্যক্তির কাছে আমি আর নিজের পরিচয় চেপে রাখা সঙ্গত নয় ভেবে একদিন তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে ফেললাম।

আমার পরিচয় শুনে তিনি বললেন—প্রথম থেকেই আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। তোমার পিতা আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। যাক্, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালই হয়েছে। তাহলে তোমাকে বলি বাপু, আমার নিজের কোনও পুত্রাদি নাই। তুমি আমার বাড়ীতে পুত্রের মতই থাকবে!

বৃদ্ধের অনুরোধ কাটিয়ে দেবার সামর্থ্য আমার ছিল না। সেই দিন থেকে বৃদ্ধের বাড়ীতে আমার দিন কাটতে লাগল। বৃদ্ধ আমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। এভাবে বছরদুয়েক দেখতে দেখতে কেটে গেল।

কিন্তু তারপর তিনি একদিন হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়লেন। আমি তখন বিচক্ষণ চিকিৎসকদের এনে তাঁর চিকিৎসা ও প্রাণপণে তাঁর সেবা করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। তাঁর জীবন প্রদীপ ক্রমশঃ নির্বানোন্মুখ হয়ে এল। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে তিনি একদা আমাকে ডেকে বললেন—আবুলকাসেম! আমার জন্য মিথ্যা দুঃখ করো না।

মানুষ চিরদিন বাঁচে না। আমার নিজের উপার্জিত টাকায় তোমার দিন ভালই কাটবে! এ ছাড়াও আমি তোমাকে একটি গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে দিচ্ছি। আমার বাবা এর সন্ধান আমাকে দিয়ে যান। কিন্তু তিনি অথবা আমি কেউ তা থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করিনি। কারণ তার প্রয়োজন হয় নি। তুমি যেমন দাতা ও দানশীল তাতে হয়ত সবকিছুই দান করে ফেলতে চেষ্টা করবে। কেননা, দান করা একটা নেশার মত অভ্যাস, একে দমন করা যায় না। কিন্তু আমি তোমাকে যে গুপ্তধন-ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছি, প্রচুর দান করলেও তার শেষ হবার ভয় নেই। তবে তুমি সতর্ক হয়ে দান করবে, নতুবা, সেই গুপ্তধন পাওয়ার কথা রাজার কানে উঠবে। তিনি তখন জোর করে সব কিছু অধিকার করবেন। এই বলে বৃদ্ধ সেই গুপ্তধনের সন্ধান আমাকে বলে দিলেন। তার দিন দুয়েক পরেই তাঁর মৃত্যু হল।

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর একদিন আমি তাঁর নির্দেশ মত সেই গুপ্ত ধনাগারে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা-জহরতাদির এমন বিস্ময়কর সঞ্চয় সে ঘরে রয়েছে যে, আমি সারাজীবন দান করলেও তার শতাংশের একাংশও খরচ হবে কিনা সন্দেহ। তা দেখে আমি ভাবলাম এত ধন এভাবে অনর্থক পড়ে থেকে লাভ কী? তার চেয়ে উপযুক্ত প্রার্থীকে এ সব দান করলে তাদের দুঃখ দূর হবে। এই ভেবে আমি সেইদিন থেকেই দান সম্পর্কে বৃদ্ধের উপদেশ লঙ্ঘন করেই মুক্তহস্তে দান করতে লাগলাম। বহু দীন-দরিদ্র আমার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়ে প্রাণে বাঁচল। কিন্তু ধীরে

ধীরে আমার দানের কথা যখন নগরে রটে গেল, তখন নগরের বহু কৃপণ ও দুশ্চরিত্র লোকও আমার কাছ থেকে দান নেবার আশায় এসে ভীড় করতে লাগল।

একদিন নগররক্ষক আমার কাছে এসে বলল—শুনেছি, তুমি নাকি গুপ্তধন পেয়েছ কাসেম? সেগুলো কোথায় আছে বল। আমি রাজার আজ্ঞা অনুসারেই সেই সমস্ত ধন নেবার জন্যে এসেছি।

একথা শুনে ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠল। আমি আর কথা বলতে পারলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখ সে বুঝতে পারল যে, তার অনুমানই ঠিক! তখন সে নরম হয়েই বলল—এর জন্যে তোমার কোনও ভয় নেই কাসেম! ঐ টাকা থেকে আমাকে সামান্য কিছু দিলেই এ কথা আর রাজার কানে যাবে না!

আমি বললাম— বেশ, দৈনিক কত করে পেলে তুমি খুশী হও?

সে হেসে বলল—দৈনিক দশ মোহর হিসেবে দিলেই হবে। এর বেশী আমি চাই না।

আমি বললাম—এই সামান্য টাকা পেলেই তুমি সন্তুষ্ট হবে? আচ্ছা, আমি তোমাকে দৈনিক একশত স্বর্ণমুদ্রা এই হিসেবে দেব।

এইভাবে আশার অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে সেও আমাকে অভয় দিয়ে একমাসের প্রাপ্য তিনহাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রস্থান করল।

কিছু দিন পরে রাজ্যের উজীর আমাকে ডেকে পাঠালেন। যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে খুব খাতির করে কাছে

বসিয়ে বললেন—শুনে সুখী হলাম যে তুমি প্রচুর গুপ্তধন লাভ করেছ। কিন্তু ন্যায়তঃ তার এক পঞ্চমাংশ রাজার প্রাপ্য। কিন্তু তা তুমি দাও নি। সেজন্যই তোমাকে আহ্বান করেছি। এখন তুমি রাজার ন্যায়-সঙ্গত প্রাপ্য অংশ দিয়ে অবশিষ্ট ধন ইচ্ছামত ব্যবহার কর।

আমি বললাম—আমি আপনাকে গুপ্তধনের কথা কিছুই জানাব না। তবে যদি আমার উপরে কোনও অত্যাচার করবেন না—এমন প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি আপনাকে দৈনিক হাজার মোহর বরাবর দিয়ে যাবে।

মন্ত্রী তখন মহানন্দে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে আমার সঙ্গে লোক পাঠালেন। আমি বাড়ী ফিরে এস সর্তমত একমাসের দেয় ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সেই লোকের হাতে দিয়ে দিলাম।

কপটস্বভাব মন্ত্রী কিন্তু তার কথা রাখল না; এরপর সে রাজার কাছে গিয়ে আমার গুপ্তধন প্রাপ্তির কথাটা বলে দিল। পরদিনই রাজা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন—কাসেম, আমি তোমার সৌভাগ্যের কথা জেনেছি। আমার ইচ্ছা তুমি আমাকে তোমার গুপ্তধনাগার দেখাও। তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার ধন তোমারই থাক্‌বে। আমি শুধু স্বচক্ষে দেখতে চাই।

রাজার কথা শুনে আমি হাত জোড় করে বললাম—মহারাজ, আমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ এমনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, আমার ধনভাণ্ডার কাউকে কখনো দেখাব না। সুতরাং সে ইচ্ছা ত্যাগ করুন। তবে আপনি যদি আমাকে হুকুম করেন, আমি তা থেকে প্রত্যহ দু'হাজার

স্বর্ণমুদ্রা রাজ-ভাণ্ডারে জমা দিতে প্রস্তুত আছি।

এ কথা শুনে রাজা মন্ত্রীর দিকে চাইলেন। মন্ত্রী তাঁকে কটাক্ষ করে রাজী হতে বললে তিনি বললেন—বেশ কাসেম, তাই হবে। তুমি আমার লোকের হাতে একমাসের প্রাপ্য ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দাও।

আমি বাড়ী ফিরেই রাজার অভিপ্রায় মত ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলাম। সেই থেকে আজ অবধি আমি এমনি দান করে চলেছি।

আবুলকাসেম গল্প শেষ করলে খলিফা বললেন—কিন্তু জনাব, আপনার ধনভাণ্ডার এত দানেও নিঃশেষ হয় না, এ কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি কি সেই গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার দেখিয়ে আমার সন্দেহ দুর করতে পারেন না ?

আবুলকাসেম একটু ভেবে বললেন—তাহলে কিন্তু আপনাকে আমার একটা নিয়ম মেনে নিতে হবে। আমি আপনার চোখ বেঁধে সেখানে নিয়ে যাব। তারপর সেখানে গিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হবে। এতে যদি আপনি সম্মত থাকেন, তাহলে আজ এখানেই রাত্রিবাস করুন। রাত্রে দাসদাসীরা ঘুমুলে আপনাকে নিয়ে যাব। খলিফা তাঁর কথায় সম্মত হলে আবুলকাসেম অতিথির পানভোজন ও শয়নের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রে খলিফার চোখ বেঁধে কাসেম তাঁকে একটি গোপন সিঁড়ি দিয়ে নামাতে নামাতে ভূ-গর্ভের একটি স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে একটি বারান্দা পেরিয়ে এবং চক্রাকারে একটি আঁকাবাঁকা পথ

পার হয়ে দু'জনে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাসেম কৌশলে দরজা খুলে বিরাট একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই খলিফার চোখ খুলে দিলেন।

চোখ খুলতেই খলিফা দেখতে পেলেন তাঁর সম্মুখে পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ পঞ্চাশ হাত প্রস্থ ও বিশ হাত গভীর একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গহ্বর স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রয়েছে। আবুলকাসেম সেটি খলিফাকে দেখিয়ে বললেন—দেখুন, এই কয়েক বৎসর দু'হাতে দান করেও আমি এক হাত পরিমিত স্থানের মুদ্রাগুলিও নিঃশেষ করতে পারিনি। সারা জীবন ধরেও যদি এভাবে আমি দান করে চলি, তবে এর শতাংশও নিঃশেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ।

খলিফা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন—কিন্তু তবুও যদি সব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন আপনার কি অবস্থা হবে ভেবেছেন ?

আবুলকাসেম নীরবে খলিফাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও ঐরূপ আর একটি গহ্বর হীরা, মুক্তা, চুণী, পান্না ইত্যাদি বহুমূল্য জহরতে পূর্ণ। এখন খলিফা আবুলকাসেমের দিকে চেয়ে বললেন—এবার আর আমার কোনও দ্বিমত নাই। আপনি খুশী মনে দু'হাতে দান করে যান। সত্যি আপনাকে কোনও দিনই যে ধন অভাবে কষ্ট পেতে হবে না, এ সম্বন্ধে আমি এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হ'লাম।

ধনরত্নাদি দেখিয়ে আবুলকাসেম খলিফাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি বৃদ্ধ পুরুষ ও রমণী পাশাপাশি শুয়ে ছিলেন।

দু'জনেই মৃত। কিন্তু তাঁদের দেহ এমন অবিকৃত যে দেখলে মনে হয় তাঁরা এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। আবুলকাসেম খলিফাকে বললেন—এঁরা দু'জনেই এই ধনের প্রকৃত মালিক। এঁরা বহু পূর্বে এদেশের রাজা ও রাণী ছিলেন। এঁদের নাম কি ছিল তা আমি জানি না!

মৃতদেহের পাশে একটি কাঠের ফলকে সোনার অক্ষরে লেখা ছিল—"আজীবন যুদ্ধ করে বহু দেশ জয় করেছি এবং এই সমস্ত ধনরত্নাদি সঞ্চয় করেছি। কিন্তু মানুষ মাত্রেই মৃত্যুর অধীন। তাই আমরাও চিরদিন বাঁচতে পারলাম না। মৃত্যুকালে উপদেশ দিচ্ছি, যে এই ধন পাবে সে যেন মুক্তহস্তে এ সমস্ত দান করে। সারা জীবন দান করলেও এ ধন নিঃশেষ হবে না।"

লেখাটি পড়ে খলিফা বললেন—কেন যে আপনার সেই বৃদ্ধ পিতৃবন্ধু এত ধন থাকতেও এগুলি দান করতে নিষেধ করেছিলেন তা আমি জানি না।

আবুলকাসেম বললেন—কিন্তু জনাব, এত ধনরত্নাদির মালিক হয়েও আমার জীবনে সুখ নাই। দার্দেনির চিন্তাই দিবারাত্রি আমাকে ব্যাকুল করে রেখেছে। যতদিন না তাকে আবার দেখতে পাচ্ছি, ততদিন প্রতিটি মূহুর্ত আমার দুঃসহ মনে হচ্ছে। এর চেয়ে যদি দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও দার্দেনিকে পেতাম সেই হতো আমার পক্ষে অনেক ভাল।

কথার শেষে খলিফা কাসেমের সঙ্গে পুনরায় চোখ বন্ধ অবস্থায় উপরে উঠে এলেন। পরদিনই ভোরে তিনি আবুলকাসেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোগ্‌দাদের দিকে যাত্রা করলেন।

বসরার উজীর ও তাঁর কন্যা বালকেশী

খলিফার বোগ্‌দাদ যাবার পরদিন আবুলকাসেম এক দারুণ বিপত্তির সম্মুখীন হলেন। বসরার উজীরকে তিনি প্রত্যহ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। কিন্তু তাতেও উজীরের তৃপ্তি নেই। দিন দিন তাঁর লোভ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শেষে তিনি স্থির করলেন; যেমন করেই হোক আবুলকাসেমের গুপ্তধনাগার সম্বন্ধে সঠিক সমস্ত খবর তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোনও উপায়ই তিনি খুঁজে পেলেন না।

তখন তিনি মনে মনে এক উপায় খুঁজে বের করলেন; উজীরের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁর নাম ছিল বালকেশী। অপূর্ব রূপ ও লাবণ্যের সমাবেশ তার দেহে। অনুপম লাবণ্য-সম্ভারে কমনীয় অঙ্গ তার পূর্ণ। তার উপরে সে ছিল বুদ্ধিমতী ও চতুরা। সুযোগ বুঝে উজীর তাকে বললেন—দেখ মা, এই শহরে আবুলকাসেম নামে বিপুল ধনশালী ব্যক্তি বাস করে। তার বাড়ীতে তুমি আজ রাত্রেই যাবে। সেখানে বিশাল গুপ্তধন-ভাণ্ডার আছে। যেমন করেই হোক্‌ তুমি কৌশলে তার সন্ধান করে আমাকে জানাবে। তোমার মত বুদ্ধিমতীকে নিশ্চয়ই এর বেশী আর কিছু বলতে হবে না।

বালকেশী পিতার মুখে এই অন্যায় কথা শুনে বলল—এই ধরণের অন্যায় আদেশ আমাকে করবেন না বাবা। তিনি আমাদের প্রাপ্য হিসাবে যে প্রচুর অর্থ পাঠাচ্ছেন, তাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর বেশী আশা করে অবশ্যম্ভাবী বিপদ টেনে আনা সঙ্গত নয়। আপনি নিরস্ত হোন বাবা।

এ কথা শুনে উজীর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললেন—আমাকে আর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে না ; যা আদেশ করছি, তাই কর!

বালকেশী বলল—কিন্তু যে শাহজাদার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে, তিনি এ সব শুনলে যে ক্রুদ্ধ হবেন—এ কথা ভেবেছেন আপনি ? অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ীতে এভাবে একাকিনী রাত্রে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে ?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উজীর বললেন—আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না। এখন আমার আদেশ এই মুহুর্তেই তুমি বেশভূষা করে প্রস্তুত হও। আমার আদেশ না শুনলে, তোমার ভালো হবে না মনে রেখো।

কাঁদতে কাঁদতে বালকেশী নিজের ঘরে গিয়ে বেশভূষা করল। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে উজীর তাকে বেঁধে আবুলকাসেমের বাড়ীর সামনে নিয়ে গেলেন! সেখানে তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে সেখানে রেখে—কথাটা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে এলেন।

বালকেশী যখন আবুলকাসেমের ঘরে প্রবেশ করল তখনও তাঁর নৈশ আহার হয় নাই—তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন।

আবুলকাসেম তাঁকে দেখে ধীরকণ্ঠে বললেন—দেবী, কি জন্য এই দীনের কুটীরে আপনার পদধূলি পড়েছে, তা খুলে বলুন।

বালকেশী উত্তর দিল—আপনার খ্যাতিতে সমস্ত দেশ পরিব্যাপ্ত। আপনার সমস্ত যশরাশির সৌরভই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। উদ্দেশ্য, আপনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় করা। এই কথা বলে বালকেশী তার মুখের অবগুণ্ঠন খুলে ফেলল।

আবুলকাসেম তার মধুর কথা ও আলোকসামান্য মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হলে বললেন—সুন্দরী, তোমার শুভ আগমনে আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আজ আমার বড়ই শুভদিন। এই কথা বলে আবুলকাসেম তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর নৈশ আহারের প্রচুর আয়োজন প্রস্তুত। তিনি তখন বালকেশীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে দু'জনে একত্র বসে আহার করতে লাগলেন। আহারের সময় আবুলকাসেম একান্ত মুগ্ধ-নয়নে বালকেশীর মুখের দিকে ঘন ঘন চাইতে লাগলেন। আজ যেন তাঁর মনে হল, দার্দেনির পর পৃথিবীতে যদি সত্যিকারের সুন্দরী কোনও মেয়ে থাকে ত সে এই বালকেশী। আহার শেষ করে আবুল কাসেম বললেন—সুন্দরী, তোমাকে প্রথমে দেখেই আমার খুবই ভাল লেগেছে। তুমি যদি সম্মত থাক, তাহলে আমরা দু'জনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারাজীবন আনন্দে অতিবাহিত করি।

বালকেশী একথা শুনেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল—জনাব, আমার পিতা দূরদেশের এক শাহজাদার সঙ্গে আমার

বিবাহ স্থির করেছেন। আপনার এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অসম্ভব। কথার সঙ্গে সঙ্গেই বালকেশীর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। সুন্দরীর অশ্রুপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে আবুলকাসেম গাঢ়স্বরে বললেন—তুমি যে উচ্চবংশের কন্যা, তা বুঝতে পারছি। তবে কেন তুমি রাত্রে একাকিনী এভাবে আমার বাড়ীতে এসেছিলে ?

বালকেশী এ কথা শুনে ধীর-কণ্ঠে বলল—আমার পিতার আদেশে আমি এভাবে আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আপনার গুপ্তধনাগার দেখে তাঁকে তার সন্ধান দিই।

আবুলকাসেম একথা শুনে উজীর কন্যার চোখ দুটি একটি কালো কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন। তারপর তাকে উপস্থিত করলেন গুপ্তধনের কক্ষে।

বিপুল গুপ্তধন দেখে বালকেশী বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তার পর বিহ্বলভাবে বললো—সত্যি আপনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক। আজ আমি বুঝতে পারছি কেন আপনার গুপ্তধনের প্রতি আমার পিতার এত লোভ।

আবুলকাসেম এ কথা শুনে প্রশ্ন করলেন—তোমার পিতা কে ?

বালকেশী ধীর-কণ্ঠে বললো—আমি এদেশের উজির কন্যা।

আবুলকাসেম বললেন—তোমার প্রস্তাব শুনেই আমার মনে এই রকমই সন্দেহ হয়েছিল। সে যাই হোক, তুমি যখন এ গরীবের কুটীরে পদার্পণ করেছ তখন এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।

এর পর কাসেম কতকগুলি মহামূল্য মুক্তামালা ও রত্নালঙ্কার তার সামনে রেখে দিলেন। বালকেশী সেগুলি গ্রহণ করলে কাসেম তাকে ধনাগার থেকে বাহিরে এনে তার বাড়ীতে তাকে রেখে এলেন।

পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে মন্ত্রী কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন—আবুলকাসেমের ধনাগার কেমন?

বালকেশী বলল—আবুলকাসেমের ধনাগার পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার চেয়ে বড় তার চরিত্র। এই বলে বালকেশী ধীরে ধীরে আবুলকাসেমের অজস্র গুণগান করলো। কিন্তু কোন কথাই উজীরের কাণে গেল না। তিনি তখন ধনাগারের স্বপ্নে বিভোর।

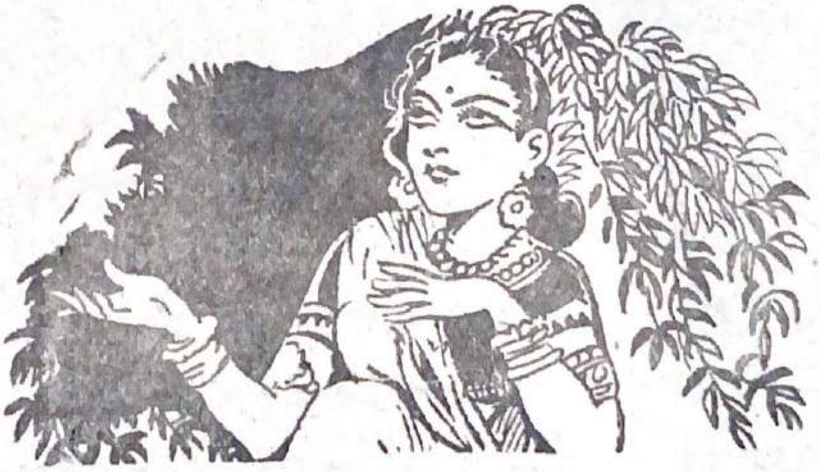

উজীরের কারামোচন

যে সময়ে বসরা নগরীতে ওই ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সময় হারুণ-অর-রশীদ স্বরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনে রাজভবন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল।

রাজভবনে পা দিয়েই তিনি সর্বপ্রথমে উজীর জাফরকে মুক্ত করে সসম্মানে আবার তাঁকে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করলেন। খলিফা তাঁর কাছে আবুলকাসেমের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বললেন—মন্ত্রী, আমি আবুলকাসেমের কাছ থেকে যে সমস্ত মহামূল্য উপহাররাজি উপহাররূপে পেয়েছি, আমার এমন কিছুই নাই যা তাকে প্রতিদানস্বরূপ দিয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারি।

উজীর বললেন—বাদশাহ্, বসরা আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আপনি আবুলকাসেমকে রাজছত্র প্রদান করিলেই তাঁর বদান্যতার উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। বসরার রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই দুষ্ট এবং খল প্রকৃতির। আপনি দূত পাঠিয়ে আগে বসরারাজকে এ খবর জানিয়ে দিন। তার পর আমি নিজে গিয়ে অভিষেক কার্য সম্পন্ন করব।

খলিফা বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। বসরারাজ ও তার উজীরের অন্যায় আচরণের প্রতিফল দেওয়া উচিত। এই বলে তিনি সেই মুহূর্তেই বসরারাজের কাছে একখানি পত্র লিখে দূত পাঠালেন।

তারপর খলিফা রাজকার্য শেষ করে অন্তঃপুরে গিয়ে বেগমকে আবুলকাসেমের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। খলিফা বললেন—তোমার কথা শুনে সত্যিই আমি ভাল করেছিলাম বেগম। তা না করলে, হয়ত সেই ক্রোধের মুহূর্তে উজীরকে মিথ্যা শাস্তি দিয়ে অনুতপ্ত হ'তাম।

অতঃপর তিনি আবুলকাসেমের কাছ থেকে প্রাপ্ত তরুণী, বালক, ময়ুরী ও বৃক্ষটি বেগমকে প্রদান করলেন। খলিফা কেবলমাত্র সেই অক্ষয় পান-পাত্রটি নিজের কাছে রাখলেন। তারপর অবশিষ্ট জিনিষগুলি তিনি মন্ত্রীকে দান করলেন।

বসরার রাজমন্ত্রী

আবুল ফাত্তার ষড়যন্ত্র

বোগ্‌দাদের খলিফার দূত বসরার রাজাকে চিঠিখানি দিলে তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, সুলতান আদেশ করেছেন যে, অবিলম্বে আবুলকাসেমকে রাজ্যভার সমর্পণ করে আমাকে নগর ত্যাগ করতে হবে। এ কি অবিচার ? আমি এখন বলপ্রয়োগ করব, না সুলতানের আদেশ মেনে চলব ?

রাজমন্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত খল এবং কুটিল। প্রকৃতি অনুযায়ী সে পরামর্শ দিল, শাহানশাহ, রাজ্যরক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। তবে বাহুবলে খলিফার সম্মুখীন হওয়া আপনার কাছে বাতুলতামাত্র। আপনার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৌশল অবলম্বন করা।

—কিন্তু কি সে কৌশল ? অবাক হয়ে বসরারাজ প্রশ্ন করলেন।

—আপনার চিন্তিত হবার কারণ নেই। যা করতে হয়, আমিই করছি। এই বলে তিনি কয়েকজন গণ্যমান্য লোক নিয়ে তখনই যাত্রা করলেন আবুলকাসেমের বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে এতগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে আসতে দেখে আবুলকাসেম সন্তুষ্ট হয়ে তখনি তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তারপর তাঁদের সুরা ও খাদ্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। সুযোগ বুঝে এক সময় উজীর কাসেমের অজ্ঞাতে তাঁর মদ্যে তীব্র বিষ দিলেন। সেই মদ্য পান

করেই আবুলকাসেম অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন উজীর ঘোষণা করলেন—কাসেমের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই আবুলকাসেমের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। শয়তান উজীরও আবুলকাসেমের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য কান্নার ভাণ করতে লাগলেন।

মুহূর্তের মধ্যে আবুলকাসেমের মৃত্যু সংবাদে রাজ্যময় কান্নার রোল পড়ে গেল! মন্ত্রী তখন কাসেমকে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করে সেটি সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে সমাধিস্থ করলেন। তারপর শবযাত্রী অন্যান্য লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলে উজীর ধীরে ধীরে সেই কবর হ'তে বাক্সটি উঠিয়ে তার ভিতর থেকে আবুলকাসেমকে বের করে ঔষধ প্রয়োগে তাঁর জ্ঞানসঞ্চার করলেন।

চৈতন্য ফিরে আসতেই আবুলকাসেম চারিদিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন —আমি কোথায়?

শয়তান উজীর বললেন—সমাধিক্ষেত্রে। তোর গুপ্তধনাগার কোথায় আছে বল, না হলে এই মুহূর্তে তোর প্রাণ বধ করব।

আবুলকাসেম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তার সন্ধান তোকে দেব না।

মন্ত্রী রেগে বললেন—কি, এতদূর আস্পর্দ্ধা? বেশ, দেখি তুই বলিস কিনা? এই বলে সে আবুলকাসেমের হাত পা, বেঁধে তাকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল! কাসেম মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সে তাঁকে বাক্সের মধ্যে পুরে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

তারপর উজীর রাজার কাছে এসে সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বললেন।

আবুলকাসেমের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে প্রশ্ন করলেন— কিন্তু খলিফাকে কি জানাব উজীর ?

উজীর হেসে বললেন—খলিফাকে লিখে দিন যে, হঠাৎ এতবড়ো একটা আনন্দ সংবাদ পেয়ে আনন্দে আবুলকাসেমের আত্মা দেহত্যাগ করেছে। সুলতান উজীরের বুদ্ধির প্রশংসা করে সেই অনুযায়ী কাজ করলেন।

এদিকে উজীরের সমস্ত কার্য লক্ষ্য করছিল বালকেশী এবং তার ভাবী স্বামী শাহজাদা। উজীর চলে গেলে তারা যখন জানতে পারল যে সত্যি আবুলকাসেমের মৃত্যু হয়নি, তখন তারা ছুটে গিয়ে সমাধি থেকে তাঁকে তুলে মুক্তি দিল। বালকেশী বলল—আপনার বাড়ীতে হঠাৎ পিতার গমন করা এবং তার পরেই আপনার আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তখন আমার সন্দেহের কথা আমার ভাবী স্বামীকে জানাই এবং দু'জনে সমাধিক্ষেত্রে এসেই পিতাকে আপনার উপরে অত্যাচার করতে দেখি, আল্লাকে ধন্যবাদ যে, ঠিক সময়েই আমরা এসে পড়েছিলাম। আপনার মত মহৎ লোককে আল্লা অত সহজে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারেন না।

আবুলকাসেম অবাক্ হয়ে বললেন—এরূপ নিষ্ঠুর শয়তানের কন্যা বেহেস্তের এমন পবিত্রা দেবী যে কি করে হতে পারেন তা সত্যিই আশ্চর্য।

শাহজাদা বলল—আপনার আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।

আবুলকাসেমকে তাঁরা একটি দ্রুতগামী ঘোড়া দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে আবুলকাসেম বোগ্‌দাদের দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে উজীরের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বসরারাজ বললেন—চলুন ত, আমি একবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখি, যদি আবুলকাসেমের কাছ থেকে কোনও উপায়ে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। তারপর তাঁরা দু'জনে সমাধিক্ষেত্রে এসে দেখলেন যে আবুলকাসেম সমাধিতে নাই। শূন্য শবের বাক্স খাঁ খাঁ করছে।

এই দৃশ্য দেখে দু'জনেই কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। অবশেষে সুলতান ভীত ও বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—উজীর, তুমি টাকার লোভে বিরাট এক ভুল করে ফেলেছ। কাসেম যখন কবরের মধ্যে নাই, তখন সে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়ে পলায়ন করেছে। যদি সম্রাটের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা সে প্রকাশ করে বলে—তখন আমাদের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? ছি ছি, তোমার অর্থলোভের জন্য অকালে প্রাণটা নষ্ট হল। অতঃপর তাঁরা দু'জনে সৈন্যদল নিয়ে দু'দিকে যাত্রা করলেন আবুলকাসেমের সন্ধানে।

বসরার রাজা ও মন্ত্রী যখন আবুলকাসেমের খোঁজে ব্যস্ত, তখন বোগ্‌দাদের দূত ফিরে গিয়ে মাঝপথে উজীর জাফরকে আবুলকাসেমের মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

বসরারাজের চিঠি দেখে উজীরের মনে সন্দেহ হ'ল। তিনি বোগ্‌দাদে ফিরে এসে খলিফাকে বললেন—এতে নিশ্চয়ই বসরার

রাজা ও মন্ত্রীর কারসাজী আছে। আবুলকাসেমের মতো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী লোক কখনই বসরার সামান্য গদী প্রাপ্তির আনন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে না।

খলিফা শুনে রেগে বললেন—তুমি যত শীঘ্র পার, ওই দুই দুষ্টকে বেঁধে এনে আমার সাম্‌নে উপস্থিত কর জাফর। ওদের যোগ্য শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

জাফর তখনই বিরাট একদল সৈন্য নিয়ে বসরার দিকে যাত্রা করলেন।

হাস্কৌনির সাথে পুনর্মিলন

তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আবুলকাসেম কয়েকদিনের মধ্যেই বোগদাদে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মনে আশা ছিল, পূর্বে বোগ্‌দাদের যে সওদাগরকে তিনি আতিথ্যে তুষ্ট করেছিলেন, তাঁর কাছেই এই বিপদে হয়ত সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু বোগ্‌দাদের প্রতিটি পল্লীতে খোঁজ করেও তিনি সেই সওদাগরের দেখা পেলেন না। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে তিনি খলিফার প্রাসাদ সামনে পথের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এই সময়ে তাঁরই প্রদত্ত অফুরন্ত সুরাপাত্র-বাহক বালকটি প্রাসাদের জানালায় বসেছিল! সে আবুলকাসেমকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে সেই সংবাদ খলিফাকে জ্ঞাপন করল।

সম্রাট প্রথমে তার কথায় বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু ঘটনাটা কি জান্‌বার জন্যে তিনি বালকের সঙ্গে একজন প্রহরীকে পাঠালেন। প্রহরীর সাথে বালক বাইরে এসে আবুলকাসেমকে দেখেই ধূলায় লুটিয়ে পড়ে সালাম করে বলল—প্রভু, মহামান্য খলিফা আপনার দর্শন প্রার্থী। আমার সাথে আসুন।

অবাক্ হয়ে আবুলকাসেম প্রশ্ন করলেন—তুমি এই খলিফার প্রাসাদে এলে কিরূপে?

বালক হেসে উত্তর দিল—আমাকে আপনি যে সওদাগরকে দান করেছিলেন, তিনিই যে বোগদাদের খলিফা। সওদাগরের ছদ্মবেশে আপনার আলয়ে গিয়েছিলেন।

আবুলকাসেম এ কথা শুনে আনন্দে বিহ্বল হয়ে খলিফার কাছে এলেন। স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন খলিফা আবুলকাসেমকে দেখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আহ্বান করে তাকে পাশে বসালেন। তারপর বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করলেন, কাসেম, বন্ধু, তোমার এ দশা কেন ? আমি এর আগেই তোমার যে মৃত্যুসংবাদ শুনেছি—সেটাই বা কিভাবে সম্ভবপর বল।

আবুলকাসেম তখন সমস্ত কথা খলিফার কাছে খুলে বললেন। শুনে খলিফা উত্তর দিলেন—কাসেম, তাহলে আমিই তোমার সব দুর্গতির কারণ। বসরার রাজার কাছে আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম সেটা পেয়েই সে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। এই বলে খলিফাও ধীরে ধীরে সব প্রকাশ করলেন। অবশেষে বললেন—যাক্, কোনও চিন্তা নাই বন্ধু। শয়তান বসরারাজ ও উজীর আবুলফাতাকে ধরে আনবার আদেশ দিয়েছি। স্বয়ং উজীর জাফর এই কাজের ভার নিয়ে গেছেন। তোমার কোন চিন্তা নাই।

খলিফা তখন আবুল কাসেমকে স্নান করিয়ে সুন্দর বেশভুষায় সাজালেন। তারপর তাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রাণীর মহলে।

রাণী তখন রত্ন সিংহাসনে বসে সখীদের গান বাজনা শুনছিলেন। সখীরা বাদ্য-যন্ত্রাদি নিয়ে চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। মাঝখানে

দাঁড়িয়ে অপূর্ব লাবণ্যময়ী একটি নারী সুমধুর কণ্ঠে গান করছিল।

খলিফা বললেন—রাণী; এই আমার বন্ধু আবুলকাসেম—যার অফুরন্ত ধনদৌলত ও অতুলনীয় দানের কথা তোমায় বলেছিলাম।

এ কথা শুনে কাসেম ভক্তিভরে রাণীকে সালাম করলেন। ঠিক এই সময় সখীদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে যে রূপসী নারীটি নৃত্য করছিল, সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ল।

আবুলকাসেম তখন সেই রমণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তাঁর চোখ দুটিও অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনিও ছুটে গিয়ে সেই নারীর মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন।

খলিফা এ সব দেখে ছুটে নিকটে এসে প্রশ্ন করলেন—এ নারীকে তুমি কি পূর্বে কোথাও দেখেছ কাসেম ?

কাসেম অনেক চেষ্টায় নারীর চৈতন্য সঞ্চার করে বললেন—জাঁহাপানা, এই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রতিমা। যার বিরহে আমি দিনরাত অফুরন্ত দুঃখ নিয়ে দিন কাটিয়েছি।

দার্দেনিকে লক্ষ্য করে খলিফা প্রশ্ন করলেন—তুমি তবে এখানে কি করে এলে ?

দার্দেনি বলল—জাঁহাপনা, আমি সমুদ্রের পানিতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এক জেলের জালে আবদ্ধ হই। তারপর আমাকে তীরে নিয়ে গিয়ে সেই জেলে অনেক কষ্টে আমার নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনে। তারপর সে আমাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। আমি তখন তাকে সমস্ত কাহিনী খুলে বলি। সব শুনে সে ভীত হয়ে এক দাসী বিক্রেতার

কাছে আমাকে বিক্রী করে দেয়। সে আমাকে বোগদাদের রাণীর কাছে বিক্রয় করে চলে যায়।

দার্দেনি যখন এইসব কথা বলছিল তখন বাদশাহ্ অবাক হয়ে তার অনুপম সৌন্দর্যের দিকে চেয়েছিলেন। দার্দেনির কথা শেষ হলে খলিফা রাণীকে বললেন—আমার একটা অনুরোধ রাণী, তুমি এঁকে আবুল-কাসেমের হাতে ফিরিয়ে দাও।

রাণী বললেন—জাঁহাপনা, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। তার কয়েকদিন পরেই দার্দেনির সাথে আবুলকাসেমের বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই উপলক্ষে তিনদিন রাজ্যজুড়ে নাচ গান ও ভোজন-উৎসব চলতে লাগল।

এর দিনকয়েক পরেই উজীর জাফর বসরার উজীরকে বন্দী করে নিয়ে এল। রাজা অনেক আগেই পলায়ন করেছিলেন বলে তাকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি।

খলিফা বললেন—রাজার চেয়েও এই দুষ্ট উজীরের পাপ বেশী। তাই এর প্রতি আমি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি। আশা করি অবিলম্বে এই আদেশ প্রতিপালিত হবে!

উজীর এ কথা শুনে স্তব্ধভাবে চেয়ে রইল। দরবারের সমস্ত লোক আনন্দে বলে উঠল—শয়তানের উচিত শাস্তি হয়েছে।

কিন্তু আবুলকাসেম বললেন—জাঁহাপনা, অনুতাপের চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই নাই। ওকে আজই রাজ্য থেকে বের করে দিন। ও মনের অনুতাপের আগুনে দিবারাত্র পুড়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করবে।

এ কথা শুনে খলিফা কাসেমকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—সত্যি কাসেম, তুমি প্রকৃতই সাধু। তোমার গুণের তুলনা নাই। এই বলে খলিফা উজীরকে মুক্তি দিয়ে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন! তারপর খলিফা বললেন—যাক্, তুমি এখন বসরার রাজা হতে সম্মত হও কাসেম।

আবুলকাসেম বললেন—না শাহানশাহ, শাহজাদা আলী ও বালকেশীই আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। তাই ওদের দু'জনকে বসরার রাজা ও রাণী করে দিন।

বাদশাহ তখন সেই আদেশ দিলেন।

রাজ্যশুদ্ধ লোক আবুলকাসেমের ত্যাগের কথা শুনে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এর কয়েকদিন পরে বাদশাহ মহাসমাদরে বহু হস্তী, অশ্ব ও প্রচুর ধনরত্নাদি উপহার দিয়ে কাসেমকে বিদায় দিলেন। সম্রাটপ্রদত্ত সেই সব উপহার সামগ্রীসহ বসরায় ফিরে গিয়ে প্রিয়তমা দার্দেনির সাথে মনের সুখে আবুলকাসেম কালযাপন করতে লাগলেন। বসরারাজ ও রাজ্ঞী বালকেশীর সাথেও তাদের সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণ রইল।

ধাত্রী এইভাবে আবুলকাসেমের সমস্ত বৃত্তান্ত গল্প করে রাজকন্যা ফরোখনাজকে শোনালেন। সখীরা এই গল্প শুনে আবুলকাসেম ও খলিফাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। তারা সকলেই বলল—আবুলকাসেমের চরিত্রই এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্র। তার মত দানবীর, দয়ালু ও প্রেমিক পৃথিবীতে সত্যই দেখা যায় না।

কিন্তু রাজকন্যা বললেন—সখিগণ, গুপ্তধনের প্রভাবে আবুলকাসেম

ঐশ্বর্যশালী ও বদান্য ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁকে যথার্থ প্রেমিক বলা যায় না। যথার্থ প্রেমিক হলে দার্দেনির রূপই তাঁর মনে চিরদিন বিরাজ করত। তিনি কখনই বালকেশীকে দেখে মুগ্ধ হতেন না! প্রেমিকার মৃত্যু হলেও যে লোক অন্য কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হন, তাঁকেই প্রকৃত প্রেমিক বলা চলে। কিন্তু এমন আদর্শ চরিত্র পুরুষদের মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না।

ধাত্রী একথা শুনে বললেন—রাজকন্যা, দয়িতার প্রতি চির-অনুরাগী প্রকৃত প্রেমিক পুরুষের কথাও আমি জানি। যদি তোমার শুনতে আপত্তি না থাকে, তাহলে তেমনি প্রেমিক পুরুষের কাহিনীও বলতে পারি।

রাজকন্যা মৃদু হেসে বললেন—বেশত, বল তুমি, শুনতে আমার আপত্তি নেই।

সখীরাও সে কাহিনী শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। তখন বুদ্ধিমতী ধাত্রী বেছে বেছে রাজা রাজবন শাহের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন ঃ

রাজা রাজবনশাহ্
এবং
চিরস্থানী রাজকন্যার কাহিনী

বঙ্গ-ভারতের পূর্বদিকে চীনদেশ। অতি প্রাচীনকালে এ দেশে রাজবনশাহ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। মৃগয়ায় তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

একদিন তিনি মৃগয়ায় বের হয়ে শীকার সন্ধানে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। সেখানে একটি কৃষ্ণবর্ণের সুন্দর হরিণী তাঁর চোখে পড়তেই তার পেছনে পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। বহুক্ষণ ছুটাছুটীর পর হরিণী একটি নদীর তীরে আসতেই রাজা সুযোগ বুঝে যেই তাঁর ধনুক তুললেন অমনি সে একলাফে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা তখন নদীর তীরে এসে সেই হরিণীকে আর দেখতে পেলেন না।

এমন একটি কাণ্ড দেখে রাজা সেই হরিণী সম্বন্ধে চিন্তা করছেন, এমন সময় তাঁর সৈন্যসামন্তরা ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। রাজা উজীরকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন।

উজীর বললেন—ও হরিণীকে আর দেখতে পাবেন না। চলুন আমরা ফিরে যাই।

উজীরের কথা শুনে রাজা হেসে বললেন—না-না, সে কি হয়! সন্ধ্যা নেমে আসছে। আজ আর ফিরে যাওয়া চলে না। এখানেই শিবির ফেলবার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে হয়, রাত্রে নিশ্চয়ই আমরা হরিণীকে দেখতে পাব।

রাজার কথা শুনে উজীর বললেন—বেশ! সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আজকের মত এখানেই বিশ্রাম করা যাক। কাল সকাল হলে আমরা রাজধানীর দিকে যাত্রা করব।

রাত্রে সৈন্যদের বিশ্রাম করতে বলে রাজা ও উজীর দু'জনে নদীতীরে এসে নীরবে বসে রইলেন। দু'জনেরই একাগ্র-দৃষ্টি নদীর প্রতি নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার দুর করে চাঁদ উঠল। তার মৃদু কিরণের অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে হেসে উঠল পৃথিবী। মৃদু বাতাস বয়ে চলল।

হঠাৎ বহুদুর থেকে ভেসে এলো নৃত্যগীতের মধুর শব্দ। রাজা ও উজীর বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কিছুদুরে বৃহৎ এক অট্টালিকা। উজীর বিস্মিত-কণ্ঠে বললেন—কই, ইতিপূর্বে এই অট্টালিকা ত এখানে দেখিনি! নিশ্চয়ই এ কোনও মায়াবিনীর কীর্তি।

রাজবনশাহ বললেন—চলুন, আমরা দেখি, কারা ওই অট্টালিকার মধ্যে নাচ-গান করছে।

উজীর বললেন—না মহারাজ, তাহলে আমরা ওই মায়াবিনীদের কবলে গিয়ে পড়ব।

রাজবনশাহ বললেন—মিথ্যা ভয় দুর করুন! যদি আপনার সাহস না থাকে তবে ওখানেই অপেক্ষা করুন! আমি একাই ওখানে যাই।

অগত্যা উজীরও রাজার সঙ্গে যেতে বাধ্য হলেন। উভয়ে অট্টালিকার সাম্‌নে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। তখন নির্ভয়-হৃদয়ে দ্বার অতিক্রম করে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখন দেখতে পেলেন, অসংখ্য আলোকে ভিতরের গৃহটি শোভিত। চারিদিকে বহুমূল্য রত্নখচিত আসবাবপত্র। সেই শোভিত ঘরের মধ্যে দু'জনে প্রবেশ করতেই অপূর্ব এক সৌরভ অনুভব করলেন। আরও দেখলেন, ঘরের দেওয়ালে নানা ধরণের বহু চিত্রাদি-শোভিত রয়েছে এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি পরমা-সুন্দরী যুবতী সখীপরিবৃত হয়ে বসে আছেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত।

রাজাকে দেখতে পেয়ে সুন্দরী সসম্ভ্রমে উঠে তাঁর হাত ধরে পাশে বসালেন। সুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে রাজা অনিমেষ নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। রাজাকে উদ্দেশ্য করে সুন্দরী বললেন—মহারাজ, আপনাকে প্রথমে দেখেই সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি হরিণীবেশে এই বনে খেলা করে থাকি। জন্মের পর জন্ম থেকেই আমি অলৌকিক এক শক্তি লাভ করি—তাতে আমি ইচ্ছামত যে কোন মূর্তি ধরতে পারি। তবে এখন যা দেখছেন, এই আমার স্বাভাবিক রূপ। সেদিন আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে হরিণীবেশে এখানে ভুলিয়ে এনেছিলাম।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—সুন্দরী, তুমি যে অসাধারণ মায়াবিনী তাতে সন্দেহ নাই। সত্যি তোমার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমিও তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সে যাই হোক,

সারাদিন ঘুরে আমরা বড়ই পরিশ্রান্ত। এখনো আমাদের পানাহার হয়নি, এখানে তার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

'নিশ্চয়ই আছে।' বলেই তখনই নানাবিধ সুখাদ্য -আনিয়ে রাজা এবং উজীরকে আহার করাইলেন। রাজা সুন্দরীকে আহারের জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন—আমরা অপ্সরা জাতি। খাদ্যের ঘ্রাণেই আমাদের উদর পূর্ণ হয়ে যায়। খাবার প্রয়োজন থাকে না।

রাজা ও উজীর পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহারাদি সমাপ্ত করলে যুবতী রাজাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর রাজাকে লক্ষ্য করে বললেন—মহারাজ, আপনি মানুষ, যোনীর দিক দিয়ে আমার চেয়ে আপনি নীচে। কিন্তু তবু আমি আপনার প্রণয় আশে আবদ্ধ হয়েছি। সে যাই হোক, এবার আমি আপনাকে আমার পরিচয় দিচ্ছি শুনুন।

সমুদ্রের মধ্যে চিরস্থান নামক একটি দেশ আছে। সেই স্থান দৈত্যদের আবাসভূমি। আমি সেই দ্বীপের রাজা মেনটরের কন্যা। আমার নাম চিরস্থানী। তিন মাস অতীত হলে আমরা মানুষের আবাস-ভূমি দেখবার জন্য একবার করে পিত্রালয় হতে চলে আসি। পরে সমস্ত দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, নদী, পর্বত ঘুরে বেড়িয়ে আকাশ পথে ফিরে যাই। আপনার রূপলাবণ্য দেখে আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম—ছি ছি, অপ্সরা হয়ে কেন আমি মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হব ? কিন্তু কিছুতেই নিজেকে নিবৃত্তি করতে পারিনি। তাই আপনি আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন।

চিরস্থানী এই কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক দৈত্য কন্যা সাশ্রুনেত্রে এসে উপস্থিত হল। তারপর চিরস্থানীকে লক্ষ্য করে বলল—রাজকন্যা, দৈত্যরা মানুষের চেয়ে দীর্ঘজীবী হলেও নিয়তির হাত থেকে তাদেরও পরিত্রাণ নাই। কাল তোমার পিতা প্রাণত্যাগ করেছেন। আমি চিরস্থানের উজির কন্যা। তুমি এখন সেখানকার সিংহাসনের অধিকারিনী। পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

চিরস্থানী একথা শুনেই শোকাকুল হয়ে ক্ষণকাল বিলাপ করলেন। তারপর রাজাকে বললেন—মহারাজ, আমাকে এখনি দেশে ফিরে যেতে হবে। আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি বটে; কিন্তু আপনার কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। যদি আপনি সত্যিকারের প্রেমিক হন, তবে নিশ্চয়ই আবার আমার দেখা পাবেন।

কথাগুলি বলেই অশ্রুমুখী দৈত্যকন্যা চিরস্থানী সখীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন।

পরক্ষণে সেই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদটিও অদৃশ্য হ'ল এবং চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রাজা এবং উজীর উভয়েই পুতুলের মত সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলেন।

ক্রমে প্রভাত হ'ল। পাখীরা গেয়ে উঠল প্রভাতী গান। রাজা বললেন—উজীর, এতক্ষণ বোধ হয় আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম।

উজীর বললেন—মহারাজ, এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়। মায়াবিনী যাদুবলে আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চলুন, এবার রাজ্যে ফেরা যাক।

মন্ত্রী এইভাবে রাজাকে প্রবোধ দিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু রাজা সেই মনোহারিণী নারীকে ভুলতে পারলেন না।

দিনের পর দিন চিরস্থানীর চিন্তায় তিনি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে মনের দুঃখে তিনি একদিন রাজ্য ছেড়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

কিছুদিন ভ্রমণ করে তিনি তিব্বত দেশের কাছে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে রাজধানী দু'দিনের পথ। রাজা বিশ্রামের জন্য ঘোড়া থেকে নেমে সামনেই দেখতে পেলেন পরমাসুন্দরী একটি নারী গাছের নীচে বসে কাঁদছে। তার বয়স প্রায় আঠারো বছর, দুঃখ-আঁধার তার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করেছে। বেশভূষা ছেঁড়া ও মলিন। অনাহারে শরীর জীর্ণ—অস্থি-চর্ম সার। কিন্তু তবুও তার অপরূপ সৌন্দর্যে স্থানটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। রাজা তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—সুন্দরী, আপনি কে? আর কিজন্যই বা এই অবস্থায় পড়েছেন।

সুন্দরী কান্না থামিয়ে বলল—জনাব, আমার কাহিনী শুনলে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না! তবুও আপনাকে আমার কথা বলছি—

তিব্বত দেশীয় রাজা ও রাণীর কাহিনী

নারী বলতে আরম্ভ করলেন জনাব, আমি নৈমান দেশের রাজকন্যা। নৈমান জাতি অতিশয় যুদ্ধকুশল ও সাহসী। আমার পিতা ছিলেন তাদের সম্রাট। আমি পিতার একমাত্র সন্তান বলেই বাল্যকাল থেকে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

কিন্তু আমার চার বৎসর বয়সে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হলে প্রজা ও সভাসসদ্‌রা আমাকে তাঁর সিংহাসনে বসালো। আমি অপ্রাপ্তবয়স্কা বলেই মন্ত্রী আমার পক্ষে শাসন-কার্য চালাতে লাগলেন। পরম সুখেই আমার দিন কাটতে লাগল। কিন্তু চিরদিন সকলের সমান যায় না। আমার চাচা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল মোয়াফেক। দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ তিনি একদিন রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়ে প্রচার করলেন যে, তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন মাত্র। তারপর অনেকদিন ভুগে আরোগ্যলাভ করেছেন।

রাজ্যের অনেক লোকেই মোয়াফেককে চিনিত। তাঁরা সকলে তাঁকেই রাজা বলে ঘোষণা করল। চাচা রাজা হয়ে আমাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলেন হত্যা করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাকে তিনি অনেক কষ্ট করেও খুঁজে পেলেন না। গুপ্ত

সুড়ঙ্গ পথে মন্ত্রী একদিন আমাকে নিয়ে পলায়ন করলেন। তারপর তিব্বত দেশের সীমান্তে এসে তিনি চিত্রকর বলে নিজের পরিচয় দিলেন এবং আমাকে তাঁর মেয়ে বলে পরিচিত করলেন। যৌবনকালে মন্ত্রী ভাল চিত্র-বিদ্যা জানতেন। অল্পদিনের মধ্যেই চিত্রকর হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মোয়াফেক পাছে আবার আমার সন্ধান পায় এজন্য আমরা অত্যন্ত গুপ্তভাবে থাকতাম।

কিন্তু এভাবেও বেশিদিন চলল না। তিব্বতদেশের রাজা মন্ত্রীর ছবি আঁকার খ্যাতি শুনে একদিন তাঁর ছবি দেখতে এলেন। কিন্তু ছবির চেয়েও তিনি বেশি মুগ্ধ হলেন আমাকে দেখে। আমিও তিব্বতরাজের মনোহর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তিব্বতরাজ মাঝে মাঝেই মন্ত্রীর কাছে ছবি দেখতে আসতেন। তিনি একদিন বললেন—জনাব, আমার একজন চিত্রকর প্রয়োজন। আপনি যদি আমার ভবনে বাস করেন আমি আপনাকে রাজবৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করব।

মন্ত্রী এতে সম্মত হলে আমরা রাজপুরীতে গিয়ে বাস করতে লাগলাম।

একদিন তিব্বতরাজ আমাকে নিভৃতে দেখতে পেয়ে বললেন—সুন্দরী, তুমি যেদিন থেকে আমার সাম্‌নে এসেছ সেদিন থেকেই আমার মনপ্রাণ তোমার অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে। আমি তোমাকে আন্তরিক ভালবাসি। তুমি যদি সম্মত হও তবে তোমাকেই আমি তিব্বতের রাণী করব।

আমি তখন আমার সমস্ত কাহিনী এবং আমার প্রতি মোয়াফেকের

অত্যাচারের কথা তাঁকে খুলে বললাম ! শুনেই তিনি বললেন—বেশ, বিবাহের পর কি করে মোয়াফেকের হাত থেকে তোমার পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করি তুমি তা দেখতে পাবে। তারপর চিরদিন তিনি আমার প্রতি অনুরক্ত থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞাও করলেন। এরপর তিব্বত-রাজের সঙ্গে মহাসমারোহে আমার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই তিব্বতরাজ দৈমানরাজ্যে দুত পাঠালেন। দুতরা নৈমান রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করল। রাজার কাছে তারা বলল যে তিব্বতদেশ থেকে তারা আসছে। তিব্বতরাজ নৈমান রাজকন্যাকে বিবাহ করেছেন। তাই তিনি রাণীর পিতৃরাজ্য দাবী করে আমাদের পাঠিয়েছেন। রাজ্য পত্যর্পণ না করলে যুদ্ধ অনিবার্য, এ কথা তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন।

যদিও তিব্বতরাজার মত ক্ষমতা মোয়াফেকের ছিল না, তবুও তিনি গর্বভরে তিব্বতরাজের দুতকে ফিরিয়ে দিলেন। দুতরা তিব্বতদেশ থেকে ফিরে এসে সমস্ত কথা রাজার কাছে বলল। এ কথা শুনে তিব্বতরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই প্রধান সেনাপতিকে সৈন্যদল সজ্জিত করবার আদেশ দিলেন। পার্বত্য জাতি সাধরণতঃ যুদ্ধপ্রিয়। তারা যুদ্ধের কথা শুনে সাজ-সাজ রবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল।

তিব্বতীয় সৈন্যরা যখন নৈমান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় নৈমান দেশের একদল প্রতিনিধি এসে জ্ঞাপন করল—মহারাজ, মোয়াফেক জ্বররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। প্রজারা আপনার অধীনতা স্বীকার করতে চায়। তাই তারা তাদের প্রতিনিধি

রূপে আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছে। সকলেই অবনতমস্তকে আপনার আদেশ প্রতিপালন করবে। আজ থেকে তারা তাদের সুখ-দুঃখের ভার আপনার উপরে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

রাজা এ সংবাদে আনন্দিত হয়ে সেনাপতিকে নিরস্ত হবার আদেশ দিলেন এবং আলীহাতামের নেতৃত্বে একদল লোককে নৈমানরাজ্যে পাঠালেন সেখানকার শাসনভার দিয়ে। মনের আনন্দে দিনযাপন করব বলে এখন একটু নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছি এমন সময় এক অভাবনীয় বিপদে পরে আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি নিজের ঘরে বসে একখানি ধর্মপুস্তক পাঠ করছিলাম। পাঠ শেষ করে আমি যখন উঠব বলে মনে করেছি—এমন সময় হঠাৎ সামনে এক বিশ্রী ছায়ামূর্তি দেখে আঁতকে উঠলাম। মূর্তিটি পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমি এত জোরে চীৎকার করে উঠেছিলাম যে তাতে রাজার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দ্রুতবেগে আমার কাছে ছুটে এসে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজাকে দেখে আমার মনে সাহসের সঞ্চার হ'ল। আমি তখন সেই অপচ্ছায়ার কথা তাকে খুলে বললাম। তারপর বললাম, বোধ হয় মাথায় রক্তের চাপ বেশী হওয়ার জন্যেই এরকম ভুল দেখছি।

কিন্তু রাজা এসব কথা শুনে আমাকে সাহস দেওয়া দূরে থাকুক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগলেন। তারপর বললেন—সুন্দরী, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি। এইমাত্র ঘুম থেকে ওঠে দেখলাম আমার বিছানায় আমার পাশে তুমি শুয়ে আছ। আবার এ

কি করে সম্ভব ?

তাঁর কথা শুনে আমি বললাম—মহারাজ, এ আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না ত ! আপনি স্পষ্ট করে সব বলুন।

মহারাজ বললেন—বেশী কিছু বলতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে পাশের ঘরে এলেই বুঝতে পারবে।

তাঁর কথা শুনে আমি পাশের ঘরে গিয়ে দেখি, শয্যার উপরে একটি নারী শুয়ে আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গঠন, সৌন্দর্য, বস্ত্র, অলঙ্কার সবই ঠিক আমার মত। কোনও অংশেই কোনও পার্থক্য খুঁজে পেলাম না।

এই দেখে আমি প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বুঝলাম নিশ্চয়ই কোনও মায়াবিনী আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাকে এখান থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ঠিক আমার মূর্তি ধারণ করেছে। আমি তখন মনের দুঃখে কেঁদে উঠে বললাম—খোদা, একি আশ্চর্য ব্যাপার ? পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে ত জানা নেই আমার।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মায়াবিনী বিছানা থেকে উঠে বসে ঠিক আমার মত কণ্ঠে বলল—মায়াবিনী, এ কি ব্যাপার ? তুই কোন্ সাহসে এবং কি অভিপ্রায়ে আমার রূপ ধারণ করলি ? তুই কি মনে করেছিস, মহারাজ দুজনকে একই আকৃতি দেখে আমাকে দূর করে দিয়ে তোকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন ? তোর এ আশা নিতান্তই দুরাশা। বুঝলি দুষ্টা, তোর এ কৌশল সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

কুহকিনী আমাকে এ সব কথা বলে রাজার দিকে চেয়ে বলল—মহারাজ, শীঘ্র এ মায়াবিনীকে বন্ধন করে অন্ধকার কারাগারে পাঠিয়ে দিন। কাল সকালে একে সকলের সাম্‌নে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলে এর দুষ্কার্যের যোগ্য শাস্তি দেবেন।

কুহকিনীর আকারের সাদৃশ্যের চেয়েও তার বাক্‌চতুরতায় আমি আরও বেশী বিস্মিত হ'লাম। তার মত কর্কশ কথায় উত্তর না দিয়ে আমি সাশ্রুনয়নে রাজার দিকে চেয়ে বললাম—মহারাজ, এতদিন পর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব বলে যে আশা করেছিলাম, আমার অদৃষ্টে আপনার সুখ ও সৌভাগ্যের অংশভাগী হব বলে মনে যে আশা ছিল, আজ থেকে সে আশালতা চিরদিনের মত মন থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল! ঐ দেখুন—মায়াবিনী আমার আকার ধারণ করে আমাকে দূরীভূত করতে চেষ্টা করছে। তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হতেও খুব বেশী দেরী নেই। আপনি আর আমাকে চিনতে পারছেন না। এই সমস্ত দেখে-শুনে আপনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি। এ আপনার দোষ নয়, এ আমারই ভাগ্যের দোষ।

মায়াবিনী আমার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, পাপীয়সী! তুই অনর্থক আর কেন মিথ্যা কথা বলছিস্? তুই যে নিতান্তই নির্লজ্জ, তোর স্বভাবই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিব্বতরাজ বললেন—তোমরা নিরস্ত হও। তোমাদের দুজনের কথা শুনে আমার সন্দেহ শুধু বেড়ে যাচ্ছে। আমি এসব কথা শুনতে

চাই না। তোমাদের মধ্যে একজন যে মায়ার আশ্রয় নিয়ে আমাকে মিথ্যা বশীভূত করবার চেষ্টা করছ সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয়। কে যে মায়াবিনী তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। আমি কাকেও আজ শাস্তি দেব না। কারণ, দোষী বিবেচনায় একজনকে শাস্তি দিলে যদি পরে অপরজন নির্দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাকে অনন্ত অনুতাপে ও দুঃখানলে দগ্ধ হতে হবে।

কথা শেষ করে তিনি অন্তঃপুর-রক্ষী একজন খোজাকে ডেকে আমাদের দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে আটক রাখতে আদেশ দিলেন। আমরা এইভাবে বন্দী অবস্থায় রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যাপন করলাম।

পরদিন সকালে তিব্বত-রাজ চিত্রকররূপী আমাদের পূর্ব্বতন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন এবং সমস্ত কথা খুলে তাকে বললেন। তিনি সমস্ত কথা শুনে বললেন যে আমাদের দু'জনকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখবেন ও অনেক প্রশ্ন করবেন।

কিন্তু তবুও তিনি কিছুতেই আমাকে সঠিকভাবে চিন্‌তে পারলেন না।

আমার উরুদেশে একটি তিল ছিল। আমার ধাত্রী তা জানতেন। এ জন্য তিনি আমাদের দুজনকে পরীক্ষা করে দুজনেরই উরুদেশে তিল দেখে আরও বেশী বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি আমাদের দুজনকেই নানা প্রশ্ন করলেন; তবে আমার প্রদত্ত উত্তরসমূহই তিনি বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করলেন।

কিন্তু তাঁর কথায় কে কর্ণপাত করবে? যে সব অমাত্য ও

উজীরেরা রাজ-আজ্ঞায় আমাদের বিচারে এসেছিলেন তাঁরা আমাকেই মায়াবিনী বলে স্থির করলেন ও জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে বললেন। কিন্তু তিব্বত-রাজ আমার প্রতি অতটা নিষ্ঠুর না হয়ে আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পরদিনই একটি শতছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ পরে রাজ্য থেকে আমি বের হয়ে পড়ি। তারপর অনেক বদান্য, সদাশয় ও দয়ালু মহাত্মাদের অনুগ্রহে আমি এতদুর পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি।

কথা শেষ করে যুবতী বললেন—জনাব, এই আমার জীবনচরিত। আমি রাজার মেয়ে, রাজরাণী হয়েও আজ এক মায়াবিনীর ষড়যন্ত্রে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে দুঃখময় জীবন যাপন করছি।

রাজবনশাহ তিব্বত রাণীর সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন—মহারাণী, আমি আপনার সমস্ত ঘটনা বিশ্বাস করছি। কেননা, আমিও এক মায়াবিনীর কবলে পড়েছিলাম বলেই আমার এই অবস্থা হয়েছে।

এই কথা বলে রাজবনশাহ তার জীবনের সমস্ত ঘটনা রাণীকে খুলে বললেন। অবশেষে বললেন—সেজন্য দুঃখের কিছু নাই মহারাণী! একজন কবি বলেছেন, মানুষের যে সময় চূড়ান্ত দুঃখ উপস্থিত হয়, তখনই তার আনন্দ করা উচিত, কেননা চূড়ান্ত

দুঃখের পরই সে সুখের মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু যখন মানুষের চরম সুখের অবস্থা আসে, তখনই আসন্ন দুঃখের কথা ভেবেও চিন্তিত হওয়া উচিত। কেননা চরম সুখের পরই সে দুঃখের মুখ দেখবে। সংসারে এই নিয়ম। কার্বাসা মন্ত্রীর ঘটনা শুনলেই আপনি এ সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতে পারবেন!

রাণী তখন প্রশ্ন করলেন—সে ঘটনা কি, তা শুনতে পারি কি?

রাণীর কথায় চীনরাজ রাজবনশাহ কার্বাসা নামক উজীরের কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

কার্বাসা উজীরের কাহিনী

পারস্যের একটি বিখ্যাত নগরীর নাম হার্কেনিয়া।—ঐ নগরী ছিল খোদাবন্দ নামে এক নৃপতির রাজধানী।

ধন, মান, ঐশ্বর্য সব বিষয়েই তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথেই তিনি চলতেন। তাঁর ধর্ম-আচরণ ও বদান্যতার জন্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সুনাম। আল্লার অনুগ্রহে তিনি ঠিক নিজের মতই একজন বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ উজীর লাভ করেছিলেন।

এই উজীরের নাম কার্বাসা।

উজীরের অসাধারণ মেধার জন্য রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সুনাম ও যশ। তাছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। আলস্য এবং অধর্মকে সবসময় এড়িয়ে চলতেন। রাজাও উজীরকে খুব ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন।

একদিন উজীর পানি পরিপূর্ণ আধারে বসে স্নান করছিলেন, এমন সময় তাঁর হাতের আংটিটি খুলে পানিতে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আংটিটি পানিতে ডুবে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল।

মন্ত্রী এই ব্যাপার দেখে অত্যন্ত চমতকৃত হলেন। প্রথমে তিনি

এতে আনন্দিত হলেন বটে, কিন্তু তারপরে একটু চিন্তা করতেই তাঁর মন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তিনি তখন তাঁর ভৃত্যদের ডেকে বললেন—তোমরা অবিলম্বে আমার বাড়ী থেকে সমস্ত জিনিষপত্র ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত কর। নৃপতি এখানে এসেই আমাকে বন্দী করবেন এবং জিনিষপত্রাদি বাজেয়াপ্ত করবেন।

ভৃত্যগণ সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে লাগল। কিন্তু সমস্ত দ্রব্য স্থানান্তরিত করবার আগেই রাজসৈন্যগণ এসে তাঁর গৃহ অবরোধ করল।

উজীরের বিপক্ষের কতকগুলি লোক তাঁকে ঈর্ষা করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিনরাত রাজার কাছে বলত।

রাজা বারবার এই সব কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি উজীরকে বন্দী করবার আদেশ দেন। রাজসৈন্যরাও রাজার সেই আদেশ পালনের জন্য উজীরের বাড়ী অবরোধ করে।

সৈনাধ্যক্ষ মন্ত্রীকে সম্বোধন করে বলল—জনাব, রাজার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী করতে এসেছি।

উজীর এতে কোনও আপত্তি না করে রাজসৈন্যের হাতে আত্মসর্পণ করলেন।

এইভাবে দিন কাটে!

দীর্ঘদিন রাজার আদেশে মন্ত্রী কারাগারেই জীবনযাপন করতে লাগলেন। অন্ধকার কারাগারে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে

লাগলেন। কোনও বন্ধু-বান্ধবের দর্শনলাভ অথবা ভাল খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

দীর্ঘদিন থেকেই উজীরের রমানসি নামে এক ধরণের ফল খাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাজার আদেশে তিনি তা খেতে পারতেন না। কারাগারে ঐ ফল আনবার আদেশ কারাধ্যক্ষ দেননি।

একদিন উজীর করুণভাবে কারাধ্যক্ষের কাছে ঐ ফলের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

উজীরের কাতর প্রার্থনায় কারাধ্যক্ষের মন একটু নরম হ'ল। তিনি আদেশ দিলেন উজীর ইচ্ছা করলে ঐ ফল খেতে পারেন।

কারাধ্যক্ষের আদেশে তাঁর ভৃত্যগণ ঐ ফল এনে দিল উজীরের সামনে।

উজীর ফল খেতে যাবেন এমন সময় কয়েকটি ইঁদুর বিবাদ করতে করতে ঐ ফলের উপর লাফিয়ে পড়ল।

অগত্যা উজীর আর ফল খেতে পেলেন না। তখন তিনি প্রথমটা দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু একটু পরেই আনন্দিত মনে বললেন—নরপতি শীঘ্রই আমাকে কারামুক্ত করে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করবেন।

সত্যিই তাই হ'ল।

পরদিন সকালে নৃপতি তাঁর বন্ধন-মুক্তির আদেশ দিলেন।

মুক্ত হয়ে তিনি রাজার কাছে গেলে, রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—উজীর, তোমার শত্রুদের কথায় বিশ্বাস করে তোমাকে আমি মিথ্যা কষ্ট দিয়েছি। আমার সব দোষ তুমি ক্ষমা কর। আজ থেকে

তোমাকে আবার আমি উজীরের পদে নিযুক্ত করলাম। তোমার বিপক্ষ দলটিকেও আমি উপযুক্ত দণ্ড দিয়েছি।

কার্বাসার বন্ধুগণ এই ব্যাপার অবগত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—বন্ধু, তুমি কি করে পূর্বেই সব কিছু অবগত হতে পারলে ?

উজীর বললেন—মানুষের চরম সুখের পর আসে দুঃখ। আবার চরম দুঃখের পর আসে সুখ।

তাঁরা বললেন—এ কথা ঠিক বুঝলাম না।

উজীর বললেন—আমি দেখলাম, যখন আংটিটি পানিতে পড়েও না ডুবে ভেসে উঠল, তখন আমার চরম সুখ উপস্থিত। এর পরই এলো দুঃখ। আবার যেদিন ইঁদুর ফলগুলোকে নষ্ট করল সেদিন দেখলাম চরম দুঃখভোগ হ'ল। কাজেই বুঝলাম এর পরেই আসবে সুখ।

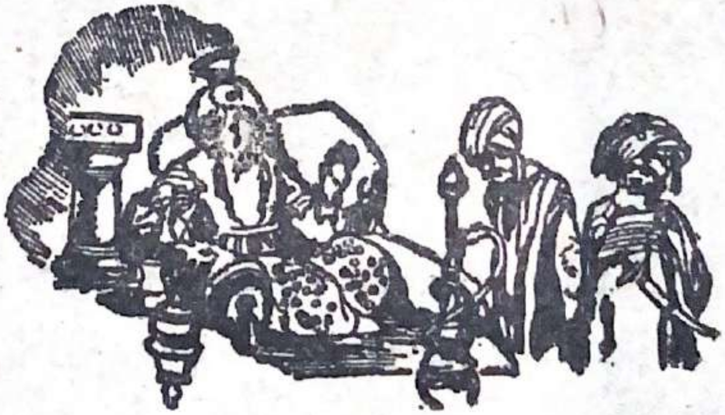

নৈমান রাজকন্যার কাহিনী

(পূর্বানুবৃত্তি)

এইরূপে কার্বাসা মন্ত্রীর আদ্যোপান্ত ঘটনা শেষ করে চীনরাজ নৈমান রাজকন্যাকে বললেন—রাজকন্যা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। বোধ হয় তোমার দুঃখের চরমসীমা উপস্থিত হয়েছে। এর পরই তোমার সুখের দিন আসবে।

তারপর একটু থেমে বললেন—আমিও এমনি এক কুহকিনীর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। জানিনা সে মানুষ না প্রেতাত্মা। এই কথা বলে চীনরাজ তাঁর জীবনের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন।

তাঁদের কথা শেষ হ'ল।

এমন সময় দেখা গেল একজন সুন্দর নবীন যুবক উলঙ্গ-প্রায় অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

নৈমান রাজকন্যা বললেন—চীনরাজ, ঐ দেখুন আমার স্বামী!

তাঁর কথা শেষ হ'ল না।

দেখা গেল আর একজন রাজ পুরুষও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পূর্বের উলঙ্গ-প্রায় লোকটিকে অনুসরণ করছে।

তাঁকে দেখে রাজকন্যা বললেন—ঐ দেখুন, ওর চেহারাও ঠিক আমার স্বামীর মত। দুজনের আকৃতিই হুবহু এক। আশ্চর্য। তবে

কি আমার স্বামীও শত্রু কর্তৃক বিতাড়িত ?

চীনরাজ এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। তিনি বললেন—নির্মাণ-কৌশল-সম্পন্ন বিধাতারও ক্ষমতা নেই যে ঠিক হুবহু এক আকৃতির এমন দুটি মানুষ তৈরী করেন।

এমন সময় সেখানে অশ্ব-পৃষ্ঠে আবির্ভূত হলেন অন্য একজন রাজপুরুষ।

ইনি হলেন রাজ-মন্ত্রী আলী। তিনি করযোরে রাণীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—মহারাণী, প্রথমে চিরদিনই অধর্মের জয় ও ধর্মের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মই জয়লাভ করে এবং পাপীরা পরাস্ত হয়। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। তার কাছে অধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আপনার সমস্ত দুঃখের শেষ হয়েছে। আপনার প্রবল শত্রুকে মহারাজ নিজের হাতে বিনাশ করেছেন। তাঁর তরবারী তাই এখন শত্রুর শোণিতে রঞ্জিত। আর এক নরাধম এসে নিজে ঠিক মহারাজের আকৃতি ধারণ করে রাজা হবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার পূর্বেই সে ধরা পড়ে গেছে। মহারাজ তার পেছনে পেছনে ধাবিত হয়েছেন। শীঘ্রই সে বোধ হয় ধরা পড়বে ? যাহোক, তিব্বত-রাজ এগিয়ে গেছেন। চলুন আমরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হই।

এ কথা শুনে চীনরাজ বললেন—জনাব, ইনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অসুস্থ। ওর সাধ্য নেই যে এতটা পথ ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন। তার চেয়ে আপনি এঁকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন। আমি আগে গিয়ে এঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসি।

উজীর একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন—সত্যিই আপনার সুন্দর ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হ'লাম। আপনার কথা অনুসারে তাহলে কাজ হোক।

রাজা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত অগ্রসর হলে উজীর নৈমান রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাণী, ওই অপরিচিত যুবকটি কে? ওঁর মুখশ্রী দেখে ওঁকে মহৎ বংশ-উদ্ভূত বলেই মনে হয়। ওঁর ব্যবহারই ঠিক সেইরূপ।

রাণী তখন চীনরাজের আনুপূর্বিক ঘটনা বলে উজীরের কৌতুহল তৃপ্ত করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—কিভাবে ওই মায়াবিনীর রহস্যজাল ভেদ হ'ল তা শোনার জন্যে আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে।

আলী রাণীর কথা শুনে বললেন—রাজা, অমাত্যদের কথা অনুসারে আপনাকে রাজ্য থেকে বের করে দিয়ে ওই মায়াবিনীকেই নিজের রাণী মনে করে তাঁকে অন্তঃপুরে সসম্মানে নিয়ে গেলেন। কুহকিনীও মায়া বলে অল্পদিনে মহারাজকে এমনি বশীভূত করে ফেলে যে, তিনি কুহকিনীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য কিছুদিন দুর্গমধ্যে বাস করতে লাগলেন। রাজকার্যেও ও তাঁর অবহেলা দেখে সবাই উদ্বিগ্ন হলেন।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

আজ সকালে মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় বের হন। পথের মধ্যে হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি বললেন—উজীর আমার একটি জরুরী কথা মনে পড়ল। চল গৃহে ফেরা যাক্। মহারাণীকে

কথাটা বলতে হবে।

এই বলে প্রাসাদে ফিরে এসে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দেখি, মহারাজ উলঙ্গ অবস্থায় রাজবাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে একটি ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।

আমি অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম—মহারাজ, আপনি এমন অবস্থায় কোথায় চলেছেন।

মহারাজ কোনও উত্তর না দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন।

আমি অবাক হয়ে, ভাবি, মহারাজ কি কোন দুর্দশায় পড়ে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলেন ?

যখন এভাবে চিন্তা করছি, তখন দেখলাম, মহারাজ তাঁর স্বাভাবিক বেশভূষায় অন্তপুর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর তরবারি রক্ত-রঞ্জিত। তাঁর চেহারা দেখে মনে হ'ল তিনি খুব উত্তেজিত।

রাজা বললেন—উজীর, আমি কি বোকার মতই না কাজ করেছিলাম। পতিপ্রণা মহারাণীকে বিসর্জন দিয়ে আমি এক কুহকিনীর মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমি এইমাত্র সেই কুহকিনীর জীবন-প্রদীপ নির্বান করে এসেছি। এখন আমার মত আকৃতি-ধারী দুরাত্মাকেও এই দণ্ডেই তার দুরাচারের সমুচিত প্রতিফল দিতে চলেছি। এই বলে তিনি অশ্বারোহণে এই মায়াবীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

এইভাবে উজীর আলী রাজকন্যার কাছে সমস্ত কাহিনী বললেন।

ওদিকে চীনরাজ অশ্ব-চালনা করে তিব্বত-রাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন। তিব্বত-রাজও প্রাণপণে এগিয়ে গিয়ে এই দুরাচারকে ধরে ফেললেন।

তিনি যখন তাকে বধ করিতে উদ্যত, তখন সে বলল—মহারাজ আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন, আর কখনও আমি এইরূপ কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করব না।

রাজা বললেন—দুরাত্মা, তুই কে এবং কেন আমার আকার ধারণ করে আমাকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলি তা খুলে বল, নইলে তোর নিস্তার নেই।

রাজার কথায় আশ্বস্ত হয়ে লোকটি বলল—মহারাজ, আমি বিন্দুমাত্র গোপন করব না। সরলভাবেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলব। কিন্তু তার আগে আমার স্বাভাবিক মূর্তিটি দেখুন। তা দেখে আপনি আরও বিস্মিত হবেন সন্দেহ নাই।

এই কথা বলে লোকটি তার হাতের একটি আংটি খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেল। সে একটি কুশ্রী বৃদ্ধে রূপান্তরিত হ'ল।

তিব্বত-রাজ এই ব্যাপার দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তা দেখে বৃদ্ধ বলল—মহারাজ এই আমার স্বাভাবিক রূপ। যাহোক্‌, আমার কাহিনী শুনলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

চীনরাজও ইতিমধ্যে নিকটে এসে পড়েছিলেন। তিনি এবং তিব্বত-রাজ দু'জনেই তার কাহিনী শুনতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বলতে সুরু করল :

বহুরূপার জীবন বৃত্তান্ত

ডামাস্ক নামে এক সমৃদ্ধশালী নগরী আছে। সেখানকার বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি অত্যন্ত আদরণীয়। অধিবাসীরা তাই ঐশ্বর্যশালী হয়ে পরম সুখে দিন কাটায়।

আমি ঐ নগরের এক তাঁতির ছেলে। আমার পিতা নিজের বুদ্ধিবলে প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং বাল্যকাল আমি সুখেস্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত করেছি। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। তাই আমাকে কখনও কোন দুঃখ পেতে হয়নি। যখন যা প্রার্থনা করতাম, তখন তাই পেতাম।

এইরূপে আমার বাল্যকাল পরম আনন্দে অতিবাহিত হ'ল। ধীরে ধীরে আমি যৌবনের সীমায় এসে উপস্থিত হ'লাম। এই বয়সের যা ধর্ম তা আমার মধ্যেও দেখা দিল। আমি দুর্জয় কাম্ রিপুকে নানাভাবে বস করতে চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে আমি রিপুর কাছেই আত্মসমর্পন করলাম। কয়েকজন শয়তান ও কুপথগামী অনুচরের কবলে পড়ে আমি ধীরে ধীরে বিপথগামী হয়ে পড়লাম।

আমার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আমি স্বাধীনভাবে এই কার্য করতে পারিনি। প্রতি পদে তিনি আমাকে বাধা দিতেন।

আমিও তাঁকে আমার সুখের পথের বিঘ্ন বলে মনে করতাম।

কিন্তু শীঘ্রই সে কণ্টক দূর হ'ল। কঠিন অসুখে পিতা কালগ্রাসে পতিত হলেন। আমিও তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলাম।

পিতার মৃত্যুর পর আমি উদ্দাম গতিতে পাপের স্রোতে ভেসে চললাম। সব সময় বারাঙ্গনাদের সহবাসে আমার দিন কাটতে লাগল।

আমার বাড়ীর নিকটে একজন পরম রূপবতী নারী বাস করত। তার নাম দেলনোরাজ। যুবতীর সৌন্দর্য ও প্ররোচনা বাক্যে অনেকেই তার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। আমিও প্রবল রিপুকে বশে আনতে না পেরে তার দাসত্ব স্বীকার করলাম।

তার অনেকগুলি উপপতি ছিল। কিন্তু দুশ্চরিত্রা এমনভাবে সকলের মন রক্ষা করত যে সত্যই সে যে কাকে ভালবাসে তা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। প্রত্যেকেই মনে করত যে সে বুঝি একমাত্র তাকেই ভালবাসে।

আমিও তাকে অত্যন্ত ভালবাসতে লাগলাম। তার মুখে ছিল অমৃত, কিন্তু মন ছিল গরলপূর্ণ। কি করে প্রেমিকদের সর্বনাশ করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হয় এদিকেই ছিল তার একমাত্র নজর।

আমিও তার মধুর বাক্যে ভুলিয়া গেলাম এবং আমিই তার একমাত্র প্রণয়ভাজন মনে করে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। হিতাহিত জ্ঞান তখন আমার একেবারেই ছিল না। প্রত্যহ তাকে

মহামূল্য নানা উপঢৌকন প্রদান করতাম।

এইভাবে কয়েক বৎসর কেটে গেল। দেলনোরাজকে ক্রমাগত অর্থাদি প্রদান করে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষিত হয়ে গেল। আমার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও ঈর্ষান্বিত হয়ে দেলনোরাজের অনুগ্রহ পাবার আশায় তাকে প্রচুর ধন দান করতে ত্রুটি করত না। কিন্তু তারাও অর্থহীন হয়ে একে একে চলে গেল।

এইরূপে অর্থহীন হওয়াতে আমার মনে নানা চিন্তার উদয় হতে লাগল। বুঝলাম স্বার্থের জন্যই সে আমাকে এতদিন এভাবে ভালবাসত। কিন্তু আজ আমি অর্থহীন। কাজেই আর তার ভালবাসা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

আমি যখন এম্নি সব দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি, যখন একদিন দেলনোরাজ আমাকে ডেকে বলল—মকবেল, তুমি এখন সম্পূর্ণ নির্ধন হয়েছ। সুতরাং পূর্বের মত উপঢৌকন দিতে সক্ষম নও, জানি। তার জন্যে মনে করো না যে, আমি তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দেব। যদিও প্রেমপাশে আবদ্ধ করে লোকের সর্বনাশ করাই আমার পেশা, কিন্তু তোমাকে আমি সত্যই ভালবাসি। তোমার হাতে আমি মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি। যতদিন জীবন থাকবে, তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না। আমার যা কিছু ঐশ্বর্য আছে সবই তোমাকে অর্পণ করলাম। তা ছাড়া অন্যের কাছ থেকে যা কিছু পাব, সবই তোমাকে সমর্পণ করব।

তার এই সব প্রবোধ-বাক্যে আমার মন কিছুটা সন্তুষ্ট হ'ল। আমি

তখন তার অর্থে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলাম। আমার বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি দেখে লোকে আমাকে পূর্বের মতই ধনী বলে মনে করত। বাস্তবিকই আমি দেলনোরাজের একপ্রকার গৃহস্বামী-হয়েই দিন কাটাতে লাগলাম। দেলনোরাজ আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনও কাজে হাত দিত না।

চিরদিন মানুষের সমান যায় না। দিনের শেষে আসে রাত্রি। তেমনি মানুষের ধন, মান, ঐশ্বর্য ইত্যাদিরও পরিবর্তন হতে বাধ্য।

কালক্রমে দেলনোরাজ বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক আকৃতিও পরিবর্তন ঘটল। ধীরে ধীরে তার সৌন্দর্য তিরোহিত হতে লাগল।

একদিন সে আমাকে বলল—মকবেল, চিরদিন মানুষের সমান যায় না। যারা একদিন আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিরন্তর আমার মনোরঞ্জনের প্রয়াস পেত, আজ তারাই আমার বৃদ্ধাবস্থা দর্শনে আমাকে ঘৃণা করতে থাকবে সন্দেহ নাই। তাদের ঘৃণাস্পদ হয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও আমার কাছে অনেক শ্রেয়। অতএব এই অবস্থার পরিবর্তন আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—কি করে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব? আমার কথা শুনে সে বলল—ফেরন নামে একটি মরুপ্রদেশ এদেশের উত্তরে অবস্থিত। সেই মরুভূমিতে বেদ্রা নামে একজন কুহকিনী বাস করেন। আমি তার কাছে যাত্রা করব। বেদ্রার মায়ার তুলনা নাই। তিনি ইচ্ছা করলে অলৌকিক মায়াপ্রভাবে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের গতিও

স্তব্ধ করে দিতে পারেন। মায়া বলে তিনি মানুষকে পশু-পক্ষীতে এবং পশু-পক্ষীকে মানুষে রূপান্তরিত করতে পারেন। আমি তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যই যাত্রা করছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি অবশ্যই চিরযৌবন লাভ করব।

তার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে বললাম—দেলনোরাজ, একথা উত্তম সন্দেহ নেই। শুভকার্যে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব শীঘ্র উপযুক্ত আয়োজন কর। আর যদি আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল তবে আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

দেলনোরাজ এ প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। নির্দিষ্টদিনে তাই প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে আমরা ফেরন অভিমুখে যাত্রা করলাম।

তিনদিন তিনরাত্রি চলার পর আমরা একটি মরুভূমির প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'লাম। তার শেষে বিশাল একটি পর্বতশ্রেণী। পর্বতের একটি গুহার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সেখানে অলক্ষণযুক্ত অজস্র পক্ষী আকাশে উড়ছিল দেখতে পেলাম। বিরাটকায় অনেকগুলি রাক্ষস তার চারিদিকে পরিভ্রমণ করছিল। এই সব দেখে শুনে আমাদের হৃতকম্প উপস্থিত হ'ল। যা হোক, আমরা গুহাদ্বার অতিক্রম করে তার অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলাম।

বিশাল একটি অন্ধকার গহ্বর। তার মধ্যে একটি প্রস্তর-নির্মিত আসনে এক বৃদ্ধা রমণী বসেছিলেন তাঁর সামনে জ্বলছিল একটি লৌহ-নির্মিত প্রদীপ। তিনি অনেকক্ষণ কি সব মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকার উপরে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃত্তিকা বিনা আগুনেই

জ্বলে জ্বলে উঠছিল।

আমরা এই সব দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। বুঝলাম, কুহকিনী বেত্রার দ্বারা সম্ভব নয় এমন কাজ পৃথিবীতে কিছুই নেই। যার জন্য এত কষ্ট করে এতটা পথ হেঁটে এসেছি তাকে দেখা আমার শ্রম সার্থক বলে মনে হ'ল। আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অর্চনা শেষ করলাম। তারপর উপঢৌকনগুলি তাঁর সামনে রাখলাম।

অতঃপর দেলনোরাজ করজোড়ে সেদিকে চেয়ে বলল—দেবী; বিধাতা আপনার মনোরথ পূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি অন্তর্যামী, আমাদের মনের ভাব নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। অতএব আপনাকে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

তার এই সব কথা শুনে প্রীত হয়ে কুহকিনী বললেন—তোমাকে আর বলতে হবে না। তোমরা এখানে আসা মাত্রই তোমাদের মনের ইচ্ছা আমি জানতে পেরেছি। মায়াবলে ভুত ও ভবিষ্যত কিছুই আমার অজ্ঞাত থাকে না।

এই কথা বলে তিনি উঠে গিয়ে দুটি কাঁচের শিশি নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুটি শিশিতে দুটি স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়। তিনি দুটি অঙ্গুরী মন্ত্র পাঠ করে বের করতেই শিশির মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। চারিদিকে বজ্রনির্ঘোষের মত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে চতুর্দিক স্তব্ধ হ'ল। বেত্রা ঐ অঙ্গুরীয় দুটি আমাদের হাতে দিয়ে বললেন—তোমার ইচ্ছামত এই অঙ্গুরীয় প্রভাবে যে

কোনও সুন্দরী নারী ও সুন্দর পুরুষের আকৃতি ধারণ করতে পারবে। যতক্ষণ অঙ্গুরী হাতে থাকবে ততক্ষণ এইরূপ থাকবে। অঙ্গুরী হাত থেকে খুলে ফেললেই তোমরা নিজ আকৃতি প্রাপ্ত হবে।

অতঃপর তিনি অঙ্গুরী দুটি আমাদের দুজনের হাতে পরিয়ে দিলেন।

আমরাও অঙ্গুরী দুটি পেয়ে মনের আনন্দে তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার কৌতুহল আর বাধা মানছিল না। ডামাস্ক নগরে ফেরা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলাম না। মরুভূমির মধ্যে একজন লোককে দেখে তার মূর্তি ধারণ করবার ইচ্ছা হ'ল।

আমি অঙ্গুরী হাতে নিয়ে অনুরূপ ইচ্ছা করতেই আমার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে ঠিক তার মত হয়ে গেল। আমিও এই সাফল্যে আনন্দিত হয়ে দ্রুত চলতে লাগলাম।

ক্রমে আমরা ডামাস্ক নগরে ফিরে এলাম।

দেলনোরাজ ঐ অঙ্গুরী প্রভাবে নগরীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের আকার ধারণ করে বহু যুবককে প্রলুব্ধ করতে লাগল। আমিও অঙ্গুরী প্রভাবে নানাভাবে অজস্র অর্থ উপার্জন করতে লাগলাম। বঞ্চনা এবং শঠতা আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। আমাদের দিন কেটে চলল।

এইভাবে কিছুদিন কাটলে আমাদের দেশভ্রমণের ইচ্ছা হ'ল। আমরা স্বদেশ থেকে বহির্গত হয়ে প্রথমে মিশর দেশে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান না করে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে করতে নৈমান রাজ্যে উপস্থিত হ'লাম। সেই সময় একটি বালিকা নৈমান রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। উজীর আলিহাতাম তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু উজীরের একাধিপত্যে প্রজারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল। সেজন্যে সকলেই তাঁর বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে তারা কিছু করতে পারত না।

এই সব দেখে-শুনে আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। অনতিবিলম্বেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবার সুবিধা হল। শুনতে পেলাম নৈমানরাজের মোয়াফেক নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মোগলের সঙ্গে যু্দ্ধের পর যুবরাজের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। তিনি যুদ্ধে দেহত্যাগ করেছেন বলে সকলে সন্দেহ করত।

এসব খবর শুনে দেলনোরাজ বলল—মকবেল, এই হচ্ছে নৈমান রাজ্য অধিকার করবার উপযুক্ত সুযোগ। অমাত্যরা মন্ত্রী আলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অতএব তুমি এই সময় যুবরাজ মোয়াফেকের রূপ ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

তার এই কথা শুনে আমি মোগল যুদ্ধের ইতিহাস ও যুবরাজ মোয়াফেকের চেহারার বৃত্তান্ত অবগত হলাম। তারপর আমি ধীরে ধীরে মোয়াফেকের চেহারা অনুকরণ করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা নগরের বাইরে গিয়ে নিজেকে যুবরাজ বলে পরিচয় দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। ক্রমশঃ সমস্ত নৈমানজাতিই আমার সাহায্যে অগ্রসর হ'ল।

অতঃপর আমি সিংহাসনে আরোহণ করলাম। নৈমান রাজকন্যা ও উজীর আলী সমস্ত সংবাদ শুনে ইতিপূর্বেই পলায়ন করেছিল। নির্বিঘ্নেই আমি রাজ্যশাসন করতে লাগলাম। প্রজাগণও আমার বশীভূত হয়ে চলতে লাগল। স্বয়ংযুবরাজ মোয়াফেক সিংহাসনে আরোহণ করলেও এত সুনিয়মে নিরাপদে রাজ্যশাসন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

দেলনোরাজও বরাবর সুন্দরী নারীর বেশ ধারণ করে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। আমি তাকে নিজের স্ত্রী বলেই পরিচিত করেছিলাম। পাছে লোকে কোনও সন্দেহ করে, সেজন্য প্রকাশ করেছিলাম যে, যখন আমি মোগল যুদ্ধের পর একটা রাজার আশ্রয়ে ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই থেকে রাজকন্যা আমার সঙ্গেই আছে। আমার কথা সকলের বিশ্বাস হয়েছিল। সুতরাং দেলনোরাজ রাজমহিষী বলেই পরিচিত হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এলো আপনার দূত। তার কাছে শুনলাম যে আপনি নৈমান কন্যাকে বিবাহ করেছেন এবং আমি সহজে তাঁর রাজ্য ও ঐশ্বর্য ত্যাগ না করলে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আমার উচ্ছেদ-সাধন করবেন।

একথা শুনে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হ'ল। তবুও মুখে সাহস দেখিয়ে দূতদের বিদায় দিলাম। অতঃপর দেলনোরাজকে সমস্ত কথা বললাম।

দেলনোরাজ আদ্যোপান্ত শুনে চিন্তিত স্বরে বলল—যুদ্ধে জয়ী হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব রাজ্য ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু

তিব্বত-রাজ যেমন আমাদের সুখে বিঘ্ন ঘটালেন, তার উপযুক্ত প্রতিফল ও তার পাওয়া উচিত। সেই চেষ্টাই আমাদের করা চাই।

অতঃপর আমি পীড়ার ভাণ করে কয়েকদিন অতিবাহিত করলাম। রাজ্যের প্রধান প্রধান হেকিমরাও আমাকে আরোগ্য করতে পারল না। অঙ্গুরীর-প্রভাবে আমি মৃত অবস্থায় পতিত হলাম। কিন্তু পরদিন আমি ও দেলনোরাজ স্বাভাবিক আকার ধারণ করে নৈমানরাজ্য ত্যাগ করলাম। এদিকে আমার মৃত্যু সংবাদে আপনিও যুদ্ধযাত্রা স্থগিত করলেন। এই অবসরে আমি অন্তঃপুরের একজন খোজা প্রহরীর আকার ধারণ করলাম। দেলনোরাজও রাণীর আকৃতি ধারণ করে কিভাবে অন্তঃপুরে স্থান পেলেন, তা আপনি জানেন।

° • •

° ° •

আপনি আজ সকালে মৃগয়ায় গমন করলে আমি খোজার আকৃতি দিয়েই দেলনোরাজের নিকট উপস্থিত হ'লাম। সে আমাকে দেখে বলল—মকবেল, তুমি এখনি এইরূপ চেহারা ত্যাগ করে তিব্বত-রাজের আকৃতি ধারণ কর।

আমি তার কথায় রাজী হয়ে তখনি আপনার আকৃতি ধারণ করলাম এবং তার বিছানার পাশে বসে তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হলাম। কিন্তু হঠাৎ আপনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আপনাকে দেখবামাত্র আমি বিপদ বুঝতে পেরে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আল্লা আর এত অধর্ম সহ্য করতে পারলেন না!

সেজন্য আবার আমাকে আপনার হাতে ধরা পড়তে হয়েছে।

তিব্বত-রাজ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন—শয়তান, সেই কুহকিনীকে যেমন হত্যা করেছি, তোকেও সেইরূপ করা উচিত। কিন্তু তুই যখন ক্ষমা প্রার্থনা করেছিস তখন তোকে মুক্তি দিলাম। তবে যে অঙ্গুরীর সাহায্যে তুই এত সব কুকর্ম করেছিস সেটি আমি গ্রহণ করলাম।

এই কথা বলে তার কাছ থেকে অঙ্গুরীটি নিয়ে তিব্বত-রাজ তাঁকে মুক্তি দিলেন।

অতঃপর চীনরাজ বললেন—আপনার স্ত্রী উজীরের নিকটেই অপেক্ষা করছেন।

তিব্বত-রাজ বললেন—তাই নাকি? তবে আমাকে আপনি তাঁদের কাছে নিয়ে চলুন।

চীনরাজ তখন তিব্বত রাজকে রাণীর কাছে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন পরে দুজনে মিলিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তখন রাণী ও উজীরের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে রাণীর কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করে বললেন—আমি কুহকিনীর মায়াজালে পড়ে তোমার প্রতি যে অবিচার করেছি, তা সম্পূর্ণ ভুলে যাও।

রাণী বললেন—আমি তোমারই আশায় সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ তুচ্ছ করে এতদিন যাপন করেছি। যাক তোমার দর্শন পেয়ে আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হ'ল।

রাজা তখন চীনরাজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ইনি কে?

রাণী বললেন—ইনি হচ্ছেন চীনদেশের রাজা। এঁর কথাতেই

আমি আত্মহত্যা থেকে বিরত হয়েছিলাম। ইনিও একজন কুহকিনীর মায়ায় পড়ে অত্যন্ত কষ্টে দিনযাপন করছেন।

তিব্বত-রাজ তখন চীনরাজের কাহিনী শুনতে চাইলে তিনি সমস্ত কাহিনী খুলে বলেন।

শুনে তিব্বত-রাজ সন্তুষ্ট হয়ে সকলের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে চললেন।

চীনরাজ কয়েকদিন তিব্বত-রাজ্যের আতিথ্য স্বীকার করে অবশেষে স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন।

রাজবনশাহ ও চিরস্থানী

রাজকন্যার কাহিনী

(পরিশেষ)

চীনরাজ নিজের রাজ্যে ফিরে এসে মন্ত্রীর কাছে তিব্বত দেশের রাজা ও রাণীর বিষয়ে বিস্তৃতভাবে সমস্ত কাহিনী বললেন—উজীর সেই সমস্ত কাহিনী শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন—মহারাজ, চিরস্থানীও নিশ্চয়ই দেলনোরাজের মত কোনও মায়াবিনী হবে। সে নিশ্চয়ই মায়াজাল বিস্তার করে আপনাকে বশীভূত করবার চেষ্টা করেছে। রাজবনশাহও মন্ত্রীর কথাই সত্য মেনে নিয়ে চিরস্থানীর কথা ভুলে গেলেন। ধীরে ধীরে তিনি চিরস্থানীর আশা ত্যাগ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

দেশের নিয়ম অনুসারে বৎসরে একদিন সকালে প্রজারা রাজধানীতে একত্রিত হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা রাজার জন্য অপেক্ষা করছিল, এমন সময় সংবাদ এলো যে মহারাজ প্রাসাদে নেই। এ কথা শুনে সকলেই বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ল।

কিন্তু গভীর রাত্রে তিনি একা কোথায় গেলেন এবং তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ যে কি তা কেউই বুঝতে পারল না। অগত্যা

তাঁকে খোঁজ করবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠান হ'ল। কিন্তু দীর্ঘদিন খোঁজ করেও তাঁর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রজারা সকলেই তখন শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল।

উজীর ছিলেন অত্যন্ত প্রভু-ভক্ত। প্রভুর বিচ্ছেদে ধৈর্যহারা তিনি সর্বদা বলতে লাগলেন—হায়, শেষ পর্যন্ত কি আমাদের ভাগ্যে বিধাতা এমনই কষ্ট লিখেছিলেন। আমাদের প্রজাবৎসল মহারাজ আমাদের ত্যাগ করে এভাবে অদৃশ্য হলেন! তিনি আবার দেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন কিনা কে জানে? বোধ হয় মায়াবিনীই তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

এদিকে চিরস্থানী রাজকন্যা পিতার মৃত্যুর পর চিরস্থান দ্বীপের সিংহাসনের অধিকারিণী হল। সে একদিন তার দৈত্য অনুচরদের আদেশ দিল রাজা রাজবনশাহকে তাঁর রাজ্য থেকে নিয়ে আসতে। চিরস্থানী রাজকন্যার আদেশ মত তাঁর দুতেরা রাজবনশাহকে তাঁর গৃহ থেকে নিয়ে চিরস্থান দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

রাজা চিরস্থানীকে দেখবামাত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে গদগদ-কণ্ঠে বললেন—সুন্দরী, আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আর সেইজন্যই বোধ হয় আবার তোমাকে দেখতে পেলুম। কোনও দিন তোমার দেখা পাব এ আশা আমার আদৌ ছিল না। মনে করেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছ।

চিরস্থানী রাজকন্যা বলল—মহারাজ, চোখের সাম্‌নে না দেখতে পেলে দৈত্যদের অনুরাগ, ভালবাসা ও আকর্ষণ মানুষের মত কমে যায় না। দৈত্য-কন্যারা যাকে একবার জীবন ও মন সঁপে দেয়, জন্ম-

জন্মান্তরেও তাকে ভুলতে পারে না।

মহারাজ বললেন—রাজন্যা, আমি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি সত্য, কিন্তু আমার স্মরণ—শক্তি দৈত্যদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তোমার জন্য আমি এরূপ অধৈর্য হয়েছিলাম যে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। কেবল তোমার সঙ্গে মিলনের আশাতেই আমি আজ অবধি কোনও প্রকারে বেঁচে আছি।

চিরস্থানী বলল—মহারাজ, আমি আজ পর্যন্ত কেবল আপনার অনুরাগ পরীক্ষা করছিলাম। আমরা স্ত্রীজাতি। অনুরাগের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় সহজেই আত্ম-সমর্পণ করে পরে কষ্ট পেয়ে থাকি। সেই ভয়েই আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনার অনুরাগ কতটা গভীর। এখন আপনার অনুরাগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি। আজ থেকে চিরদিন আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করব।

চীনরাজ চিরস্থানীর এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তার কর-চুম্বন করলেন। অতঃপর রাজকন্যা প্রধান প্রধান অমাত্য ও প্রজাবর্গকে ডেকে বললেন—দৈত্যগণ আমি যেদিন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করলাম, সেদিন থেকে ধনী, নির্ধন, বলবান অক্ষম সকলেই আমার আদেশ পালন করবে বলে অঙ্গীকার করেছ। আমি এখন সকলের সামনে প্রচার করছি যে আমি আজ থেকে চীনরাজের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলাম। আজ থেকে তিনি তোমাদের প্রভু হলেন। তিনি আমার চেয়েও মাননীয়। কাজেই তোমরা কেউ তাঁকে অমান্য ক'রো না।

এই কথা শেষ করে দৈত্যকন্যা চীনরাজার বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দৈত্যদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী মহাসমারোহে তাদের বিবাহ সুসম্পন্ন হবে।

চীনরাজ মানুষ হলেও দৈত্যকন্যার প্রতি শ্রদ্ধা থাকায় দৈত্যরা তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল। রাজভবনে আনন্দের হাট বসে গেল। পুরবাসীরা নৃত্য গীত সুরু করল। মন্ত্রীরা খুব ভাল করে রাজধানীকে নানা ধরণের আলোকমালা দিয়ে সাজালেন। সব কিছুই প্রস্তুত।

এমন সময়ে দৈত্য-রাজকন্যা মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—মহারাজ, বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হবার আগে সকলের মঙ্গলের জন্য আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে! আর তা পালন করতে না পারলে দু'জনকেই ভবিষ্যতে খুব কষ্ট ভোগ করতে হবে।

মহারাজ বললেন—সুন্দরী, তোমার বক্তব্য বিষয় আমাকে শীঘ্র বল। তুমি যা প্রতিজ্ঞা করতে বলবে আমি তাতেই রাজী আছি।

চিরস্থানী বলল—মহারাজ আমি দৈত্যকন্যা আর আপনি মানুষ, সুতরাং আমাদের দুজনেরই রীতিনীতি বিভিন্ন। কিন্তু আমি যে কাজ করব তাতেই আপনার সায় দিতে হবে। তাহলে আমাদের দুজনের কারও কোন কষ্ট পাবার আশঙ্কা নেই। আমরা মনের সুখে দিন কাটাতে পারব।

এই কথা শুনে রাজবনশাহ বললেন—সুন্দরী তুমি কি মনে করেছ তোমার এই সামান্য কাজের কথা শুনে আমি দ্বিধা করব? এ আর এমন কঠিন কি? এই সামান্য কাজের জন্য তুমি অত ভাবছ কেন?

তুমি স্থির জেন, আমি সব সময় তোমার আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত।

দৈত্যকন্যা বলল—মহারাজ, আপনাকে আরও অঙ্গীকার করতে হবে যে. আমি আপনার সামনে যে কোনও কাজ করব, তার জন্য আপনি কোনও কৈফিয়ৎ চাইতে পারবেন না বা তাতে বাধা দিতে পারবেন না।

মহারাজ বললেন—প্রিয়ে, আমি আল্লাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি যা করবে আমি তাই সঙ্গত বলে মেনে নেব। তুমি আমার জীবন-সর্বস্ব। অতএব তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ আমার কাছে মৃত্যুর মতই ভয়াবহ। তাই তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ-ভাব রেখে আমি কখনই আমার জীবনকে বিনিময় করব না।

চিরস্থানী বলল—মহারাজ, আপনার প্রতিজ্ঞার কথা যেন সব সময় আপনার স্মরণ থাকে। আমি যা করব, তা অনেক সময় আপাত্-দৃষ্টিতে অন্যায় বলে মনে হলেও, বাস্তবিকপক্ষে তা আদৌ অন্যায় নয়। কারণ, দৈত্যকন্যারা কখনও কোনও অন্যায় কাজ করে না। সেজন্য সব সময় আপনার মনকে স্থির ও বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে হবে।

অতঃপর বিবাহের সময় উপস্থিত হ'ল। দৈত্যরাজকন্যা চীনরাজকে একটি স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তার বাঁ-পাশে বসলেন। দেশীয় নিয়মমত দৈত্য-রমণীরা তাঁদের বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিলেন এবং তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলেই আনন্দিত। ক্রমে আনন্দ ও কোলাহলের মধ্য দিয়ে বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। এইভাবে কিছুদিন কেটে

গেল আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে। উৎসবের মধ্যে রাজা ধীরে ধীরে চীনরাজকন্যার কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন।

এইভাবে এক বছর কেটে গেল।

রাণীর গর্ভসঞ্চার হল। এই খবর পেয়ে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

দিন কাট্‌তে লাগল।

চিরস্থানীর গর্ভে একটি সূর্যের মত সুন্দর পুত্রের জন্ম হল। মহারাজ এই খবর শুনে অন্তঃপুরে গেলেন। পুত্রের অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন এবং আনন্দিত অন্তরে তার মুখ চুম্বন করতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি পুত্রকে রাণীর কোলে দিবামাত্র রাণী তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তমধ্যে অগ্নির লেলিহান শিখা শিশুকে গ্রাস করে নিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখে মহারাজ খুবই কাতর হয়ে পড়লেন! তবুও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে রাণীকে কিছু বললেন না।

সুতিকাগার থেকে বের হয়ে রাজা গেলেন নিজের শয়নকক্ষে। গোপনে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তিনি বলতে লাগলেন—হায়, পৃথিবীতে আমার মত হতভাগ্য কেউ নেই। এতদিনের পর বিধাতা একটি পুত্র দিলেন—কিন্তু রাণীর হাতেই তার জীবননাশ হ'ল। আমি এই নৃশংস ব্যাপার দেখে এখনও জীবিত আছি? হায়, এই কুহকিনীর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কি কঠিন প্রতিজ্ঞাই না করে ফেলেছি!

আমি নিতান্ত মূর্খ।

তারপর রাজা মনে করলেন, নিশ্চয়ই রাণী কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছে। নিশ্চয়ই এ থেকে কোনও সুফল ফলতে বাধ্য।

এই ভেবে মহারাজ ধীরে ধীরে শোক ত্যাগ করলেন এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়েই দিন কাটাতে লাগলেন।

ক্রমে আরও একবৎসর কেটে গেল।

এবার চিরস্থানী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করল। কন্যার সৌন্দর্যে সুতিকাগার আলোকিত হয়ে উঠলো। তা দেখে মহারাজ খুবই আনন্দিত হলেন। চীনরাজ মেয়ের মুখশ্রী দেখে পুত্রের শোক ভুলে গেলেন। দিন দিন কন্যা শশীকলার মত বেড়ে উঠতে লাগল। রাজার আর আনন্দের সীমা রইলো না। কিন্তু তার এই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না! কারণ, তার এই কন্যা জন্মগ্রহণ করবার কিছুদিন পরে শ্বেতবর্ণ একটি কুক্কুরী রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। চিরস্থানী সেই কুক্কুরীকে দেখবামাত্র কন্যাটিকে তার সামনে ফেলে দিল।

যমসদৃশী সেই কুক্কুরী বালিকাটিকে পাবামাত্র তাকে মুখে করে সেখান থেকে পলায়ন করল।

রাজ কন্যার শোকে একান্ত অধীর হয়ে চিরস্থানীকে তিরস্কার করবার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে তাঁর সেই উদ্যম বিফল হ'ল। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে নির্জনস্থানে গমন করে পুত্র-কন্যার শোকে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং তার

উদ্দেশ্যে মনে মনে বলতে লাগলেন—পাপীয়সী, এইরূপে নিজের পুত্র-কন্যাদের প্রাণ-বিনাশ করতে কি তোর কিছুমাত্র কষ্টবোধ হ'ল না? দৈত্যরা কখনও অন্যায় কাজ করে না বলে তুই যে গর্ব করিস্ তার দৃষ্টান্ত কি এই? যদি পূর্বে এইরূপ জানতাম তবে আমি এইভাবে তোর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হতাম না।

রাজা যদিও পুত্র ও কন্যার শোকে অধীর হয়েছিলেন, তবুও চিরস্থানীর সাম্‌নে সে বিষয়ে কোনও কথা প্রকাশ করেননি। ক্রমে চিরস্থান দ্বীপ তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক বোধ হতে লাগল। সুতরাং চীন-রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলেন।

অতঃপর তিনি একদিন চিরস্থানীকে সম্বোধন করে বললেন—প্রিয়ে, বহুদিন হ'ল আমি চীনরাজ্য ত্যাগ করে এসেছি এবং এ পর্যন্ত কোন কুশল-সংবাদও পেলাম না। প্রজারা বোধ হয় আমার চিন্তায় মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। তাই আমার ইচ্ছা একবার নিজের রাজ্যে ফিরে যাই।

তার ইচ্ছা বুঝতে পেরে চিরস্থানী বলল—মহারাজ, আপনার সংকল্প পূর্ণ করতে আমার অমত নেই। বিশেষতঃ এই সময় আপনার রাজ্যে গোলমাল ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহারাজ আশ্চর্য হয়ে বললেন—সে কি?

চিরস্থানী বলল—হ্যাঁ, মোগলরা আপনার রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে।

রাজা এ কথা শুনে চিন্তিত হলে চিরস্থানী বলল—আপনার

অবশ্য চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপনার প্রজারা স্বভাবতঃ যুদ্ধপ্রিয়, আপনি উপস্থিত থাকলে তাদের উৎসাহ চারগুণ বেড়ে যাবে। আমিও ইতিমধ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

চীনরাজকে চিরস্থানীর দুতরা আবার শূন্যপথে তাঁর রাজ্যে রেখে এলো। তিনি রাজধানীতে ফিরে মন্ত্রীদের সঙ্গে একত্রিত হলেন।

অকস্মাৎ রাজাকে দেখতে পেয়ে মন্ত্রী মুজিন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম করে বললেন—মহারাজ, এতদিনের পর আল্লা আমার অভিলাস পূর্ণ করেছেন। এতদিন আমিও অনেক কষ্টে আপনার রাজ্য ও ঐশ্বর্য রক্ষা করেছি। এবার আপনি সমস্ত গ্রহণ করে রাজ সিংহাসনে আরোহন করুন। তাহলে এ অধীন তার গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

রাজা মন্ত্রীর কথায় খুব আনন্দিত হয়ে তার কাছে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন। সমস্ত কাহিনী শুনে মন্ত্রী আহ্লাদিত হয়ে চিরস্থানীর গুণগান করতে লাগলেন।

এদিকে দলে দলে মোগল সৈন্য রাজ্যপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে একটি বিস্তির্ণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করল!

রাজবনশাহ্ এই সংবাদ শুনে চিন্তিত হলেন। তিনি তাঁর সৈন্যগণকে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হবার জন্য আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ যথারীতি সজ্জিত হয়ে নিকটবর্তী অন্য একটি প্রান্তরে শিবির স্থাপন করল।

ওয়েলী নামক রাজবনশাহের একজন অনুচর তাঁর সৈন্যদের জন্য

খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করছিল। নানাধরণের সুখাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে সে যখন সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্য আনছিল সেই সময় হঠাৎ চিরস্থানী রাজকন্যা একদল দৈত্য নিয়ে ওয়েলীকে আক্রমণ করল এবং সমস্ত খাদ্য নষ্ট করে ফেলল।

এ সমস্ত দেখে ওয়েলী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চিরস্থানী বলল —তুমি তোমার প্রভুর কাছে গিয়ে বল যে চিরস্থানী রাজকন্যা এই সব খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করেছে।

ওয়েলী তখনই রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বলল। রাজা এই সংবাদ শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লেন। আর ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে মোহ এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করল!

তিনি তখন ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চিরস্থানীর কাছে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে তোমার কাজে বাধা দেব না। কিন্তু আজ তোমার কাজ দেখে আমি এত মর্মাহত হয়েছি যে বাধ্য হয়েই তোমাকে বাধা দিতে হচ্ছে। তুমি বলেছিলে যে, দৈত্যকন্যারা কখনও অন্যায় কাজ করে না! আমিও সে কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আজ আর তোমার কথার প্রতি আমার বিশ্বাস নেই।

চিরস্থানী বলল—আমাকে আপনি অবিশ্বাস করেছেন কেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলুন।

রাজবনশাহ্ বললেন—যেদিন তুমি আমার প্রিয় পুত্রকে আগুনের গর্ভে এবং প্রিয় কন্যাকে কুকুরীর মুখে সমর্পণ করেছ সেদিন থেকেই

আমি বুঝেছি তুমি একটি শয়তানী। তোমার বাহ্যিক চেহারা সুন্দর কিন্তু তোমার মন বিষাক্ত। তারপর আজ তুমি যেভাবে আমার সৈন্যদের সমস্ত খাদ্য নষ্ট করলে, তাতে মোগল সৈন্যের হাতে পরাজয় ছাড়া আর কোনও উপায় আমার থাকবে না। এতদিনে আমি বুঝলাম রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে আমি কতদূর অন্যায় করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

চিঁরস্থানী বলল—মহারাজ, আমি জানি অদৃষ্টকে মানুষ কখনও খণ্ডন করতে পারে না। কাজেই আপনি যে মহাভ্রমে পতিত হয়ে এই ধরণের কথা বললেন এবং মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।

রাজবনশাহ বললেন—এর মধ্যে আমি ভ্রমের সামান্যতম কিছুও দেখতে পাচ্ছি না।

চিরস্থানী বলল—আমার কাছে সব কিছু শুনলেই বুঝতে পারবেন আপনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন কিনা। তখন বুঝতে পারবেন আপনার দোষে কি অনর্থ ঘটেছে। যাক, এখন শুনুন, আপনার পুত্র ও কন্যার কথা বলছি।

আপনার পুত্রকে যে আগুনের মধ্যে সমর্পণ করেছিলাম সেটা বাস্তবিকপক্ষে আগুন নয়। ইনি হচ্ছেন দৈত্যদের আদি ও পরম গুরু কাকলাস। আমি আপনার পুত্রকে তাঁহার হাতে দিয়েছি এই জন্য যে তিনিই তাকে সর্ববিদ্যায় বিশারদ করে তুলবেন। আর যে কুক্কুরীর মুখে আপনার কন্যাকে ফেলে দিয়েছি বলে মনে করেছেন সে বাস্তবিক কুক্কুরী নয় সে নৃত্য-গীত ও কলাবিদ্যা পটিয়সী দৈত্যরমণী। তিনিই

আপনার কন্যাকে ওই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

রাজবনশাহ বললেন—তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তারা সব এখন কোথায়?

চিরস্থানী বলল—আমি এই মূহূর্তেই তাদের এখানে এনে উপস্থিত করতে পারি। এই বলে সে একজন দৈত্যকে তাদের আনবার জন্য আদেশ দিল।

দৈত্য আদেশ পাইবামাত্রই শূন্যপথে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। পুত্র ও কন্যাকে দেখতে পেয়ে মহারাজের হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকল। তিনি বুঝতে পারলেন চিরস্থানীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব তাকে ভুল বুঝে তিনি এক ভয়ানক অন্যায় করেছেন। তিনি তখন খাদ্যাদি বিনষ্ট করবার কথা একেবারে ভুলে গেলেন।

কিন্তু চিরস্থানীই তাঁকে বলল—মহারাজ, শুনুন কেন আমি আপনার খাদ্যাদি বিনষ্ট করে দিয়েছিলাম।

আপনার এই অনুচর ওয়েলী অত্যন্ত ধূর্ত ও শয়তান। তাকে মোগলরা প্রচুর অর্থ দিয়ে বশীভূত করেছে। যে খাদ্যাদি সে সংগ্রহ করেছিল তাতে বিষ মিশান ছিল। ঐ বিষ-মিশ্রিত খাদ্য খেলে আপনার ও আপনার সৈন্যদের সকলেরই মৃত্যু হ'ত।

রাজবনশাহ এ কথা শুনে তখনই ওয়েলীকে ডেকে পাঠালেন। ওয়েলী রাজ-সকাশে এসে গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হ'ল। তখন তাকে লক্ষ্য করে রাজবনশাহ বললেন—ওয়েলী, তুমি এই খাদ্যের কিছুটা খাও।

এ কথা শুনে ভয়ে ওয়েলীর মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল মহারাজ, আমার এখন ক্ষুধা নেই। পরে যদি ক্ষুধা পায় খাব।

চিরস্থানী তখন বললেন—দেখলেন ত মহারাজ, আপনার অনুচর কেমন ধূর্ত ও শয়তান।

রাজবনশাহ তখনই ওয়েলীকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে তখনই সৈন্যরা তাকে বন্দী করল।

ওয়েলীকে বন্দী করে সৈন্যরা চলে গেলে চিরস্থানী বললেন—মহারাজ, সৈন্যদের জন্য খাদ্যের চিন্তা আপনার করতে হবে না। আপনি আজ রাতে মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করুন। ওরা এখন অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে। ওদের আক্রমণ ও পরাস্ত করে ওদের খাদ্য কেড়ে নিন। তাতে আপনার সৈন্যদের খুব ভালভাবেই খাদ্যের ব্যবস্থা হবে।

চিরস্থানীর কথা অনুসারে তখনই রাজবনশাহ মোগল সৈন্যদের অক্রমণ করলেন।

দৈত্য সৈন্যরাও চিরস্থানীর নেতৃত্বে মোগলদের আক্রমণ করল। চিরস্থানী নিজে সেনাপতির বেশে দৈত্য সৈন্যদের পরিচালিত করতে লাগলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হ'ল। মোগলরা পরাজিত অথবা নিহত হ'ল। তাদের সমস্ত খাদ্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রাজবনশাহ অধিকার করলেন।

যুদ্ধশেষে রাজবনশাহ চিরস্থানীকে লক্ষ্য করে বললেন—প্রিয়ে, চল এবার রাজ্যে যাওয়া যাক।

এ কথা শুনে চিরস্থানী বলল—মহারাজ, তা হবার নয়। আপনার দোষেই আজ আপনাকে ও আমাকে অশেষ কষ্ট পেতে হবে। দৈত্যদের নিয়ম অনুসারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পর আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য। দৈত্যরাজ-বংশের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করবার শক্তি আমার নেই। এর ব্যতিক্রম কিছুতেই হতে পারে না।

রাজবনশাহ বললেন—যা ভুল হয়ে গেছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর। আর কখনও আমি এমন ভুল করব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি। তোমাকে ছেড়ে বাস করা আর জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেওয়া একই কথা।

চিরস্থানী বলল—আমি আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি মহারাজ। আর আপনাকে ছেড়ে থাকতে আমার মনেও যে কি নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে তা আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন। দৈত্য-কন্যারা আজীবন একই পুরুষের হাতে দেহ-মন সমর্পণ করে থাকে। তারা আর অন্য কিছুর সামান্য চিন্তাও করে না। কাজেই আপনাকে ছেড়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমার অসীম দুঃখের মধ্য দিয়ে কাটবে। কিন্তু তবুও উপায় নেই। আমি দৈত্যদের নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না।

এই কথা বলে চিরস্থানী পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'ল।

চিরস্থানীর শোকে অধীর হয়ে মহারাজ করুণভাবে কাঁদতে

লাগলেন। তাঁকে এতটা শোকার্ত ইতিপূর্বে আর কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর দু'চোখে উত্তপ্ত অশ্রু-ধারা।

অনেকক্ষণ করুণভাবে চোখের পানি ফেলে তিনি মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—মুজিন, আজ থেকে তুমিই রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা কর। কোনও কাজের দিকে সামান্য মনোযোগ দেবারও সাধ্য আমার আর নেই! আমাকে এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও। আমি নিভৃতে ঘরের মধ্যে দিন রাত্রি যাপন করব!

মুজিন এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

চিরস্থানীর শোকে মুহ্যমান রাজার এর পর আর কোনও কাজকর্ম করবার সামান্যতম শক্তিও থাকলনা। তিনি বদ্ধ ঘরের মধ্যে দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে লাগলেন।

এইভাবেই দিন কাটে।

দিনে দিনে রাজার শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়ে পড়তে লাগল। নানা ব্যাধি এসে তার দেহকে অবশ ও পঙ্গু করে ফেলল। কিন্তু তিনি সামান্যতম কোনও দিকে মন অর্পণ করলেন না। দিবারাত্র তিনি শুভ চিরস্থানীর ধ্যান করেই কাটাতে লাগলেন।

এমনিভাবে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল। ধীরে ধীরে রাজা রাজবনশাহ উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়লেন। প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রহর গুণতে লাগলেন।

ঠিক যেদিন দশ বৎসর পূর্ণ হ'ল সেদিন হঠাৎ পুত্র ও কন্যা

সহ চিরস্থানী এসে উপস্থিত হ'ল।

রাজা তাদের দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে হতভাগ হয়ে পড়লেন। তাঁর দু'চোখে আনন্দাশ্রু।

চিরস্থানী বলল—মহারাজ, আপনার শোকের দশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এতদিন যে আপনি আমার চিন্তা নিয়েই কাটাতে পেরেছেন এতে নিয়ম পূর্ণ হয়েছে। এবার আপনি আবার আমাকে এবং আপনার পুত্র ও কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হলেন।

এই কথা শুনে রাজা বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন।

সেই দিন থেকে ধীরে ধীরে রাজার ব্যাধি কমে আসতে লাগল। ক্রমশঃ তিনি সেরে উঠলেন।

অতঃপর তিনি চিরস্থানী ও তাঁর পুত্র এবং কন্যাকে নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° °

ধাত্রী এইভাবে চিরস্থানা রাজকন্যা ও রাজা রাজবনশাহের কাহিনী শেষ করলেন।

এই কাহিনী শুনে রাজকন্যা ফরোখনাজের সখীরা একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল। সকলেই বলল—এমন চমৎকার আদর্শ চরিত্রের কাহিনী আমরা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি!

কিন্তু রাজকন্যা বললেন—এর মধ্যে আবার আদর্শ চরিত্রের কি দেখতে পাচ্ছ? পুরুষেরা সব সময়ই তাদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। তারা প্রথমে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু পরে নারীকে হেয় জ্ঞান করে দূরে ঠেলে দেয়। এই বীর পুরুষটি তারই এক দৃষ্টান্ত!

এ কথা শুনে ধাত্রী বললেন—বেশ, এবার তোমাকে আর একটি গল্প শোনাব! তাতে দেখতে পাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পুরুষরা কি কি কাজ করতে পারে।

ধাত্রী অতঃপর কৌলফ ও দেলেরার কাহিনী বলতে সুরু করলেন।

কৌশল্য ও দেলেরার কাহিনী

তুরস্কের অন্তর্গত ডামাস্ক নগরের মধ্যে আবদুল্লা নামে এক ঐশ্বর্যশালী বণিক বাস করতেন। তিনি নানাদেশে বাণিজ্য করে অতুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েও যেমন অনেকে ভুলের বশে অর্থের যথাবিহিত ব্যয় করতে জানে না, তিনি সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। তিনি একটি পুত্র কামনায় অনাথ দীন-দুঃখীদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর সুফল না থাকায় কিছুতেই কিছু হ'ল না। তখন তিনি মনের দুঃখে দেশ-ভ্রমণে বের হলেন। বহুদেশ পর্যটন করে একদিন তিনি আশ্রয় নিলেন একজন চিকিৎসকের বাড়ীতে। চিকিৎসক তাঁকে চিনতেন; তিনি তাকে দেখেই সাদর-সম্ভাষণ করে বললেন—জনাব আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আমার বাড়ীতে আপনার পদধূলি পরেছে। আপনি এখানে দিনকয়েক বিশ্রাম করলে আমি বড়ই বাধিত হব।

আবদুল্লা বললেন—কিন্তু তাতে আমার দুঃখ ত দুর হবে না। একটি পুত্র-সন্তানের মুখ না দেখলে আমার মনে সুখ নেই।

চিকিৎসক বললেন—ও, এই কথা ? আপনাকে আমি এ বিষয়ে সুপরামর্শ দিচ্ছি শুনুন। আপনি আজই একটি পূর্ণ যৌবনা নারী কিনে আনুন, যার শরীর নিটোল অথচ খুব মোটা নয়, কটিক্ষীণ, পয়োধর পীনোন্নত, গণ্ডদেশ মাংসল। তার সঙ্গে আপনি মধুর আলাপ এবং প্রচুর মাংসাদি সুখাদ্য ভক্ষণ করে চল্লিশ দিন যাপন করবেন। এর মধ্যে একদিনও কোন বিষয়-কার্যে হাত দেবেন ন। এর ফলে আপনার যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে হবে সবসুলক্ষণযুক্ত।

চিকিৎসকের সুপরামর্শে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেই অনুযায়ী কাজ করলেন। এর ফলে কালক্রমে তিনি একটি সুন্দর পুত্রের মুখ-দর্শণ করলেন। তখন তিনি পুত্রটির নাম রাখলেন কৌলফ।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মত দিনে দিনে কৌলফ বেড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে পুত্রের বিদ্যা অভ্যাসের সময় আসন্ন দেখে বণিকপুত্রের শিক্ষার জন্য নানা ভাষায় অভিজ্ঞ সচ্চরিত্র শিক্ষকগণকে তার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেন। বণিক পুত্র নিজ মেধায় অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যেই আরবী, ফারসী, ল্যাটিন ইত্যাদি নানা ভাষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল। নীতি, সাহিত্য, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ইত্যাদিতেও সে সুপণ্ডিত হ'ল। তারপর অস্ত্র-শস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যাতেও সে সুশিক্ষিত হয়ে উঠল। বণিক তখন মনের আনন্দে তার হাতে তাঁর যথাসর্বস্ব সমর্পণ করে একদিন পরলোকের পথে পাড়ী জমালেন।

পিতার পরলোকগমনের পর কৌলফ পিতার সমস্ত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হ'ল। একে ত যৌবন-সুলভ চপলতা, তার উপর অগাধ

ঐশ্বর্য। ধীরে ধীরে নানাধরনের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিশে সে অধঃপাতে যেতে লাগল। কৌলফ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান হয়েও সংসর্গ-দোষ, অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে সে তার মধ্যে বার-বিলাসিনীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে লাগল। এ সমস্ত ক্ষণিক আনন্দের পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর, এ কথা মূহূর্তের জন্যও তার মনে উদিত হ'ল না। এইভাবে অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যেই কৌলফ পিতার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে একেবারে নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে পড়ল। সামান্য যে ভূ-সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, সে সবই বিক্রি করে ফেলল। এমন কি প্রেমাস্পদা নারীগণকে পর্যন্ত বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য হ'ল। অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তিকে তার জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন করে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগল। বিপক্ষগণ তার এই চরম দুরাবস্থা দেখে খুব আনন্দ বোধ করতে লাগল।

শেষে ভিক্ষা দুর্লভ হলে দুর্ভাগা কৌলফ পূর্বের দুষ্কার্যের সহায়ক বন্ধুদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বলতে লাগল—ভাই, আমি অত্যন্ত কষ্টে পড়েছি, আমাকে দয়া করে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়ে সাহায্য কর।

উত্তরে তারা জানাল—উপকার করা কি আমাদের কর্ম? তার চেয়ে তুমি পরমেশ্বরের আরাধনা কর। তিনিই তোমার উপকার করতে পারেন।

কৌলফ বন্ধুদের কাছ থেকে ও ধরণের ব্যবহার পেয়ে মনের দুঃখে ডামাস্ক নগর ত্যাগ করে বিদেশে যাত্রা করল। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা

যৎসামান্য উপার্জনই তার পথের সম্বল হ'ল। এইভাবে চলতে চলতে সে কিরীটী দেশের রাজধানী কারাকোরম নগরে এসে আশ্রয় নিল। সে দেশের রাজার নাম কোবল খাঁ। তাঁর রাজ্যমধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। তখন সুযোগ বুঝে কোলফ রাজসৈন্যদলে যোগদান করল এবং নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে সৈন্যদলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হ'ল। বিশেষ করে সে রাজপুত্রের সুনজরে পড়ল।

এর কিছুদিন পরে রাজার মৃত্যু হলে রাজপুত্র মির্জানই সেই রাজ্যের রাজা হ'ল। সে তখন কোলফকেই মন্ত্রীর পদে বরণ করে নিল। কোলফও মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন কোলফ রাজপথে পরিভ্রমণ করছে এমন সময় দেখতে পেল ছয়জন নারী পথের মধ্যে ভ্রমণ করছে। তাদের মধ্যে পাঁচজন পরিপূর্ণ যুবতী এবং অপর জন বৃদ্ধা।

কোলফ বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বলল—আপনি কি ওদের বিক্রয়ের ইচ্ছায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

বৃদ্ধা তার দিকে চেয়ে বলল—হ্যাঁ, কিন্তু এদের মধ্যে কেউই আপনার উপযুক্ত নয়। আপনি যদি বলেন ত আপনার উপযুক্ত নারী আপনাকে দেখাতে পারি।

কোলফ বলল—বেশ, আমার আপত্তি নেই।

বৃদ্ধা বলল—কিন্তু আমার গৃহে এখন কোনও পুরুষ নেই। কোন পুরুষ সেখানে গেলে লোক-নিন্দা হতে পারে। তাই আপনাকে স্ত্রীলোকের বেশে যেতে হবে।

কোলফ তখন নিজেকে নারীবেশে সজ্জিত করে বৃদ্ধার অনুগমন করল।

কোলফ রমণীর সঙ্গে একটি বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হ'ল। তার প্রাঙ্গণ হরিৎ বর্ণের প্রস্তর-নির্মিত। দালানে উপস্থিত হয়ে সে দেখল কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ পাত্র পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে শোভা পাচ্ছে। মরালগণ মনের আনন্দে তার উপরে খেলা করছে। সোনার খাঁচায় নানা রঙের পক্ষীরা মনের আনন্দে ক্রীড়ারত। অতঃপর একজন রমণী এসে একটি সুন্দর আসনে তাকে বসিয়ে তার শুশ্রূষা করতে লাগল। কোলফ ঐ রমণীর ভাব দেখে তাকেই ক্রয় করবে মনে স্থির করল। এমন সময় আর এক রমণী এসে তার হস্তপদ প্রক্ষালন করতে লাগল। উভয়ের সৌন্দর্য দেখেই সে মুগ্ধ অন্তরে চিন্তা করতে লাগল, এদের চেয়ে সুন্দরী রমণী আর আছে কিনা সন্দেহ।

কোলফ এ ধরনের চিন্তা করছে, এমন সময় বিশজন রমণী নানা বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে তার সামনে এসে দণ্ডায়মান হ'ল। এ ব্যাপার দেখে কৌলফ জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল। তা দেখে সকলে তার শুশ্রূষা করতে লাগল, কিছু পরেই তার চেতনা ফিরে এল। বৃদ্ধ তখন তাকে শয্যায় উপবেশন করিয়ে সুবাসিত পানি পূর্ণ পাত্র তার সামনে ধরল। সেই পানি পান করে কৌলফ কিছু সুস্থ হ'ল বটে কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না। বৃদ্ধা তখন কৌলফকে বলল—কৈ আপনি ত কোনও কথাই বলছেন না। আপনি কি আজন্মই মুক, না ভাগ্যের দোষে আপনার এমনি অবস্থা হয়েছে?

কৌলফ তখন বলল—আমি কেন, পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও লোকই এমনি অবস্থায় পড়লে তার মনের ভাব এরূপ হ'ত।

তখন ঐ রমণীদের প্রধানা কৌলফকে বলল—যাক, আপনি এখন পার্শ্ববর্তী কক্ষে চলুন।

সেখানে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। তথায় সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৌলফ মনের সুখে খাদ্যাদি গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে লাগল। বৃদ্ধা এই অবসরে পাশের ঘরে প্রস্থান করল। এই সময়ে ঘরের মধ্যে নৃত্যগীত আরম্ভ হয়ে গেল। প্রধানা নারী কৌলফের পাশেই বসল। এবার তার দিকে চেয়ে কৌলফ বলল—এদের সকলকে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি আপনাকে দেখে। এই বলে কৌলফ তাঁর করতলে নিজের হাতখানি স্থাপন করল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবতী বলল—নির্বোধ, তোর এত বড় স্পর্ধা যে পুরনারীর দেহে হস্তার্পণ করিস? বামন হয়ে চাঁদে হাত?

এই বলে রমণী কাল্পনিক তিরস্কার করে প্রস্থান করল।

এমন সময় সেই বৃদ্ধা ফিরে এসে বলল—তুমি কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় তাও কি ভুলে গেছ? এইমাত্র তুমি যাকে অপমান করলে তার পিতাই এই বাড়ীর অধীশ্বর। সে রাজার প্রিয়পাত্রীদের মধ্যে একজন।

এ কথা শুনে কৌলফ গভীর চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হ'ল। এমন সময় তার চিন্তার অবসান করে সুসজ্জিতা সেই রমণী ফিরে এসে বলল—

দেখুন, আপনি আর অনর্থক মনের দুঃখে কালযাপন করবেন না। আপনার নিজের পরিচয় ও আপনার অভিপ্রায় খুলে বলুন, আমি তা দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

কৌলফ তখন বলল—আমি এদেশের রাজার প্রধান উজীর। আমার নাম কৌলফ। আমি দীর্ঘদিন আপনার সুখ্যাতির কথা শুনে আজ আপনাকে দর্শনের ইচ্ছায় এখানে এসেছি।

একথা শুনে রমণী প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি যখন রাজার প্রধান উজীর, তখন নিশ্চয়ই রাজ-অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীদেরই দেখেছেন। আচ্ছা, বলুন ত, রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী কে?

—রাজা মির্জান গোলেন্দান নামক যুবতীর প্রতিই সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট এবং মন্ত্রীদের মতেও তিনিই সমস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে, তাকে আর সুন্দরী বলে আদৌ মনে হচ্ছে না আমার। তোমার এ অপরূপ রূপের কাছে সে অতি নগণ্য বললেও চলে।

তখন কৌলফ উক্ত রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তার একজন সহচরী বলল—শুনুন, রাজার সভ্যদের মধ্যে বৈরফ নামে যে একজন কর্মচারী আছেন তিনিই এই নারীরত্নের পিতা। বৈরফ রাজকার্য উপলক্ষ্যে কোজন্তী নামক স্থানে দিন কাটান। এইজন্য মাঝে মাঝে ইনি নগরের শ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হন। আজ আপনাকে দেখে ইনি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। এঁর নাম দেলেরা।

এ কথা শুনে কৌলফের প্রেমশিখা আরও চতুর্গুণ জ্বলে উঠল।

তারপর নানাপ্রকার সুখাদ্য আহার ও মদ্যপানে সকলে মেতে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে দেলেরা কৌলফকে নিয়ে একটি পৃথক কক্ষে গমন করল এবং পরম সুখে দু'জনে রাত্রি অতিবাহিত করল।

এইভাবে রাত্রির অবসানে প্রভাত হলে দেলেরা বলল—তুমি এই গুপ্তপথে বৃদ্ধার সঙ্গে প্রস্থান কর। আজ সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট স্থানে তুমি অপেক্ষা ক'রো। আজ রাত্রেও তাহলে এখানে আসতে পারবে। কৌলফ তখন দেলেরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল এবং গুপ্তদ্বার দিয়ে একেবারে বাড়ীর মধ্যে উপনীত হ'ল।

পরদিন সকালে কথায় কথায় কৌলফ মহারাজ মির্জানের কাছে দেলেরার সমস্ত গুণরাশির বর্ণনা করল। সমস্ত শুনে রাজা মির্জান অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—তোমার কাছে যেমন শুনছি তাতে ত এ রাজ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী যে দেলেরা এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকে না। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে সেই রমণীকে একবার দেখবার জন্যে। তুমি কি কোনও উপায় করতে পার না?

কৌলফ বলল—মহারাজ, আপনি রাজ-রাজেশ্বর। আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনও কাজই সুসিদ্ধ করতে পারেন। একজন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ত সামান্য কথা। কিন্তু আমি যদি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই তবে কিরূপে আপনাকে মহারাজ বলে পরিচয় দেব?

মির্জান বললেন—তাতে চিন্তা কি? তুমি আমাকে তোমার পরিচারক হিসাবে পরিচিত করবে। তখন অন্য কোন উপায় না দেখে কৌলফ

রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করতে বাধ্য হ'ল।

সন্ধ্যা উপস্থিত হলে উভয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধা সেখানে এসে বলল—কৌলফ, তুমি ত আমাদের সমস্ত বিষয় অবগত আছ। তবে কেন এই ভৃত্যকে তোমার সঙ্গে এনেছ?

কৌলফ তখন বলল—মা, আপনি যে ধরণের ভৃত্য এঁকে মনে করেছেন এ তা নয়। এর দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না, এ বহুকাল যাবৎ আমার সঙ্গে থেকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে। নীরস বাক্য এর মুখ থেকে কখনও বের হয় না।

এ কথা শুনে বৃদ্ধা দু'জনকেই রমণীর বেশে সজ্জিত করে গৃহের মধ্যে নিয়ে গেল। দেলেরা ভৃত্যবেশধারী রাজাকে দেখবামাত্র বলল—কৌলফ, আজ এ সঙ্গীকে কোত্থকে আনলে?

কৌলফ বলল—দেলেরা, তোমার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই একে এনেছি। এ সর্ববিদ্যা বিশেষ করে সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। তখন দেলেরা ভৃত্যকে সম্বোধন করে বলল—দেখ বাপু, সকলের প্রতি ভাল করে ব্যবহার করতে চেষ্টা কর। এ কথা শুনে ভৃত্য তার সুন্দর ব্যবহারে অল্পক্ষণের মধ্যে দেলেরার মনস্তুষ্টি সম্পন্ন করল।

দেলেরা ভৃত্যের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে দেখে কৌলফ বলল—প্রেয়সী, আজ থেকে আমি এ দাসটি তোমাকে প্রদান করলাম। এক্ষণে তুমি এর প্রতি সদয় ব্যবহার করলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তারপর—ভৃত্যের দিকে চেয়ে বলল—আজ থেকে এই অসামান্যা যৌবন-

বতী নারীই তোমার কর্ত্রী হলেন। এর প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভুভক্তি দেখাতে আশা করি আলস্য করবে না।

ভৃত্য বলল জনাব, এ দাস আজ থেকে এই নারীর চিরদাসের মধ্যে একজন বলে গণ্য হ'ল। যতদিন বেঁচে থাকব, এঁর সেবা করে জীবন ধন্য জ্ঞান করব।

দেলেরা ভৃত্যের কথায় আনন্দিত হয়ে বলল জনাব, এ যদিও সত্যিই আমার মনস্তুষ্টি করেছে, তবুও এখন যদি একে আমার কাছে রাখা হয় তবে লোকে নানা ধরনের নিন্দা করতে পারে। তাই আপাততঃ ও আপনার কাছেই থাকুক।

এইভাবে সেই কক্ষে কিছুক্ষণ নানাবিধ বাক্যালাপের পর দেলেরা কৌলফের সহিত ভোজনে প্রবৃত্ত হ'ল। তখন ভৃত্য নানারূপ আহার্যদ্রব্য ও সুস্বাদু সুরা পরিবেশন করতে লাগল। মনে কি ভেবে দেলেরা ভৃত্যকেও তাদের সঙ্গে আহারে যোগ দিতে আহ্বান করল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দেলেরা একটি পরিপূর্ণ মদ্য পাত্র ভৃত্যবেশী রাজার হাতে দিয়ে বলল—তুমি আমার কুশল ও তোমার সুখের নিমিত্ত এই মদ্যপান কর। তারপর সে কৌলফের হাতে একপাত্র মদ্য দিয়ে বলল—রাজমহিষী গোলেন্দানের প্রতি তোমার যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে এই সুরাপানে তা পূর্ণ কর।

রাজার সম্মুখে এ ধরণের প্রগলভতা ও মিথ্যা কথায় কৌলফ লজ্জিত হয়ে বলল—যুবতী, এটা পরিহাসের কথা নয়। গোলেন্দান মহারাজা মির্জানের প্রিয় মহিষী। আমি তাঁর দাসানুদাস। অতএব তোমার

কথা প্রত্যাহার কর।

এই কথা শুনে দেলেরা ঈষৎ হেসে বলল—কৌলফ কাল যে সব কথা বললে আজ সে সব ভুলে অন্য কথা বলছ? এরূপ কাজ অত্যন্ত অন্যায়। কাল তুমি বললে যে তুমি রাজমহিষীর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আজ তা অস্বীকার করছ।

দেলেরার এ ধরণের মিথ্যা উক্তি শুনে কৌলফ হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন সে বলল—সুন্দরী, শুনেছি তুমি অতি সুন্দর গান গাও। আজ আমাদের একটি গান শোনাতে তোমার নিশ্চয় আপত্তি হবে না।

দেলেরা তখন অত্যন্ত মধুর গানে ভৃত্যরূপী রাজাকে মুগ্ধ করে ফেলল।

রাজা সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বলে ফেললেন—সত্যি কথা বলতে গেলে আমার অন্তঃপুরে তোমার মত সুগায়িকা একজনও নেই।

এ কথা শুনে দেলেরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! সে হতজ্ঞান হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে সহচারীদের কাছে সব কথা খুলে বলল। তারপর তাদের পরামর্শ অনুসারে ছুটে এসে রাজার পদধারণ করে বলল—মহারাজ, যা হয়ে গেছে তার জন্য আমি মার্জনা ভিক্ষা চাইছি।

মহারাজ দেলেরাকে ভীতা ও কাতরা দেখে বললেন—সুন্দরী, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই পাপের স্খালন করতে পারে না, অতএব তাঁর শরণাপন্ন হও।

তখন রাজার কাছে সে সমস্ত কথা সঠিক খুলে বলল। এতে রাজার মনের মেঘ কাটলেও কৌলফের সঙ্গে রাজমহিষীর কলঙ্কের সন্দেহ তাঁর মন থেকে দূর হ'ল না। কিন্তু তিনি কৌলফকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই তিনি তাকে কোনও শাস্তি না দিয়ে দেশান্তর গমনের আজ্ঞা প্রদান করলেন।

কৌলফ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হ'ল না। অবশেষে মনের দুঃখে রাজপুরী ত্যাগ করে তাহার দেশের দিকে যাত্রা করল। যতদিন তার কাছে অর্থাদি ছিল ততদিন সে বেশ ভালভাবেই দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু যখন সমস্ত অর্থাদি নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন সে নানাভাবে ক্লেশ ভোগ করতে লাগল। অতঃপর সে একটি মস্‌জিদে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে সে তথাকার নিয়মানুসারে প্রত্যহ দু'খানা রুটি ও ডাল পেত। তাতেই তার দিন আনন্দে কাটতে লাগল। মজাহার নামে একজন সওদাগর প্রায়ই উপাসনার নিমিত্তে সেখানে আসত। সে কৌলফকে বিদ্বান লোক মনে করে তাকে প্রত্যহ সমাদর করে নিজগৃহে নিয়ে যেত এবং আহারাদির পর কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় দিত। এইভাবেই কিছুদিন কাটল।

তারপর একদিন দানেশনন্দ নামে আর এক সওদাগর এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল—জনাব, আপনি এভাবে এখানে দিন কাটান কেন?

কৌলফ তখন তার সমস্ত পরিচয় এবং তার দুর্দশার কারণ খুলে বলল। তখন দানেশনন্দ বলল—মজাহার, আপনাকে রোজ খেতে

দেয় কেন জানেন? তার পুত্র তাহেরের একটি অতি সুন্দরী স্ত্রী ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে তার সামান্য কারণে কলহ হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর মজাহার পুত্র তাহের তার পত্নীকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু বিবাহের নিয়ম অনুযায়ী আর কেউ তাকে বিবাহ করে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাহেরের সঙ্গে তার পুনর্বিবাহ হতে পারে না। এইজন্যই মজাহার চায় যে এক রাত্রির জন্য আপনি তাকে বিবাহ করে তার স্বামী হবেন; তারপর তাকে পরিত্যাগ করবেন। এই জন্যই সে প্রত্যহ মস্‌জিদ থেকে আপনাকে নিজবাড়ী নিয়ে আদর-আপ্যায়ন করে এবং এজন্য সে আপনাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রাও দিতে ইচ্ছুক।

কৌলফ এ-কথায় সম্মত হলে তাকে তখনই মজাহার ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে যথারীতি বিবাহ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু যে গৃহটি বর ও কনের রাত্রি বাসের জন্য স্থির ছিল, বিবাহের পর সেটিকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দেওয়া হ'ল এই উদ্দেশ্যে যে, কৌলফ নারীর মুখখানি যেন দেখতে না পায়। তাহেরের আশঙ্কা ছিল, কৌলফ একবার নারীর সুন্দর মুখখানা দেখলেই হয়ত তাকে আর ত্যাগ করতে চাইবে না।

এই ব্যবস্থামত বিবাহের পরে দু'জনকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রেরণ করা হ'ল। কিন্তু শয়ন করবার সময় মেয়েটি মনে মনে ভাবতে লাগল যে, এই ঘরে যে পুরুষের সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রিবাস করতে এলাম, এখনো পর্যন্ত তার মুখখানাই দেখতে পেলাম না।

কোলফও এই সময় মেয়েটিকে বলল—সুন্দরী, তোমাকে পেয়ে আমি সত্যই আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবসতঃ আমি তোমার মুখখানাও দেখতে পেলাম না, তবে দুঃখ এই যে তোমাকে পরিত্যাগ করে কালকেই আমাকে চলে যেতে হবে।

কোলফের কথা শুনে যুবতী বিস্ময়ের সুরে বলল—একি, তোমার গলার স্বর আমি যেন আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা তুমিই কি ডামাস্ক নগরের বণিকপুত্র কোলফ?

কোলফও সহর্ষে বলে উঠল—আরে! তোমার স্বর যে আমার সেই দেলেরার মতো? এত দিন পরে কি খোদার কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলাম!

দেলেরা তখন বলল—আজ আমার জন্যই তোমার এ দশা, তা আমি জানি। কিন্তু আমি কি তোমার ক্ষমা পাব না?

কোলফ বলল—নিশ্চয়ই। তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হচ্ছি তা কি করে বোঝাব? এখন চিন্তা হচ্ছে কাল প্রভাতে তোমাকে আমি কি করে রক্ষা করব?

দেলেরা বলল—খোদা যখন আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, তখন শেষ পর্যন্ত আমাদের সহায় হবেন।

কোলফ তখন প্রশ্ন করল—আচ্ছা দেলেরা, কি করে মজাহারতনয় তাহেরের সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'ল বলবে?

দেলেরা বলল—তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই বাবা আমার

বিবাহের জন্য সুপাত্র খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে মজাহারতনয়কে যথেষ্ট ধনবান দেখে তার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিলেন। কিন্তু আমি তার আগেই আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমাকেই সমর্পণ করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সাধ্য হল না যে, পিতার আদেশ অমান্য করি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু বিবাহের পর একদিনের জন্যও আমি সুখী হতে পারিনি। নিরন্তর তোমার চিন্তায় আমার প্রতিটি প্রহর কেটেছে। এতদিন পরে যদিও তোমাকে ফিরে পেলাম, কিন্তু এর পরিণাম যে কি হবে ভাবতেও আমার হৃদকম্প হচ্ছে।

কৌলফ বলল—সেজন্যে তুমি চিন্তিত হয়োনা। আমার প্রাণের বিনিময়েও আমি তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমার মনে হয় খোদা আমাদের সহায় হবেন। এইভাবে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে প্রভাত হয়ে এলো। তখন কৌলফ তাহেরের সঙ্গে স্নানাদি সম্পন্ন করে একটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করল। এদিকে দানেশনন্দও সেখানে উপস্থিত হয়ে অতি সমাদরে তাকে ভোজন করালেন। তারপর তার হাতে পঞ্চাশটি মুদ্রা ও একটি পাগড়ী দিয়ে বললেন—যুবক, এই মুদ্রা তোমার। এবার তুমি পত্নী ত্যাগ করে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে কৌলফ মুদ্রাগুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল—জনাব আপনি এ কেমন কথা বলছেন? এদেশের রাজা সুবিচারের জন্য জগদ্বিখ্যাত। আপনি এ ধরণের ব্যবহার করলে আমি অগত্যা তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ করতে বাধ্য হব।

এসব কথা শুনে দানেশনন্দ মজাহারের কাছে এসে বলল—আপনি যে লোককে এতদিন খাদ্যাদি প্রদানে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, এবার তার ব্যবহার শুনুন। এ ধরণের অসৎ লোক বোধ হয় শহরে দ্বিতীয় আর নেই। তখন সে সমস্ত কথা মজাহারকে খুলে বলল।

মজাহার বললেন—এ হতে পারে না! বোধ হয় সে লোক আরও বেশি কিছু চায়, তাই এমন কথা বলছে। যাই হোক তাকে একশ স্বর্ণমুদ্রা দাও।

কৌলফ আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা শুনছিল। এই সময় সকলের সামনে এসে বেশ শক্ত হয়ে বলল—না না, ও কথা ঠিক নয়, আমি টাকার আশায় মোটেই বিবাহ করিনি। এ ধরণের ব্যবহার করলে আমি রাজার কাছে নালিশ করতে বাধ্য হব।

দানেশনন্দ এবার ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—কি, এতদূর সাহস? চল তোমাকে কাজীর কাছে নিয়ে যাই। দেখি তোমার তেজ কেমন থাকে।

এতেও কৌলফ নরম হল না দেখে তাকে পাকড়াও করে বিচারের জন্য কাজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

কাজী সমস্ত ঘটনা শুনে কৌলফকে বলল—আরে তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিচ্ছিস? ভিক্ষাবৃত্তিই যার উপজীবিকা, সে কিনা তাহেরের মত মানীলোকের বিবিকে বিয়ে করতে চায়? তুই কি তার যোগ্য-পাত্র?

এতেও কৌলফ কিন্তু নরম হল না। কাজটা যে তার পক্ষে অন্যায়

নয়, এই কথাই সে শক্ত হয়ে কাজীকে বলতে লাগল। তার স্পর্দ্ধা দেখে কাজী ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। কৌলফ নীরবে সে অত্যাচার সহ্য করল। তখন কাজী একটু নরম হয়েই বলল —আজকের মত এ বেচারাকে ওর স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে দিন। তবে কালও যদি ওর মনের পরিবর্তন না হয়, তবে আরও কঠিন দণ্ড দিব।

তক্ষুণি তাকে শয়নকক্ষে দেলেরার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কৌলফের উপরে কাজীর অত্যাচার দেখে কাঁদতে কাঁদতে দেলেরা বলল —তোমার এ সমস্ত অত্যাচার সহ্য করবার মূলে যে আমি, এ কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। আশা করি, তুমি এ হতভাগিনীকে ক্ষমা করেছ।

এ কথা শুনে কৌলফ বলল—ছি ছি, তুমি কেন আমাকে এতটা নীচ মনে করছ। আমি তোমার উপরে এতটুকু রাগ করিনি। তুমি মিথ্যাই নিজকে দোষী মনে করছ।

দেলেরা বলল—তুমি ধনহীন বলেই তোমাকে এভাবে নির্যাতন করছে। কাল তোমাকে কাজীর কাছে নিয়ে গেলেই তুমি নির্ভয়ে কোজন্তী নগরের বিখ্যাত মাসুদ-পুত্র বলে নিজের পরিচয় দিও। তোমার এ পরিচয় পেলে কাজী নিশ্চয়ই তোমাকে মুক্তি দেবেন।

বাইরের এত দুঃখের মধ্যেও তারা দু'জনে মনের আনন্দে রাত্রিটি অতিবাহিত করল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে মজাহারপুত্র তাহেরের তর্জনে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, একটু পরেই একদল লোক সঙ্গে করে তাহের এসে কৌলফকে বলল—তুমি কি এখনও একে ত্যাগ করতে সম্মত নও ?

এ কথা শুনে কৌলফ বলল—তা কি করে সম্ভব? তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদের হৈ-চৈ দেখেই আমি ভয় পেয়ে নিজের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত হব? এ কথা মনেও স্থান দিও না।

কৌলফের কথা শুনে ক্রোধে তাহেরের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে চীৎকার করে বলে উঠল—শয়তান, তুই কি মনে করেছিস্ কাজীর হাত থেকে নিস্তার পাবি? কিছুতেই না।

তক্ষুণি আবার কৌলফকে কাজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কাজী বলল—আজ তুমি নিশ্চয়ই ওই নারীকে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছ?

কৌলফ বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল—ধর্মাবতার, আপনি আমাকে যা ভাবছেন, আসলে আমি তা নই। বাস্তবিকই কোন নীচবংশে আমি জন্মগ্রহণ করিনি এবং আমাদের বংশের ধনের খ্যাতিও কম নয়। তবে দুরাবস্থার সময় কারও নিকট আত্মপরিচয় দিতে নেই, তাই এ পর্যন্ত এসব কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। কিন্তু এখন সঙ্কটে পড়ে সবকিছুই প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। তাহলে শুনুন, আমি কোজন্তীনগরবাসী খ্যাতনামা মাসুদের পুত্র। আমার নাম নুরুদ্দিন। পিতা আমার এই দুরাবস্থার কথা শোনবামাত্রই উটের পিঠে মোহরের বস্তা চাপিয়ে আমাকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন। আমি প্রচুর ধনরত্নাদি নিয়ে দেশ থেকে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু পথে দস্যুদলের হাতে পড়ে আমার সবকিছু অপহৃত হওয়াতেই এ অবস্থা হয়েছে।

কাজী তার মুখে এ ধরণের কথা শুনেই সম্মান সহকারে বললেন—

তাই নাকি, তাহলে সত্যিই কি তুমি মসুদের পুত্র ? কাল যদি তুমি এ সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলতে, তবে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হত না।

তখন তিনি মজাহারকে বললেন—জনাব, এ সামান্য লোক নয়। তাই আমি একে স্ব-পত্নী ত্যাগ করতে বলতে পারি না।

মজাহার পুত্র তাহের বলল —হুজুর, আপনি কি একটা প্রতারকের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন ! বুঝতে পারছেন না—ও যা বলছে তার সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং অমূলক।

কাজী তখন বললেন—বেশ, আমি এক্ষুণি দূত পাঠাচ্ছি। সে পনের দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। তখন ওর কথা সত্য কিনা প্রমাণিত হবে। ওর কথা সত্য হলে আপনারা আশা করি নালিশ প্রত্যাহার করবেন ?

মজাহার বলল—অন্য কোনও বিবাদের প্রয়োজন নেই। মাসুদকে আমি চিনি এবং তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়ও আছে। ও যদি সত্য কথা বলে, তবে আমি নির্বিবাদে আমার পুত্র-বধুকে এর হাতে সমর্পণ করব।

তাহের তখন কাজীকে বলল—জনাব, এই পনর দিন একে এর পত্নীর কাছ থেকে দুরে থাকতে নির্দেশ দিন।

কাজী বললেন তা হয় না। কাউকে তার নিজ পত্নীর কাছে থেকে দুরে বাস করবার নির্দেশ দেওয়া অধর্মোচিত। আমি আজই মাসুদ-ভবনে দূত পাঠাচ্ছি। সে ফিরে এলেই তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

বিচারের সমস্ত ফলাফল শুনে দেলেরা পরম প্রীত হয়ে বলল—স্বামী আর কোনও ভয় নেই। এই পনের দিনের মধ্যে আমরা অন্যত্র পলায়ন করতে সক্ষম হব। তারপর বিবাহের যে যৌতুকাদি আছে তা দিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে পারব।

কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হওয়া দুস্কর হয়ে উঠল। তখন উপায়ন্তর না দেখে কৌলফ কাজীর কাছে গিয়ে বলল—জনাব, আমি এবং আমার পত্নী দু'জনেই শত্রুপুরী থেকে দূরে অন্যত্র বাস করতে চাই। পিতা সর্বদা আমাকে বলতেন—শত্রুর এলাকা থেকে দূরে বাস করা কর্তব্য। আমার স্ত্রীরও তাই মত।

তাহের তখনি তর্জন করে আপত্তি জানাল, বলল—এ হতে পারেনা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। দেলেরা বরাবর আমাকেই ভালবাসে। তোর সঙ্গে দু একরাত কাটিয়েছে বলে কিছুতেই সে আমাকে ত্যাগ করে যেতে পারে না।

কৌলফ তখন কাজীকে লক্ষ্য করে বলল—ধর্মাবতার, আমি মিথ্যা বলিনি। দেলেরা আমাকেই ভালবাসে, তাই আমার সঙ্গে থাকতে চায়। আমি আবার বলছি—যদি দেলেরা নিজের মুখে একথা স্বীকার না করে তাহলে আমি স্বয়ং তাকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করে চ'লে যাব।

তাহেরও সঙ্গে সঙ্গে বলল—বিচারপতি! আপনি সাক্ষী রইলেন। যদি নিজে দেলেরা এ কথা স্বীকার করে তবে আমিও স্বেচ্ছায় তাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করবার অনুমতি দিতে পারি।

অগত্যা তখনি দেলেরাকে বিচার কক্ষে আনা হল। কাজী তাকে

জিজ্ঞাসা করলেন—সুন্দরী, পতিগৃহে বাস করবার তোমার ইচ্ছা আছে, না তুমি তা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চাও ? আর তোমার এই দুই স্বামীর মধ্যে কাকে তুমি বেশী ভালবাস ?

দেলেরা সংযত স্বরে বলল—ধর্মাবতার ! আমি সত্যি কথাই বলছি । এই দু'জনের মধ্যে মাসুদতনয়ের প্রতিই আমার একান্ত অনুরাগিনী । বিচারপতি, আপনার অনুমতি পেলে আমি সানন্দে তাঁরই অনুগমন করিতে ইচ্ছুক ।

কাজী তখন আসামীর সত্যবাদীতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে রায় দিলেন —দেলেরাকে সঙ্গে করে আসামী অন্যত্র বাস করতে পারবে । তবে উপযুক্ত প্রহরীর দ্বারা তার গৃহ খুব ভালভাবে ঘিরে রাখা হবে ।

তখন কাজীর আদেশ অনুসারে কৌলফ দেলেরার সঙ্গে মজাহারের গৃহ পরিত্যাগ করে নগরের আর একটি বাড়ীতে বাস করতে লাগল । দোলরার বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুকাদি দিয়ে বেশ ভালভাবে তাদের দিন কাটতে লাগল । পাছে ছলনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে যদিও তারা অতিশয় সাবধানে রইল্, তথাপি এই রহস্যময় বৃত্তান্ত শুনে নগরীর অনেকেই তাদের দেখবার জন্যে এই বাড়ীতে আসতে লাগল ।

একদিন একজন লোক অতিশয় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে তাদের ভবনে এসে বলল জনাব, আমি আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী । সত্য কথা বলতে কি, দেলেরার মত সুন্দরী নারীর পক্ষে তাহেরের চেয়ে আপনি গুণে সৎপাত্র । আপনি যদি আপনার সমস্ত কাহিনী অকপটে প্রকাশ করে আমাকে বলেন তবে আমিও

আপনার সাহায্য করতে পারি।

কৌলফ তখন পুরানো সমস্ত কাহিনী তাঁর কাছে প্রকাশ করে অবশেষে বলল—আমি জানি পঞ্চদশ দিনে হয়ত কাজীর আদেশে আমার প্রাণ যাবে, তবুও প্রাণ থাকতে আমার প্রাণাধিকা দেলেরাকে আমি ত্যাগ করতে পারবনা।

সমস্ত শুনে নবাগত ব্যক্তি বলল—যদি আমার সাধ্য থাকত প্রাণ দিয়েও আপনাদের উপকার করতাম। কিন্তু তা আমার সাধ্যাতীত। যাক্, এ সব কথা আর কাউকে বলবেন না।

নবাগত ব্যক্তি প্রস্থান করলে দেলেরা বলল—স্বামীন, এই পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজ কার্য উদ্ধারের জন্য আত্মীয়ভাবে অন্য লোকের গোপন কথা ও মনের ভাব জেনে নেয়। এ ব্যক্তিকে দেখে মনে হচ্ছে, এও বোধ হয় তেমনি।

কৌলফ বলল—না আমার কিন্তু কিছুতেই এঁকে সে ধরণের লোক বলে সন্দেহ হয় না। আমার মনে হয়, উনি আমাদের উপকারের জন্যই চেষ্টা করবেন।

নানা চিন্তায় পনর দিন কেটে গেল। নানাভাবে পলায়নের চেষ্টা করেও তা সফল হল না। এমন কি প্রহরীকে ঘুষপ্রয়োগের চেষ্টাও সম্পূর্ণ বিফল হল। ষোড়শ দিবসে দূত প্রত্যাবর্তন করবে এই চিন্তায় দু'জনেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। এবার বুঝি তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

কৌলফ তখন বলল—প্রিয়ে, আজই বোধ হয় তোমার সঙ্গে

আমার শেষ দেখা। এক্ষুনি কাজীর আদেশে আমাকে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। আর কখনও তোমার মুখ-দর্শন করতেও সমর্থ হব না, এই আমার দুঃখ।

এ কথা শুনে দেলেরা বলল—প্রিয়তম, সেজন্যে দুঃখ করো না। পতি-ছাড়া নারীর জীবনে কি ফল? তোমার মৃত্যু হলে আমিও তোমার সাথে মৃত্যুকে বরণ করব। তখন শয়তান তাহের বুঝবে, প্রকৃত প্রেমের মহিমা কি রকম।

হঠাৎ বাড়ীর বাইরে বহুলোকের কলরব শোনা গেল। দেলেরা সভয়ে কৌলফের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল—বুঝেছি, সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে; তাই কাজী লোকজন সঙ্গে করে আমাদের শাস্তি দেবার জন্য আসছেন।

কিন্তু কাজী ভিতরে প্রবেশ করে একেবারে কৌলফের সামনে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—আমার সমস্ত অবিচারের জন্য আপনি আমাকে মার্জনা করুন। আপনার পিতা আপনার জন্য প্রচুর ধন ও পত্র পাঠিয়েছেন।

তাহেরও বলল—যুবক, আজ থেকে আমার দেলেরা তোমারই হল। আমি যে অপরাধ করেছি সমস্তই মার্জনা কর।

কৌলফ অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়েছিল। এমন সময় একজন কর্মচারী প্রবেশ করে তার হাত-চুম্বন করে বলল—প্রভু আপনার পিতামাতা দীর্ঘদিন আপনাকে না দেখে কাতর হয়েছেন। আপনি

অবিলম্বে তাঁদের দর্শন দিন, এই জন্যই আমি এসেছি। এই নিন আপনার পত্র। কৌলফ পত্রটি খুলে পাঠ করতে লাগল ঃ

প্রিয় পুত্র,

তুমি যেদিন থেকে আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছ, সেদিন থেকে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সুখ নেই। তুমি পত্র-পাঠ আমাদের কাছে ফিরে এসে তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ও নববিবাহিতা পত্নী নিয়ে সুখে দিন কাটাও—এই আমরা চাই।

তখন কৌলফ দেলেরার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃতি করে পত্রটি তার হাতে দিল। সেটা পড়ে দেলেরা বলল—নিশ্চয়ই ভ্রমক্রমে এটা হয়েছে। যদি মাসুদপুর নুরুদ্দীনের কানে একথা যায়, তবে নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে যাব। চল, আমরা তার আগেই এখান থেকে পলায়ন করি।

দু'জনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এমন সময় একদল সৈন্য সেই-স্থানে উপস্থিত হল। তাদের নায়ক কৌলফের সামনে এসে শ্রদ্ধায় অভিনন্দন করে বলল—মহারাজ আপনার সঙ্গে দর্শন করে সমস্ত ঘটনা শুনতে চান। তিনি এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে পড়েছেন। আমরা আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য যান-বাহন এনেছি।

রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে চাইতেই কৌলফ অবাক হয়ে গেল। তিনি আর কেউ নন—সেদিন সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ছদ্মবেশে ইনিই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

কৌলফ তখন নৃপতির পদধারণ করে ক্ষমা চাইল। রাজা হেসে বললেন—কৌলফ, তোমার ভয়ের কিছুই নেই। তুমি সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছ। আমিই কাজীর দুতের সাথে পথে সাক্ষাৎ করে তার দ্বারা এই অসাধ্য সাধন করিয়েছি। তোমাদের দু'জনের প্রণয়ে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ থেকে তুমি উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত হলে। তোমার আর কোনও ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেলেরাকে এনে পরম সুখে রাজপুরীতে বাস কর।

তখনই নরপতির আদেশে একজন বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত তাদের সমস্ত প্রণয়বৃত্তান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন।

* * *

এইভাবে ধাত্রী কৌলফ ও দেলেরার গল্পটি শেষ করে রাজকন্যার দিকে মৌনভাবে তাকালেন। রাজকন্যা ফরোখনাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—কৌলফকে আমি কিছুতেই আদর্শ প্রেমিক বলতে পারি না। বহু নারীকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছিল প্রথম জীবনে। তারপর দেলেরাকে ভালবাসলেও মির্জান ভূপতির দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেলেরাকে সে ত্যাগ করে দেশান্তরে চলে যায়। ক্ষণকালও দেলেরার জন্য অপেক্ষা করেনি। তাই কোনক্রমেই তাকে যথার্থ প্রেমিক বলা যায় না। যথার্থ প্রেমিকগণ প্রচুর অর্থকষ্ট সত্ত্বেও কোনদিনই নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেন না। কিম্বা কখনও লোভের জন্য অন্যের স্ত্রীর

পাণিগ্রহণে স্বীকৃতি হন না। সেই স্ত্রীটি দেলেরা না হয়ে অন্য কোনও নারীও ত হতে পারত। অতএব আমি কৌলফকে আদর্শ-প্রেমিক বলবনা।

একথা শুনে ধাত্রী বললেন—রাজকন্যা, আমি এবার অপর এক পুরুষের কাহিনী বলছি। আশা করি, এ কাহিনী শুনলে তুমি অবশ্যই পুরুষ জাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হবে এবং তখন তোমার মনের সমস্ত বিদ্বেষভাব দুর হবে।

রাজকন্যা অনুমতি দিলে ধাত্রী তাকে যুবরাজ কালেফের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

যুবরাজ
কালেফের কাহিনী

বহুদিন পূর্বে অস্ত্রাখান প্রদেশে তৈমুর নামে এক মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ছিলেন বলে বিধাতা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে একটি সুন্দর পুত্র দান করলেন। রাজা পুত্রের নাম রাখলেন কালেফ! রাজকুমার শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমে তৎকালীন যুবরাজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলেন। ধীরে ধীরে যুদ্ধ করে তিনি নিকটবর্তী সমস্ত রাজন্যগণকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করে দিগ্বিজয়ী বীর বলে খ্যাতি অর্জন করলেন।

একদা কার্জনরাজের নিকট থেকে একজন দুত তাঁর কাছে এসে বলল—মহারাজ, আপনি কার্জনরাজকে উপযুক্ত কর প্রদান করুন। আশা করি, এর অন্যথা করবেন না। কারণ, তার আদেশ না মানলে তিনি দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে আপনার রাজ্য আক্রমণ করবেন।

তৈমুর তখন কর্তব্য নির্ধারণ করবার জন্য একটি মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করলেন। তখন কালেফ এবং অধিকাংশ অমাত্য যুদ্ধ করাই উচিত বলে মত প্রকাশ করলেন। তৈমুর রাজাও দূতকে সেই কথা বলে ফিরিয়ে দিলেন। অনন্তর তৈমুর সমস্ত রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত সার্কেসিয়ান নরপতি

পর্যন্ত অর্ধলক্ষ সৈন্য সহ তাঁকে সাহায্য করতে এলেন।

ওদিকে কার্জন অধিপতি দূতমুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে ক্রোধে অধীর হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে তিনি তৈমুররাজকে আক্রমণ করলেন। তৈমুররাজের সংগৃহিত দেড় লক্ষ সৈন্য ও কালেফের নেতৃত্বে যুদ্ধযাত্রা করল।

পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হল। দুইপক্ষই সমান পরাক্রমশালী। অতএব যুদ্ধ সমান সমান চলতে লাগল। সারাদিন যুদ্ধ করেও কোন পক্ষই জয়লাভ করতে পারল না। তবে বিজয়লক্ষ্মী বোধ হয় কালেফের প্রতি প্রসন্ন হবেন বলেই মনে হল। কালেফের বীরত্ব দেখে কার্জন অধিপতি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন!

কিন্তু রাত্রিকালে যখন দু'পক্ষের সৈন্য বিশ্রাম করছিল, তখন সার্কেসিয়ান নৃপতি কার্জন অধিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—যদি আপনি সার্কেসিয়ানদের উপরে কর ধার্য করবেন না, এমন অঙ্গীকার করেন, তবে এই মুহূর্তে আমি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি। এতে আনন্দিতমনে কার্জন অধিপতি সম্মত হলে তিনি তাঁর সেনাদল নিয়ে সেই রাত্রেই দেশের দিকে ফিরে গেলেন।

এতবড়ো একটা সম্বল হারিয়ে যুবরাজ কালেফ বিপন্ন হয়ে পড়লেন। পরদিন যুদ্ধে প্রচুর বীরত্ব দেখিয়েও তিনি জয়লাভ করতে পারলেন না। তখন একদল সৈন্যসহ তিনি রাজধানীতে ফিরে এসেই পিতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। তাঁর তখন সঙ্কল্প হল যে, কোনও সদাশয় নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে পরে সুযোগক্রমে

স্বরাজ্য উদ্ধার করবেন। কয়েকদিন ক্রমাগত গমন করবার পর অবশেষে তাঁরা ককেসাস পর্বতের কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিরাট একদল দস্যু বাস করত। সুযোগ বুঝে চার হাজার দস্যু একযোগে রাজসৈন্যদের আক্রমণ করল।

রাজসৈন্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচশো। তবুও তারা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে একে একে প্রান দিল। তখন রাজার সমস্তধন রত্নাদি লুণ্ঠন করে দস্যুরা পলায়ন করল। নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে মনের দুঃখে রাজা ও রাণী কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁদের সান্তনা দিয়ে যুবরাজ কালেফ বললেন—আপনারা অত চিন্তিত ও দুঃখিত হচ্ছেন কেন? এর আগেও অনেক প্রবল প্রতাপশালী নরপতি আমাদের মত অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পরিশেষে নিজ অবস্থায় ফিরে পেয়ে মনের আনন্দে কাল কাটিয়েছেন। আপনারা পরম করুণাময় খোদাকে স্মরণ করুন। তিনি অবশ্যই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর করবেন।

যুবরাজের প্রবোধ-বাক্য শুনে নরপতি কিঞ্চিত ধৈর্য অবলম্বন করে বললেন—বৎস, তুমি যা বললে সমস্তই সত্য। বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে যা লিখেছেন তা খণ্ডন করা আমাদের সাধ্যাতীত। এরপর কিছুটা বিশ্রাম করে তাঁরা পুনরায় অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি সুন্দর সরোবরের তীরে এসে তাঁরা উপস্থিত হলেন। সেখানে একজন বৃদ্ধকে দেখে রাজা প্রশ্ন করলেন—জনাব, এ স্থানের নাম কি দয়া করে বলবেন? আর এ দেশের রাজাই বা কে?

সচিত্র পারস্য উপন্যাস

বৃদ্ধ বললেন—জনাব, এদেশের নাম জ্যাক্ এবং এদেশের ভূপতির নাম এলেঙ্গি খাঁ। আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। এখন আপনার পরিচয় প্রদান করলে আমিও আনন্দ পাব।

রাজা তখন বৃদ্ধকে নিজ পরিচয় প্রদান করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বৃদ্ধ শুনে বললেন—এর জন্য দুঃখ করবার কি আছে। আমিও একবার দস্যুহস্তে পতিত হয়ে নিঃস্ব হয়েছিলাম, কিন্তু ক্ষণকালও তজ্জন্য চিন্তা করি নাই। নিজ অধ্যবসায়ে আবার সব ফিরে পেয়েছি। আপনাদের মত অবস্থা আমারও হয়েছিল। আমার কাহিনী শুনলে সমস্ত বুঝতে পারবেন।

এই বলে বৃদ্ধ তাঁর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন :

ফয়জুল্লার কাহিনী

মৌজল দেশের অধিপতি রাজা বনাট আমার পিতা। আমার নাম ফয়জুল্লা। পিতার একমাত্র সন্তান আমি। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যৌবনে আমি পদার্পন করলে পিতা আমার বিবাহ দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে বললাম যে, এখন আমি দেশ ভ্রমণে যেতে চাই, ফিরে এসে তাঁর আদেশ পালন করব। তিনি এতে সম্মত হয়ে প্রচুর অর্থ, একশত সৈন্য ও কয়েকটি ভৃত্য আমার সঙ্গে দিলেন।

আমি প্রথমে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করি। কিছুদিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় মরুভূমিতে উপনীত হয়ে রাত কাটাবার ইচ্ছায় সে স্থানেই আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ মধ্যরাত্রে জনকোলাহলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল। জেগে দেখি দস্যুদল কর্তৃক আমরা আক্রান্ত হয়েছি। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমার অধিকাংশ সৈন্য হতাহত। আমি তখন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম। দস্যুদলেরও কয়েকশত লোক হতাহত হল। প্রভাতে দস্যুগণ আমাদিগকে সংখ্যাল্প দেখে আবার আক্রমণ করল। প্রবল চেষ্টা করেও

আমরা বিফল হলাম। আমার অবশিষ্ট সৈন্য, এমন কি ভৃত্য পর্যন্ত দস্যু কর্তৃক নিহত হল। এর পরে তারা আমাকে হত্যা করতে এলে আমি দস্যুপতিকে বললাম—মোজলাধিপতি বনাটকের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র আমি—আমার নাম ফয়জুল্লা। অকারণ আমাকে হত্যা করো না। দস্যুপতি বলল—ভালই হয়েছে। পূর্বে তোমার পিতা আমাদের কয়েকজন সঙ্গীর প্রাণদণ্ড করেছিলেন। আজ তোমাকে বধ করে তার প্রতিশোধ নেব।

দলপতির আদেশে তখন অনুচররা আমাকে বন্দী করে পর্বত সন্নিকটে তাদের বাসস্থানে নিয়ে গেল। সেখানে একটি বৃক্ষের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রাখল। বন্দীভাবে অনাহারে তিন দিন গত হ'ল। চতুর্থ দিনে একজন ভৃত্য এসে দলপতিকে বলল—সর্দার! একদল যাত্রী অল্প দূরে আস্তানা পেতেছে, সেখানেই রাত্রিবাস করবে। খবরটি শুনেই দলপতি সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রীদলটিকে আক্রমণ করবার জন্য গমন করল। আমি একাকি সেখানে পড়ে রইলাম।

একটু পরে দস্যুপতির স্ত্রী তথায় এসে বলল—যুবক, তোমাকে দেখে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তুমি এখনি পালিয়ে যাও। বলতে বলতেই সে আমার বন্ধন-মুক্ত করে পালাবার পথ দেখিয়ে দিল।

আমি তার দেখান পথে চলতে চলতে বোগদাদ নগরে উপনীত হলাম ও একটি মসজিদে আশ্রয় নিলাম। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক বাড়ীর দরজায় গিয়ে কিছু খাবার চাইলাম। এক বৃদ্ধা এসে আমাকে

একখানা রুটি দিলেন। সেই বাড়ীর উন্মুক্ত জানালায় একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। সে আমাকে দেখে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল। আবার তাকে দেখতে পাব এই আশায় আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; কিন্তু আশা আমার পূরণ হলনা।

সন্ধ্যায় একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম···জনাব এ বাড়ী কার ?

বৃদ্ধ বলিল—ঐশ্বর্যশালী ভূতপূর্ব রাজ প্রতিনিধি মোয়াফেকের এ বাড়ী।

এই শুনে চিন্তা করতে করতে কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধাপ্রদত্ত রুটিখানি খেয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ জনকোলাহলে আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন প্রহরী আমার সামনে এসে প্রশ্ন করল—তুই কে, কেন এখানে এসেছিস্। আমি বললাম—এখানে বিশ্রাম করছিলাম। তারা বলল—তোর ভাগ্য ভাল। আমাদের সঙ্গে চল, প্রচুর খাদ্য পাবি। এই বলে তারা আমাকে সেখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। খানিক পড়ে তাদের সঙ্গে আমি একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে এলাম। সেখানে কতকগুলো ডাকাত বসেছিল।

ডাকাতের সরদার তাদের দলে আমাকে মিলতে বলল, কিন্তু আমি সম্মত হলাম না। এই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ কাজীর লোক এসে আমাদিগকে ধরে নিয়ে গেল। কাজীর আদেশে আমরা কারারুদ্ধ হলাম।

পরদিন কাজীর এজলাসে আমাদের বিচার আরম্ভ হল। দস্যুগণ

নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করল। আমিও কাজীর সমক্ষে অকপটে এখানকার ঘটনা সমস্ত বললাম।

আমার মুখে সব কথা শুনে কাজী আমাকে বললেন—যুবক! শুনেছি মোয়াফেক কন্যা রূপবতী। তার পিতা ঐশ্বর্যশালী। তুমি সাধারণ লোক, তথাপি তোমার অভিলাস সিদ্ধির জন্য আমি সচেষ্ট হলাম। তোমার সঙ্গেই যাতে তার বিবাহ হয়, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এ কথা শুনে আমি আনন্দিত হলাম। কাজীর আদেশে এক ভৃত্য এসে আমাকে স্থানান্তরে নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল।

কাজী দূত পাঠিয়ে মোয়াফেককে আনালেন। তিনি বললেন—মোয়াফেক! বসরার রাজপুত্র আমার বাড়ীতে এসেছেন। তোমার কন্যার রূপগুণের খ্যাতি আমার মুখে শুনে তিনি তাকে বিবাহ করতে অভিলাষী হয়েছেন। তুমি এতে সম্মত হলে আমি প্রীত হব, আর এর জন্য আমাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তার অবসান হবে এবং আমাদের বন্ধুত্বও থাকবে।

মোয়াফেক বলল—এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আমার প্রতি আপনার দারুণ বিদ্বেষ থাক সত্ত্বেও হঠাৎ এ রকম ব্যবহারের কারণ কি?

কাজী বললেন—যা হবার হয়ে গেছে, তার জন্য এখন বিচার করে কোনও লাভ নেই! তুমি শীঘ্র যুবরাজকে জামাতৃ-পদে বরণ করে প্রীতিভাজন হও মোয়াফেক!

এদিকে কাজীর অনুচরেরা আমাকে স্নান-আহারে তৃপ্ত করে বিশ্রামান্তে রাজপোষাকে সাজিয়ে পুনরায় কাজীর নিকটে নিয়ে গেল। মোয়াফেকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কাজী আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—যুবরাজ, ইনিই মোয়াফেক। আপনার অভিপ্রায় ইঁহাকে জ্ঞাপন করেছি। হৃষ্টচিত্তে ইনি কন্যা প্রদানে সম্মত হয়েছেন।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। আমাকে হতবাক্ দেখে কাজী তাড়াতাড়ি বললেন—মোয়াফেক! শুভকার্য শীঘ্র সম্প্রদান করা ভাল।

তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেই বিবাহ-পত্র লিখলেন। তাঁর নির্দেশ মত উপস্থিত ব্যক্তিদের সমক্ষে মোয়াফেক তাতে সহি করল। পরে কাজী বললেন—মোয়াফেক! যুবরাজকে নিজের আলয়ে নিয়ে গিয়ে জামাতৃ-পদে বরণ কর।

মোয়াফেক আমাকে নিয়ে বাড়ী গেল। কন্যাকে ডেকে সমস্ত বলল। মোয়াফেক-কন্যা জেম্রোদী রাজমহিষী হবার আশায় আমাকে সমাদর করতে লাগল।

মোয়াফেক বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। নগরবাসী পুলকিত এ ব্যাপারে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হলে খোদা সাক্ষী করে সর্বসমক্ষে সে আমাকে কন্যাদান করল। তারপর আহারান্তে পত্নীসহ বাসরগৃহে প্রবেশ করলাম আমি।

সুখ-রজনীর অবসান শীঘ্রই হয়। পাখিগণের প্রভাতকাকলী শুনে

গাত্রখানে উদ্যোগী হয়েছি, এমন সময় শব্দ শুনতে পেলাম। দ্বার খুলে দেখি কাজী প্রেরিত একজন ভৃত্য বাহিরে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে সে কাজীর আদেশ জানিয়ে হেসে বলল—যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে এখানে বিবাহ করেছি, এখনি সে সব পত্যর্পন করে আমাকে জীর্ণ-বস্ত্র পরিধান করতে হবে। আমি অগত্যা বিবাহকালের রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে কাজীর প্রেরিত আমার বস্ত্রাদি পরিধান করলাম। ভৃত্য পরিত্যক্ত রাজ-পরিচ্ছদ নিয়ে চলে গেল।

জেম্রোদী এ-সব দেখে কারণ জানতে চাইলে আমি বললাম—প্রিয়ে! দুরাত্মা কাজী আমাকে নীচবংশজাত মনে করে তোমার পিতাকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত করে আমার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় তোমার পিতাকে অপমান করিবার জন্য ঐ পরিচ্ছদে নিতে লোক পাঠিয়েছে। কিন্তু সে আমার যথার্থ পরিচয় জ্ঞাত নয়। যখন জানবে, তখন আফশোষের অন্ত থাকবে না। অবশ্যি আমি বসরার রাজপুত্র নহি; কিন্তু আমার পিতা বসরার চেয়েও অনেক অধিক ঐশ্বর্যশালী রাজ্যের প্রতাপশালী ভূপতি। সে রাজ্যের নাম মৌজাল। আমার পিতা রাজাধিরাজ বেনাটাক। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র। আমার নাম ফয়জুল্লা। দস্যুহস্তে পতিত হয়ে আমি এ দশা প্রাপ্ত হয়েছি। এই বলে আমার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। কাজীর কাছে আমি আমার বংশ পরিচয় চেপে রেখেছিলাম। সে আমাকে দীন ও অসহায় জেনেই তোমার মানী পিতাকে এভাবে অপমান করবার

দুরাশা পোষণ করছে।

জেম্রোদী আমার পরিচয় শুনে আনন্দিত হয়ে বলল—স্বামীন্! আপনি মোজাল দেশের রাজপুত্র, এ আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আপনি যদি দরিদ্রও হতেন, আমার অনুরাগের বিন্দুমাত্র হ্রাস হত না বা আমার পিতাও তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হতেন না। রাজকুমারগণ প্রায়ই একাধিক সুন্দরী নারীকে বিবাহ করে থাকেন। প্রকৃত প্রণয়-সুখ তাঁদের পক্ষে দুর্লভ। মহিষীগণকেও চিরদুঃখে কালযাপন করতে হয়। আপনি কেবল আমার প্রেমেই আসক্ত থাকবেন এই আমার প্রার্থনা।

জেম্রোদী তখন গোপনে দোকান থেকে রাজপুত্রের উপযুক্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ আনিয়ে স্বহস্তে আমাকে সাজিয়ে দিল। তারপর সে আমাকে বলল—দেখুন, কাজী আমাদের অপমানের চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু খোদার কৃপায় তার সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। আপনি আর কারও কাছে নিজের পরিচয় দেবেন না। আমি কাজীর শঠতার প্রতিফল দেবো। আমি এখনি পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ঐ উদ্দেশ্যে একবার বাইরে যেতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

আমি বললাম—প্রিয়ে! আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

জেম্রোদী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কাজীর উদ্দেশ্যে গমন করল। কাজী অপরিচিতা রমণী সাক্ষাৎ প্রার্থিনী শুনে ভৃত্যকে তার পরিচয় জানতে আদেশ দিলেন। ভৃত্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই জোম্রেদী

বলল—আমি বণিক-কন্যা। বিচারপতির সঙ্গে নির্জনে দেখা করতে চাই। ভৃত্য কাজীকে একথা বললে কাজী রমণীকে নিয়ে একটি নির্জন-গৃহে গেলেন। গৃহে প্রবেশ করেই রমণী মুখের আবরণ খুলে ফেলল।

কাজী বললেন—সুন্দরী! তুমি কি জন্য আমার কাছে এসেছ। জেত্রোদী বলল জনাব! পিতা আমার বিবাহ দিতে অত্যন্ত উদাসীন! আমার বিবাহ হয়, তিনি তা চান না। কেউ বিবাহের প্রস্তাব তুললেই বলেন, আমি নাকি পাগলিনী! কাজেই আমাকে অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করতে হচ্ছে। আমার পিতা এখন উপস্থিত না থাকায় সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কোন ব্যবস্থা না করলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

একথা শুনে কাজী বললেন—ছি, ছি, অমন কথা মুখে এনো না। ইচ্ছা করলে আজ হতে আমার গৃহে তুমি থাকতে পার। তোমার পিতার অনুমতি নিয়ে আমি তোমাকে বিবাহ করব। ভাল কথা, তোমার পিতার নাম কি শুনি?

জেত্রোদী বলল—আউস্তাওমার আমার পিতার নাম। রাজপুরীর নিকট তালগাছের কাছে আমাদের বাড়ী।

কাজী বললেন—তাহলে তুমি এখন বাড়ী যাও। যত শীঘ্র সম্ভব আমি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

বাড়ী ফিরে এসে জেত্রোদী আমাকে বলল—আশা আমার ফলবতী হয়েছে। আমি যে চাল চেলে এসেছি, কাজী তার ফল ভোগ করবে।

সে লোকসমাজে যেমন আমার বাবাকে অপদস্ত করবার চেষ্টা করেছিল, এখন নিজেই সবার কাছে হাস্যস্পদ হবে।

ওদিকে জেম্রোদী চলে এলে কাজী ভৃত্য দ্বারা আউস্তাওমারকে ডেকে পাঠালেন।

আউস্তাওমার এলে তিনি বললেন—জনাব, আপনার একটি কন্যা আছে শুনলাম, তা কি সত্য? আউস্তাওমার বলল—হ্যাঁ সত্য। একটি অবিবাহিতা কন্যা আমার আছে। তার বয়স প্রায় তিরিশ বৎসর। দেখতে কুরূপা, ব্যধিগ্রস্তা ও উন্মাদিনী। এ কারণে তাকে লোকালয়ে বের করি না।

কাজী একটু হেসে বললেন—তাকে যে আপনি কুরূপা ও উন্মাদিনী বলে নিন্দা করবেন তা আমি জানি। যা হোক্, সে কন্যা যে রকমই হউক না কেন, আমি শপথ করে বলছি—আমি তাকে বিবাহ করতে রাজী আছি।

আউস্তাওমার একথা শুনে কাজীর দিকে চেয়ে বলল—হুজুর! আপনি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন?

কাজী বললেন—জনাব, আমি ঠিকই বলছি, আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আপনার কন্যাকে অর্পণ করে আমার আশা পূর্ণ করুন।

আউস্তাওমার আল্লার নামে শপথ করে বলল—হুজুর! সত্যিই আমার কন্যা কুৎসিতা ও ব্যাধিগ্রস্তা। আপনার যোগ্যা নয়।

কাজী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আপনার কন্যা যেমনই হ'ক না কেন

আমি তাকে বিবাহ করতে চাই। কোন আপত্তি শুনতে চাই না।

আউস্তাওমার বলল—জনাব! আপনার আদেশ পালনে রাজী আছি, কিন্তু কন্যার জন্য হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। নতুবা আপনার অভিলাষ পূরণে আমি সমর্থ হব না।

কাজী বললেন—এ সামান্য কথা। এই নিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা, বলে আউস্তাওমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। আউস্তাওমার ঐ মুদ্রা নিয়ে সন্ধ্যায় কাজীকে তাঁর আলয়ে যেতে বললেন।

পূর্বে বোগ্‌দাদ নগরের এক রূপবতী বণিক-কন্যাকে কাজী বিবাহ করেছিলেন। এতদিন তারই প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে বসবাস করছিলেন। কাজীর পুনর্বিবাহের কথা শুনে ঐ রমণী ক্রোধাবিহ্বলা হয়ে অন্তঃপুর থেকে এসে কাজীকে বললেন—ভণ্ড! এই তোমার ভালবাসা? তুমি নিজেই না বলতে, এক খাপে যেমন দু'খানা তলোয়ার রাখ যায় না, তেমনি এক পুরুষের কাছে দুই স্ত্রী থাকতে পারে না। সেই তুমি কিনা, স্ত্রী থাকতেও আবার এক স্ত্রী আনতে চলেছ! কাজেই আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমার বিবাহের পিতৃদত্ত যৌতুকগুলি তুমি ফেরৎ দাও আমাকে। আমি এখনি তোমাকে পরিত্যাগ করতে চাই।

কাজী বললেন—ভাল কথা, কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করা যায় আমিও তা ভাবছিলাম। তুমি নিজেই যখন বললে—ভালই হল, আমি এখনি তোমার কথামত কাজ করছি।

এর পর সিন্দূক হতে পঞ্চাশ হাজর স্বর্ণমুদ্রা বের করে রমণীকে দিয়ে

কাজী ত্যাজ্যপত্র লিখে দিলেন। রমণী দুঃখিতা হয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন।

কাজী তখন ভাবি পত্নীর জন্য গৃহসজ্জিত করালেন এবং নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সন্ধ্যায় আউস্তাওমারের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

আওস্তাওমার কাজীকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেল এবং শুভলগ্নে কন্যাদান করল।

কাজী বাসর-ঘরে গিয়ে নব-পরিণীতা স্ত্রীর মুখের কাপড় খুলতে অবাক্ হলেন। তার দেহ মাত্র দু'হাত দীর্ঘ, চক্ষু দু'টি কোটরগত মুখময় ক্ষত, তা হতে পূঁজ নির্গত হচ্ছে, নাক নেই বললেই চলে। এ হেন কদাকার রূপ দেখে তিনি ভিত হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

তখন আউস্তাওমার উপস্থিত হলে ক্রোধ ভরে তাকে বললেন, দুরাত্মা আমার সঙ্গে পরিহাস করতে তোর একটুও ভয় হল না? তোর যদি জীবনের কিছুমাত্র মমতা থাকে তবে শীঘ্র তোর সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে আয়।

আউস্তাওমার ভীত হয়ে বলল—হুজুর! শান্ত হন, আমার এ ভিন্ন অন্য কন্যা নেই। আমি পূর্বেই শপথ করে বলেছি, আমার কন্যা আপনার যোগ্যা নহে। আপনি বিশ্বাস করেননি বৃথা আপনি আমাকে অনুযোগ করেছেন। আমার কোন অপরাধ নেই।

কাজী তখন শান্ত হয়ে বললেন—সম্প্রতি একটি যুবতী আমার কাছে এসে তোমার কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে বললে—পিতা কিছুতেই

আমাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নন। লোকের কাছে আমি রুগ্না ও পাগলিনী বলে প্রকাশ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমার বিবাহের ব্যবস্থা করুন······

আউস্তাওমার বলল—বুঝেছি; আপনি প্রতারিত হয়েছেন। সেই রমণী আপনাকে ছলনা করেছে।

একটু চিন্তা করে কাজী বললেন—আমি উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছি। যে হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দিয়েছি, তা ফেরৎ চাই না। কিন্তু আমার সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখতে হলে কাহারও নিকট এ কথা যেন বল না। কাজী এরপর মনের দুঃখে নিজগৃহে গমন করলেন। তিনি তখন বিষন্ন মনে ভাবতে লাগলেন, আমার এদিক-ওদিক সবই গেল। এখন আমার যোগ্য শাস্তি হয়েছে।

কিন্তু এ কথা অনেক দিন গোপন রইল না। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

কাজী তখন সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হলেন।

কিন্তু মোয়াফেকের প্রতি ঈর্ষা তাঁর সমভাবেই রইল। আমি মোয়াফেকের কথায় বোগ্‌দাধিপতির সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলাম এবং কাজীর ব্যবহার তাঁর নিকট সমস্ত বললাম। তিনি এসব শুনে বললেন—যুবরাজ! এ নগরে এসেই আমার নিকট আসা উচিৎ ছিল। তোমার পিতা আমার বন্ধু। সেই সময়ে আমার কাছে এলে আমি আরও আনন্দিত হতাম। এই বলে তিনি আমাকে একটি হীরার আংটী-ও একখানি তলোয়ার উপহার দিলেন।

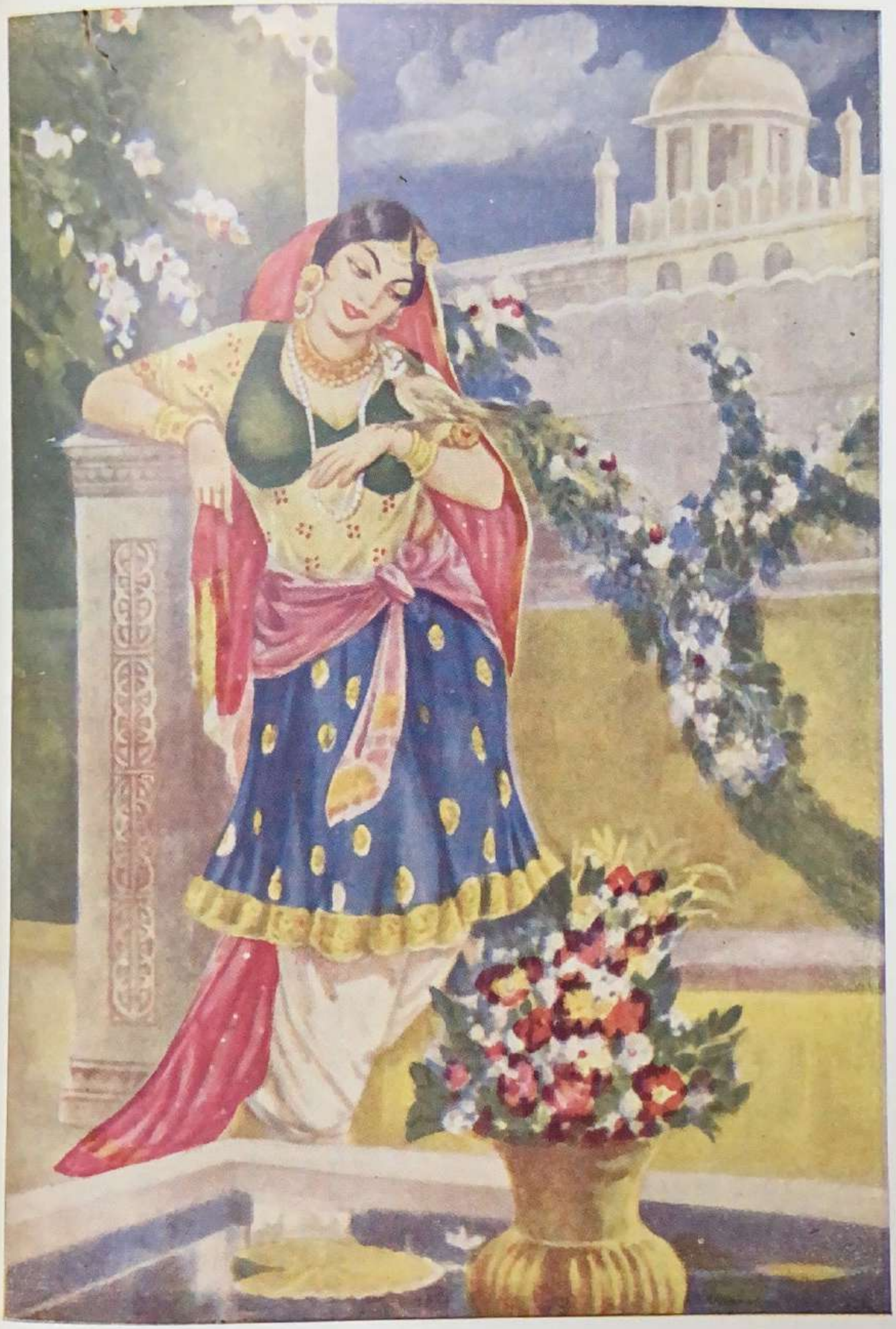

আমি উড়ে গিয়ে তার হাতে বসলাম।

পরে বোগ্দাদাধিপতি বোগ্দাদের শাসক পদে মোয়াফেককে নিযুক্ত করলেন এবং কাজীকে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করে তাঁর বিবাহিতা পত্নী—আউস্তাওমারের কন্যাকে তার কাছে রেখে দিলেন।

কিছুদিন পর দেশে যাবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হল। আমি পিতার কাছে দুত পাঠালাম। কিন্তু সে দুত ফিরে এসে বলল—যুবরাজ! পথে আপনি দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন জ্ঞাত হয়ে আপনার পিতা বহু সৈন্য নিয়ে দস্যুদের আক্রমণ করে সকলকে নিধন করেন। তথায় আপনাকে না পেয়ে দস্যুগণ আপনাকে বধ করেছে এই ধারণায় শোক-সম্বরণ করতে না পেরে অচিরেই তিনি দেহত্যাগ করেন!

তাঁর মৃত্যুর পর আপনার চাচার ছেলে আমেদউদ্দিন সিংহাসনে বসে প্রজা পালন করছেন। এই বলে আমেদউদ্দিন প্রদত্ত একখানি পত্র আমাকে দিল। আমি পড়ে দেখলাম, পিতৃরাজ্য গ্রহণ করবার জন্য সেই পত্রে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

এ সংবাদ পেয়ে পিতৃশোকে যেমন কাতর হলাম, পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আহ্বানে তেমনি আনন্দও পেলাম। অতঃপর সব বৃত্তান্ত নিবেদন করে নৃপতির কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম। আপত্তি না করে রাজা আমার সঙ্গে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিলেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর নিকট বিদায় নিয়ে তথা হইতে সস্ত্রীক স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলাম।

কিছুদিন পর দেশে উপনীত হলাম। প্রজাগণ আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হল। এক সপ্তাহ ধরে আনন্দ-উৎসব চলল।

রাজ-সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলাম। আমেদউদ্দিনকে উজীরের পদে নিযুক্ত করলাম। প্রিয়তমার সন্তোষ-বিধানের জন্য জর্জিয়াদেশের পঞ্চাশজন সুগায়িকা যুবতীদের নিযুক্ত করলাম।

এইভাবে মহানন্দে রাজ্যশাসন করতে লাগলাম। প্রজাগণও শাসনগুণে পরমসুখে কালযাপন করতে লাগল।

এমন সময় এক ফকির এসে রাজসভায় উপস্থিত হল। আশ্চর্যজনক কথাবার্তায় সভাস্থ সকলকে সে মোহিত করল। প্রত্যহ সে রাজসভায় আসতে লাগল।

একদিন ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় বের হয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে একটি মৃগ দেখতে পেয়ে তার পিছনে পিছনে আমি ও ফকির ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম এবং মৃগটিকে লক্ষ্য করে দু'জনে বাণ নিক্ষেপ করলাম। আমার তীর লক্ষ্যের বাহিরে চলে গেল। ফকিরের তীরে মৃগ বিদ্ধ হল। তখন অশ্ব থেকে দু'জনে নেমে তথায় সৈন্যদের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

নানা আলোচনায় আমাদের সময় কাটতে লাগল। ফকির বলল—মহারাজ! বহু দেশ পর্যটন করে আমি নানা রকম বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, এমন কি মৃতব্যক্তিকেও আবার প্রাণ-সঞ্চারে ক্ষণেকের জন্য সজীব করতে পারি।

এই শুনে বিস্মিত হয়ে আমি বললাম—জনাব! এই মৃত মৃগের প্রাণদান করে আপনার সিদ্ধ-বিদ্যার পরিচয় দিন। আমার কথা শুনে

ফকির মৃগের দিকে চাইতেই মৃগটি উঠে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। কিন্তু ফকিরের দেহ মৃত অবস্থায় পতিত রইল। একটু পরে মৃগ আবার ভূতলে পতিত হল এবং ফকির পুনরায় উঠে বসল।

এই বিদ্যা শিখবার জন্য আমি ফকিরকে অনুরোধ করলাম। তিনি দয়া পরবশ হয়ে উক্ত মন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দিলেন।

পরীক্ষার্থ আমি মৃত মৃগটিকে লক্ষ্য করে মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্র সে সজীব হয়ে উঠল এবং আমার দেহ অচেতন হয়ে ভূতলে পড়ে রইল। এই দেখে আমার আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু অচিরেই আমার আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। দুরাশায় ফকির আমার দেহের এই অবস্থা দেখে মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক আমার দেহে প্রবেশ করে মৃগরূপী আমাকে বধ করতে উদ্যত হল। এ দেখে মৃগরূপী আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলাম।

এভাবে আমার জীবন রক্ষা হল। কিন্তু ঐ দুরাত্মা আমার দেহ-ধারণ করে রাজধানীতে গিয়ে আমার মতই রাজকার্যে মনোযোগ দিল। রাজঅন্তঃপুরেও সেই প্রতারক জেব্রোদীর সঙ্গে পরম সুখে কাল-যাপন করতে লাগল। তার নিজ দেহ বনমধ্যে পড়ে রইল। দুরাত্মা আমার বিনাশ-সাধন করে নিরাপদ হবার আশায় নগরে প্রচার করল—যে যত মৃগ বধ করে আনবে তাকে মাথা প্রতি দশটি স্বুবর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

রাজ-ঘোষণায় ব্যাধগণ বনে বনে ঘুরে হরিণ বধ প্রবৃত্ত হল। আমিও তাদের লক্ষ্য এড়িয়ে পালাতে লাগলাম। এই অবস্থায় একদিন একটি

মৃত বুলবুল পাখী দেখতে পেয়ে মন্ত্রবলে আমি তার দেহে প্রবেশ করে উড়তে উড়তে রাজপুরীতে এসে উপস্থিত হলাম।

অন্তঃপুরের ধারে একটি গাছে বসে গান করছি এমন সময় জেম্রোদী আমার মধুর স্বরে আকৃষ্ট হয়ে জানালা দিয়ে আমায় দেখল। আমি উড়ে গিয়ে তার হাতে বসলাম। সে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে মুখ-চুম্বন করল। তার ওষ্ঠে আমিও চঞ্চু স্পর্শ করলাম! সে আমাকে একটি সোনার খাঁচায় রেখে দিল!

আমি প্রত্যহ ভোরে মধুর স্বরে গান করতাম। সে আমাকে নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করত। অল্পদিনেই আমি তার বশীভূত হয়েছি দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না। জেম্রোদী কখনও কখনও আমাকে গৃহমধ্যে ছেড়ে দিত। তখন আমি উড়ে তার হাতে বসতাম। এরূপে আমি তার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে পড়লাম। সখীদের কাছে জেম্রোদী বলত—পাখীটি যদি মরে যায় তাহলে ওর শোকানলে আমাকেও জ্বলে মরতে হবে।

এরূপে সর্বদা পরম সুখে থাকলেও জেম্রোদীর কাছে ফকিরকে দেখলেই আমি অচেতন হয়ে পড়তাম।

জেম্রোদীর একটি কুকুরি ছিল, প্রসবকালে সে প্রাণত্যাগ করল। তখন তথায় কেহই ছিল না। মন্ত্রবলে আমি তার মৃতদেহে প্রবেশ করলাম। পাখীর মৃতদেহ খাঁচায় পড়ে রইল ঃ

একটু পরেই জেম্রোদী গৃহে এসে খাঁচার কাছে গিয়ে পাখীর মৃত দেহ দেখে হাহাকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি সখীরা কাছে এসে

জিজ্ঞেস করল, রাণী! কি জন্য আপনি এরূপ শোক করছেন ? জেব্রোদী বলল—আমার প্রিয় পাখী আমায় ছেড়ে পালিয়েছে ! হায় পাখী ! কি জন্য আমায় তুমি ছেড়ে গেলে ? আর ত তোমার সে মধুর গান শুনতে পাব না ! সখীগণ ! না জানি আল্লা কোন পাপে আমায় এ দারুণ শাস্তি দিলেন।

সখীগণ জেব্রোদীর এরূপ অবস্থা দেখে রাজ-রূপী ফকিরের নিকট গিয়ে সব বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে এলো। কপট রাজা রাণীকে সাদরে জিজ্ঞাসা করল প্রিয়ে! তুচ্ছ একটি পাখীর জন্য এত কাঁদছ কেন ? তুমি যতই কাঁদ না কেন সে আর ফিরে আসবে না। তোমায় ঐরূপ শত শত বুলবুল পাখী এনে দিচ্ছি, তুমি শোক ক'রো না।

জেব্রোদী বলল—আমার এ শোকানল নির্বাণ হবার নয়। পাখী আমার সব কথা বুঝতে পারত এবং আমি তার কাছে গেলে সে আমার হাতে বসে সুন্দর গান করে আমার মনোহরণ করত। এই বলে মৃত পাখীর দিকে চেয়ে বলল—প্রিয় পাখী! তুমি কি চিরদিনের জন্য আমায় ত্যাগ করে চলে গেলে, আর কি আসবে না ? এই বলে কাঁদতে লাগল।

গৃহের কোণে বসে বাচ্চাগুলিকে স্তনপান করাতে করাতে কুক্কুররূপী আমি ভাবলাম, জেব্রোদীর সান্তনার জন্য দুরাত্ম যদি মন্ত্র বলে পাখীর প্রাণসঞ্চারে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আমার আশা পূর্ণ হতে পারে !

জেব্রোদীর দুঃখে কাতর হয়ে দুরাত্মা ফকির বলল—প্রিয়ে ! আমি কিছুক্ষণের জন্য তোমার পাখীকে মন্ত্রবলে সজীব করে দিচ্ছি। এই বলে

শয্যায় শয়ন করে মন্ত্রবলে পাখীকে সজীব করল। তখন খাঁচার মধ্যে পাখীকে নৃত্য করতে দেখে জেম্রোদী বিস্ময়ানন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল। আমি এই অবসরে কুকুরীদেহ হতে মন্ত্রবলে নিজ-রাজদেহে প্রবেশ করে পাখীটির মাথা কেটে ফেললাম।

এই দেখে জেম্রোদী অতিশয় দুঃখিতা হয়ে বলল—মহারাজ! আপনি নির্দোষ পাখীর প্রাণবিনাশ করলেন কেন? যদি আপনার মনে এই ছিল, তবে তাকে পুনর্বার জীবন দান করলেন কেন?

শত্রুবধ করে আনন্দিত হয়ে মনে মনে বললাম—ওরে পাপি! এতদিনে তোর যোগ্য শাস্তি হলো। জেম্রোদী আমায় প্রফুল্লিত দেখে বলল—মহারাজ! পাখীর জীবন নষ্ট করে আপনি এত আনন্দিত হয়েছেন কেন আমাকে স্পষ্ট করে বলুন।

আমি তখন তাকে সমস্ত বললাম। এই আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত শুনে জেম্রোদী যেন কেমন হয়ে গেল। এতদিন দুরাত্মা ফকিরের সহবাস করেছে—এই মানসিক গ্লানিতে সে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। অবশ্যি আমিই যে প্রকৃত ফয়জুল্লা, এ প্রমাণ দিতে বিশেষ কষ্ট হল না। কারণ, ফকিরের দেহ বনমধ্যেই পড়ে ছিল। কেন যে সমস্ত মৃগ বধ করতে আদেশ দিয়েছিল সে, তার কারণও বুঝতে পারল। আমার প্রতি আর তখন জেম্রোদীর কোন সন্দেহ রইল না।

তাহলেও জেম্রোদী ঘৃণা, লজ্জা ও অতিশয় মনস্তাপে কালযাপন করতে লাগল। আমি তাকে নানাপ্রকারে সান্তনা দিয়ে বললাম—প্রিয়ে! এতে লজ্জা বা ঘৃণার কোন কারণ নাই। না জেনে কিছু করলে

পাপ হয় না বা লোক সমাজেও কলঙ্কের কোন কারণ থাকে না। ফকির যেমন ছিল, তার উপযুক্ত ফলই সে পেয়েছে। তুমি বৃথা চিন্তা করে মন খারাপ ক'রো না। কিন্তু আমার সমস্ত যত্ন বিফল হল। দিনে দিনে লজ্জা ও ঘৃণায় জেম্রোদী সুখ শান্তি হারিয়ে ফেলল। কিছুদিন পরে মৃত্যু তার সকল কষ্টের অবসান করল। মৃত্যুসময়ে আমার পা ধরে সে ক্ষমা চেয়েছিল।

শেষে প্রেয়সীকে কবরস্থ করে চাচার ছেলে আমেদউদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে আমি শ্বশুরালয়ে গেলাম। সব কথা শুনে শ্বাশুড়ী শোকাভিভূতা হলেন। সেখানেও বেশি দিন না থেকে নানা-দেশ ঘুরতে ঘুরতেই এই চাচার দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর এখানে বসবাস করছি! এবং প্রিয়তমা জেম্রোদীর বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হয়ে আজও জীবিত আছি—আমার ন্যায় পাষণ্ড পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই!

বৃদ্ধের কাছে তার জীবন কাহিনী শুনে তৈমুররাজ বললেন—জনাব! আপনি যথার্থ প্রেমিক। এরূপ প্রণয়ের কাহিনী পূর্বে আমি শুনি নাই। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন।

তৈমুর-পত্নী বললেন—জনাব! জেম্রোদীর মৃত্যুতে সব ত্যাগ করে দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ আপনি স্থাপন করেছেন।

কালেফ বলল—জনাব! আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমাদের মনও আপনার ন্যায় দৃঢ় হয়।

যুবরাজ কালেফের কাহিনী

(পরিশেষ)

বৃদ্ধের কথায় রাজা তৈমুর ও রাণী মনের বল কিছুটা ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু পরদিন একটা নিদারুণ সংবাদ শুনে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সন্ধানের জন্য সমস্ত রাজ্যমধ্যে রাজসৈন্যেরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ তখন তাঁদের তিনজনকে তিনটি অশ্ব এবং একথলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন—আপনারা শীঘ্র ঘোড়ায় চড়ে এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। অন্যথায় যে কোনও মুহূর্তে আপনারা ধরা পড়ে যেতে পারেন।

বৃদ্ধের সদয় ব্যবহারে তাঁরা অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং সেই দিনই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে সেই রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হয়ে নদী পার হয়ে পার্শ্ববর্তী একটি প্রবল পরাক্রমশালী রাজার রাজ্যে উপনীত হলেন।

সেখানে অতিকষ্টে তাঁদের দিন অতিবাহিত হতে লাগল। এইভাবে যতদিন কাটতে লাগল তৈমুররাজও ততই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন।

তৈমুররাজকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে যুবরাজ কালেফ নানা উপায়ে রাজ্যের বিবিধ কার্যাদি করে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করে দিন কাটাতে লাগলেন।

এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন নানা কার্যে বহু ঘোরাঘুরী করে কালেফ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বৃক্ষের নীচে শ্রান্তদেহে শয়ন করেছিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে পেলেন একটা বাজপাখী সেই গাছটির শাখায় উপবিষ্ট রয়েছে। পাখীটির মাথা সুন্দরভাবে বিচিত্র চিত্রাদি শোভিত। তার গলায় মূল্যবান হীরক ও বহুমূল্য ধাতুখচিত হার শোভা পাচ্ছিল ঃ দেখেই কালেফ বুঝতে পারল যে এ পাখী নিশ্চয় এখানকার রাজার। তিনি তখন কৌশলে পাখীটিকে ধরে হাতে করে রাজসকাশে চললেন।

রাজসভায় পাখীটি হাতে করে পৌঁছতেই রাজা আনন্দিত হয়ে তাঁর হাত থেকে পাখীটি নিয়ে বললেন—যুবক, তুমি আমার অতিশয় প্রিয় এই পলাতক পাখীটিকে ধরে এনে আমার যথেষ্ট আনন্দ বৃদ্ধি করেছ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে এই পাখীটিকে খুঁজে এনে দিতে পারবে, তাকে ইচ্ছামত তিনটি উপহার দিয়ে তুষ্ট করব। এখন বল তুমি কি কি জিনিষ চাও ?

যুবরাজ কালেফ বললেন—মহারাজ, আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে আমি আমার প্রার্থনা ব্যক্ত করছি। প্রথমতঃ, আমার পিতা ও মাতাকে সরাই থেকে এনে রাজপুরীতে আশ্রয় দান করবেন। দ্বিতীয়তঃ, আপনার অশ্বশালার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ঘোড়াটি আমাকে দেবেন। আর

তৃতীয়তঃ, আমাকে একটি রাজোপযোগী পোষাক ও এক থলি স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করবেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ কালেফের প্রার্থনা পূরণে সানন্দে স্বীকৃত হলেন এবং এসব করবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশে সেইদিনই রাজা তৈমুর ও রাণীকে রাজপুরীতে আনা হল। অতঃপর ঘোড়ায় চড়ে পোষাক পরিধান করে রাজপুত্র কালেফ বিদেশের দিকে যাত্রা করলেন।

এইভাবে চলতে চলতে যুবরাজ চীনরাজ্যের অন্তর্গত পিকিং রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। সেখানকার রাজার একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই কন্যার রূপ এত বেশী সুন্দর যে, বহু চিত্রকর বহুপ্রকার চেষ্টা করেও রাজকন্যার রূপ সঠিক অঙ্কন করতে পারেন নি।

কিন্তু রাজকন্যার অত্যন্ত বিদ্যার গর্ব ছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন না যে কোনও রাজপুত্র তাঁর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন, ততদিন তিনি বিবাহ করবেন না। আর যদি কোনও রাজপুত্র লোভপরবশ হয়ে এসে বিফল হয়, সেই মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হবে।

রাজকন্যার রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য বহু দেশ থেকে অসংখ্য রাজপুত্র তাঁর রূপের কথা শুনে তাঁকে পাবার আশায় তাঁর প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন এবং প্রত্যেকেই বিফল হয়ে একে একে প্রাণ দিতে থাকেন।

রাজকুমার কালেফ যেদিন ঐ রাজ্যে পা দিলেন, সেদিনও একজন

রাজকুমারের প্রাণদণ্ড হচ্ছিল। তিনি উপস্থিত হয়ে দেখলেন, পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা বহু উজীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি স্বর্ণাসনে উপবিষ্টা। একজন সুন্দর রাজপুত্রকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানে আনা হল। তারপর ঘাতকের খড়গের আঘাতে তার দেহ থেকে মুণ্ডটি বিচ্যুত হল। এই ঘটনাটি কালেফের মনে যথেষ্ট আঘাত দিল। সে প্রতিজ্ঞা করল—যেমন করেই হোক্, ওই রূপবতী রাজকন্যার গর্ব চুর্ণ করবে এবং তাহলেই এইসব রাজপুত্রদের অকালমৃত্যু বন্ধ হবে।

পরদিন যথাসময়ে রাজসভা বসলে কালেফ রাজসভায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—মহারাজ, আমি প্রশ্ন সমুদয়ের উত্তর দিয়ে রাজকন্যা লাভ করতে চাই।

মহারাজ বললেন—না না। আমাকে আর অনর্থক পাপের ভাগী করবেন না। এর আগে এতগুলি নিরীহ রাজপুত্রের মৃত্যুর কারণ হতে হয়েছে আমাকে। এজন্য মুহূর্তের জন্যও আমার মনে শান্তি নেই। আর আমার পাপ বৃদ্ধি করবেন না আপনি।

রাজার কথা শুনে কালেফ নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক্, রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনায় আরও আগ্রহান্বিত হলেন। নিমিষের জন্য রাজকন্যার মুখ দর্শন করে তিনি এত মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর ধারণা হয়েছিল, এমন সুন্দরী নারী বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

যথানিয়মে পরদিন আবার সভা আহুত হল। রাজকুমারী আজ

নতুন আর এক রাজপুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। উজীর থেকে আরম্ভ করে সকলেই কালেফকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, কিছুতেই নিবৃত্ত হলেন না।

রাজকন্যা তখন ধীরে ধীরে তিনটি প্রশ্ন ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কালেফ একে একে তিনটি প্রশ্নেরই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করলেন। সভা শুদ্ধ আনন্দের ধ্বনি উঠল। কালেফ তখন নিজ পরিচয় প্রদান করলেন। চীনরাজও কালেফের মত সুন্দর ও বিদ্বান যুবকের পরিচয় শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তখনই তাঁর সঙ্গে নিজ-কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। সারারাজ্যে আনন্দপ্রবাহ বয়ে গেল।

যুবরাজ কালেফ রাজার জামাতা হয়েই অনতিবিলম্বে পিতা ও মাতাকে তাঁর কাছে আনালেন। বহুদিন পর পুত্রমুখ দর্শন করে তাঁদের মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে উঠল। খর্নাসরাজ্যের রাজা যিনি তৈমুর ও তাঁর পত্নীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি তখন এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ চীনরাজ্যে আগমন করলেন এবং চীনরাজও সৈন্যসজ্জায় প্রবৃত্ত হলেন। অবিলম্বে প্রায় সাতলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত হল। সেই সম্মিলিত সেনাদল নিয়ে যুবরাজ কালেফ অধিনায়ক রূপে কার্জনরাজ্য আক্রমণ করলেন!

কার্জনরাজও বিপুল সৈন্য নিয়ে বাধা দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবার তিনি সফলকাম হলেন না। তাঁর সেনাদল পরাস্ত হবার পর ছত্র-ভঙ্গ হয়ে গেল। কার্জনরাজ যুদ্ধে নিহত হলেন।

তখন বিজয়ী বীর কালেফকে কার্জনের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল। এরপর তৈমুর নিজ রাজ্য উদ্ধার করেই বিশ্বাসঘাতক সার্কেসিয়ান ভূপতিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করলেন।

অতঃপর সুন্দরী স্ত্রী-সমভিব্যাহারে মনের সুখে কালেফের দিন কাটতে লাগল।

° ° °

ধাত্রী এইভাবে কালেফের কাহিনী সম্পূর্ণ ব্যক্ত করলে সখিগণ বলল—সত্যিই যুবরাজ কালেফ আদর্শ প্রেমিক ও একজন শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ সন্দেহ নেই।

একথা শুনে রাজকন্যা সখীদের ধমক দিয়ে বললেন—যুবরাজ কালেফকে তোমরা কি জন্যে আদর্শ প্রেমিক বললে? আমি ত তাকে প্রেমিক বলেই আদৌ স্বীকার করি না। রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক রাজপুত্রই অগ্রসর হয়েছিলেন। তার মধ্যে কালেফ বিদ্বান তাই সৌভাগ্যক্রমে সদুত্তর দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, এইমাত্র! এতে প্রকৃত প্রেমের কোন নিদর্শনই নেই। বরং তিনি বীর ছিলেন একথা কিছুটা সত্যি। প্রিয়ার শোকে অধীর হয়ে ফয়জুল্লা রাজ্য ত্যাগ করে পত্নীর ধ্যানেই কাল কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও যথার্থ প্রেমিক বলা চলে না। কারণ, তিনি প্রকৃত প্রেমিক হলে কিছুতেই প্রেয়সীর গভীর শোক নিয়ে জীবন ধারণে সমর্থ হতেন না।

রাজকন্যার কথা শুনে ধাত্রী বললেন—রাজকন্যা তোমার কোনও পুরুষের প্রেমই প্রেম বলে মনে হচ্ছে না। কারণ তোমার মন পুরুষের প্রতি-বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ। যা হোক্‌ তুমি যদি বল, আর একটি কাহিনী তোমাকে শোনাতে পারি।

রাজকন্যা সম্মত হলে ধাত্রী তাকে বদরুদ্দীন ভূপতি ও তার মন্ত্রীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

রাজা বদরুদ্দীন ও তাঁর উজীর

দামাস্ক দেশে বদরুদ্দীন নামে এক সর্বগুণান্বিত ভূপতি ছিলেন। আতাউলমূলক নামে তাঁর এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর কার্যকলাপ দেখে রাজা ও প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু মন্ত্রী নিজে সব সময় অত্যন্ত দুঃখে কালযাপন করতেন। তাঁর মুখে কেউ কখনও হাসির রেখামাত্রও দেখেনি।

একদিন রাজা মন্ত্রীকে হাসাবার জন্য নানা ধরণের হাস্য-কৌতুক আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুতেই মন্ত্রীর বিষণ্ণভাব দুর হল না। তখন তিনি মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—মন্ত্রী, তুমি প্রায় দশবছর আমার সংশ্রবে আছ। কিন্তু একদিনের জন্যও আমরা কেউ তোমার হাসিমুখ দেখিনি, এর কারণ কি? তুমি অতিরিক্ত চিন্তা কর তাই তোমার মস্তিস্কের অবস্থা এ রকম হয়েছে বলে মনে হয় আমার।

উজীর রাজার কথা শুনে বললেন—মহারাজ, এ জগতে সকল লোকই চিন্তাশীল—সকলেই দুঃখ ও চিন্তার দাস।

রাজা বললেন—কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার মনে কোনও গুরুতর চিন্তা সর্বদা বিরাজ করছে।

উজীর বললেন—এ কথা সত্য। আপনি যদি আমার পুরোণো কাহিনী শুনে বিচার করেন, তবেই বুঝতে পারবেন, কেন আমি দিবারাত্র মনের দুঃখে কাল কাটাই।

উজীর তখন রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁর কাছে নিজের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

আতাউল্ল মুল্ক
উজীরের কাহিনী

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, বোগদাদ নগরীতে আবদুল্লা নামে একজন ধনী বণিক বাস করতেন ; আমি তারই পুত্র। শৈশবকাল থেকে নানাধরণের পণ্ডিত ও বিদ্বান লোককে পিতা নিযুক্ত করেছিলেন আমার শিক্ষার জন্য। আমি অল্পদিনের মধ্যে সে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার চরিত্রও এমন দুর্দ্দম হয়ে উঠল যে আমি নানারূপ অসৎ লোকের সঙ্গে মিশতে লাগলাম। আমার চরিত্রে এভাবে কলঙ্ক স্পর্শ করছে দেখে পিতা আমার চরিত্র সংশোধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বাতুল মনে করে তাঁর কথায় কর্ণপাত করলাম না। নিজের ইচ্ছামত কাজ করে চললাম। এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন—নির্বোধ, এখন আমাকে তোর সুখের পথের কাটা বলে মনে করিস্ সত্য, কিন্তু শীঘ্রই এমন একদিন আসবে, যেদিন তোর ভুল বুঝতে পারবি। সেদিন তোর দুঃখের সীমা থাকবে না। আমার মৃত্যুর পর তুই প্রচুর ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হবি বটে, কিন্তু এ সমস্তই অল্পদিনের মধ্যে বিনষ্ট হবে।

তারপর তিনি একটি বৃক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন—এইভাবে তোর

সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে যখন ঘোর দুঃখে পতিত হবি, তখন তুই এই বৃক্ষের শাখায় রজ্জু-সংবদ্ধ করে তোর জীবন বিসর্জন করিস্।

কিছুদিন পরে সত্যিই পিতার মৃত্যু হল। তখন ভাণ্ডারের অফুরন্ত ঐশ্বর্য দর্শন করে আমি দু'হাতে সে সব অর্থ ব্যয় করতে লাগলাম। নানাপ্রকার কুচরিত্র ব্যক্তিরা সুযোগ বুঝে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হত। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে আমার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেল এবং আমি অত্যন্ত কষ্টে পড়লাম। এই সময় আমার বন্ধুরাও একে একে আমাকে পরিত্যাগ করল।

আমি তখন বাণিজ্যের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু অর্থ পাই কোথায় ? মনের দুঃখে পিতা যে বৃক্ষে রজ্জু বেঁধে আত্মহত্যা করতে বলেছিলেন, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। স্থির করলাম আত্মহত্যাই করব।

কিন্তু সেই বৃক্ষের উপরে উঠেই দেখতে পেলাম তার উপরে বিরাট এক গহ্বর এবং সেই গহ্বরে প্রচুর অর্থাদি সঞ্চিত আছে। এবারে পিতার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝলাম এবং মনের আনন্দে সেই অর্থাদি নিয়ে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে বিদেশের দিকে যাত্রা করলাম।

কিন্তু এতেও আমার সৌভাগ্যলাভ হল না। আমার সঙ্গী দু'জন বণিক আমাকে প্রতারণা করে আমার সর্বস্ব অপহরণ করল। আমি তখন নিঃস্ব হয়ে সেই বিদেশের পথে পথে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

একদিন আমি নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বের হয়েছি এমন সময় একজন রাজ কর্মচারীকে দেখতে পেলাম। আমার সুন্দর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি ?

আমি উত্তর দিলাম—হোসেন।

তারপর তিনি আমার কাহিনী জানতে চাইলে আতি ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। সমস্ত শুনে তিনি বললেন—রাজ-অন্তঃপুরে ভৃত্যাদি নিযুক্ত করবার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমাকে নিযুক্ত করতে পারি।

আমি সম্মতি জানালে তিনি আমাকে সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদের একটা অংশে আমায় কাজ করতে হবে। একটা উদ্যান দেখিয়ে তিনি বললেন—রাত্রে এই উদ্যানে কখনও প্রবেশ ক'রো না। সূর্যাস্তের পর ওখানে প্রবেশ করলেই রাজা তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়ে থাকেন।

কিন্তু একদিন আমি সেই উদ্যানে বসে যখন গম্ভীরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম, সেই অবসরে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করলেন। আমার চিন্তাভঙ্গ হতে চম্‌কে উঠলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কি ভয়ানক ভুল করেছি বুঝতে পেরে দ্রুত বাগান থেকে প্রস্থান করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলেই রাজা আমার প্রাণদণ্ড করবেন।

কিছুদুর এগিয়ে যেতেই একটি অতি সুন্দরী নারীমূর্তি আমার চোখে পড়ল। আমাকে দেখে সে বলল—যুবক, আর মিথ্যা চেষ্টায় কি প্রয়োজন। এখন পলায়নের পথ রুদ্ধ।

আমি কাতরভাবে বললাম—ভুল করে যা করেছি, তার জন্যে আর কি উপায় নেই? এখন বাঁচবার পথ কি?

বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে নারী বললে—যা ভবিষ্যতে হবে তার জন্যে চিন্তা করে কেউ কি বর্তমানের আনন্দ নষ্ট করে? ওসব চিন্তা পরে ক'রো। এখন আমার সঙ্গে আনন্দে কালযাপন কর।

নারীর সুন্দর মূর্তি সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার উপর ওই লোভনীয় কথা শুনে আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে যেই তার হাত ধরেছি, সেও তখনি চীৎকার করে উঠল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারজন নারী একসঙ্গে আমাদের ঘিরে ফেলল। তা দেখে আমি প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। তখন একজন নারী পূর্বোক্ত মেয়েটির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল—কেলিকারী, আর কখনও এমন কৌতুক করবি?

কেলিকারী বলল—না রাজকন্যা আর কখনও এমন কাজ করব না। তখন মেয়েগুলি আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে নানা প্রকার হাসি-তামাসা আরম্ভ করল। কেউ বলল—আহা, এই যুবকটি কি সুন্দর! কেউ বলল—একে নির্জনে পেলে নিজ-আশা তৃপ্ত করি। কেউ বা বলল—আহা, প্রভাত হলেই এর মৃত্যু হবে।

আমি এসব কথা শুনে নির্বাক ও অচেতন প্রায় হয়ে পড়লাম। যা হোক, একজন রমণী রাজকন্যাকে সম্বোধন করে বলল—কুমারী আপনি যখন সকল বিষয়েই কর্ত্রী, তখন এই হতভাগ্যের প্রতি কেমন ব্যবহার করা কর্তব্য বলুন।

রাজকন্যা বলল—ওকে বধ করা উচিত নয়। শীঘ্রই আমার রাজপ্রাসাদে দিয়ে চল। সেখানে আমি যা উপযুক্ত মনে করবো তাই হবে।

তখন রাজকন্যা ও সখীরা আমাকে রমণীর পরিচ্ছেদে সাজিয়ে একটি বিশাল অট্টালিকার সামনে নিয়ে গেল। সেই বাড়ীটির প্রতিটি চত্বর অদ্ভুত এবং হীরা, মুক্তা জহরত-খচিত। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, জীবনে এরূপ স্থানে আসবার সৌভাগ্য আর কখনও আমার হয়নি।

বহুক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে আমি অবস্থান করলাম। সেখানে কি অভূতপূর্ব আনন্দের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত রাতটি অতিবাহিত হল—তা আর কি বলব। পান, ভোজন, আনন্দ, উৎসব এক সঙ্গে চলতে লাগল। অবশেষে রাত শেষ হলে রাজকন্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলতো যুবক, আমি ও আমার সখীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তোমার মন কে হরণ করতে পেরেছে ?

আমি যদিও বললাম—রাজকন্যাই আমার মন হরণ করেছে কিন্তু বারবার যেভাবে কেলিকারীর দিকে আমি তাকাচ্ছিলাম তাতে রাজকন্যা হেসে বললেন—এটা তোমার মনের কথা নয় যুবক। আমি জানি তোমার মনের মত নারী কে ?

একথা শুনে সকলেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল! আমি তখন বললাম—আপনার কথাই সত্য রাজকন্যা। এর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, আপনার ওই সখী কেলিকারীকে। অবশেষে সেদিন রাত্রি এইভাবে আনন্দের সঙ্গে যাপন করে শেষ রাত্রে গুপ্তদ্বার দিয়ে আমাকে তারা বাইরে বের করে দিল।

এরপর আরও দিনকয়েক কেটেগেল। কিন্তু আমি আর কোনও উপায়েই রাজপুরীর দিকে যেতে পারলাম না। তবে দিবারাত্র কেলিকারীর মূর্তিই আমার হৃদয়ে বিরাজ করতে লাগল।

এমন সময় একদিন আমি একটি ভৃত্যের হাতে একখানি পত্র পেলাম—"প্রিয়তম, তুমি যার উপর এত অনুরক্ত, যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বাসনা থাকে তবে আজ রাত্রে অতি অবশ্য একবার উপবন মধ্যে আসবে। কোনও রূপ অন্যথা যেন না হয়।" ইতি—

তোমারই—

কেলিকারী

পত্রটি পাঠ করে আমার সারা হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে উঠল। ঐরূপ পত্র পেলে কার মনে না আনন্দ হয়? সেদিন রাত্রের জন্য আমি ছুটি নিয়ে সন্ধ্যার পরই ছদ্মবেশে সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি কেলিকারী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি তার পায়ে ধরে তার কাছে প্রেমভিক্ষা চাইলাম। কেলিকারী বলল—রাজকন্যাও তোমার রূপে আকৃষ্ট হয়েছেন। তুমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে।

তার কথা শুনে আমি বললাম—কেলিকারী, আমার দেহ, মন, প্রাণ সবই তোমাকে সমর্পণ করেছি। ঐশ্বর্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার হাত ধরে অরণ্যে গিয়ে কুটীর নির্মাণ করে থাকতেও প্রস্তুত।

এ কথা শুনে সে বলল—এতদিন তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি মাত্র। আমার নাম কেলিকারী নয়। আমিই রাজকন্যা জেলেখা। সেদিন যে

নারীটি রাজকন্যা-বেশে সজ্জিতা ছিল, সেই আমার সহচরী কেলিকারী। তোমার প্রেমে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমি তখন সজল-চোখে বললাম—রাজকন্যা, শত শত যুবরাজকে বঞ্চিত করে তুমি যে আমার মত একজন সাধারণ লোকের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছ, আমার পক্ষে এ যে পরম সৌভাগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

রাজকন্যা বলল—উচ্চ-নীচ জ্ঞান করা প্রণয়ের লক্ষণ নয়। তোমাকে দেখেই আমি যেমন নিজেকে সমর্পণ করেছি, তেমনি তুমিও আমাকে দেখেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ, সামান্যা একজন নারী জেনেও। তুমি যদি আমাকে রাজকন্যা জেনে প্রণয়-নিবেদন করতে তবে বুঝতাম, আমার ঐশ্বর্যের প্রতিই তোমার আকর্ষণ। কিন্তু তুমি ত ঐশ্বর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার প্রতি আকৃষ্ট হও নি।

রাজকন্যা বিদায় নেবার আগে আমার হাত ধরে বলল—এ অধীনাকে বিস্মৃত হয়ো না। শীঘ্রই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব। এই কথা বলে রাজকন্যা নিজের প্রাসাদের দিকে চলে গেল। আমিও তার কথা চিন্তা করতে করতে ফিরে এলাম। কিন্তু অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যে আমি যে দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হলাম তাতে আমার সমস্ত আশা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হয়ে গেল।

উদ্যান থেকে প্রত্যাগমন করার কিছুদিন পরে শুনলাম রাজকন্যা পীড়িতা হয়েছেন। তার দুই দিন পরে শুনলাম যে সেই পীড়াতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রথমতঃ এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু যখন কবরের সমুদয় আয়োজন দর্শন করলাম তখন আর অবিশ্বাসের

কোন কারণ রইল না। সেই দিবসের কথা মনে হলে এখনও আমার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। তখন আমি শোকাতিশয্যে নখরাঘাতে সর্ব-শরীর এরূপ ক্ষত-বিক্ষত করেছিলাম যে, রুধির-ধারায় আমার সর্বশরীর ভেসে যেতে থাকে। পর-দিবস রজনীযোগে রাজভবন থেকে বহির্গত হলাম। গন্তব্য পথের স্থিরতা নেই, সুতরাং যে দিকে পথ দেখতে পেলাম সেই দিকেই যেতে লাগলাম। এইরূপে কিছুদুর গমন করার পর রজনী অবসান হল। একে সারা রাত্রি অনিদ্রায় কেটেছে, তাতে আবার পথপর্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত। এই অবস্থায় একটি বৃক্ষমূলে আমি উপবেশন করলাম। কিছুক্ষণ পরে মলিন-বেশধারী একজন ফকীর এলো। কিন্তু আমি মৌনাবলম্বন করে রইলাম দেখে ফকীর বলল—যুবক! আকার-প্রকারে তোমাকে দয়ালু বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমার নিকট কিছুই নেই বলেই বোধহয় আমাকে ভিক্ষা-প্রদানে অসমর্থ হলে?

ফকীরের কথা শুনে আমি বললাম—তুমি ঠিকই বলেছ। আমি অত্যন্ত দরিদ্র। আমার কোনও আশ্রয় নেই। নিরাশ্রয় হয়েই আমি এখানে বসে আছি। কোথায় যাব তারও কোন স্থিরতা নেই।

আমার কথা শুনে ফকীর বলল—বেশ, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমরা ভিক্ষা করেই দিন চালাব। কোনও মতে আমাদের দিন কেটে যাবে।

এইভাবে ফকীরের সঙ্গে আমি নানা দেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম। ভিক্ষা ক'রে যা পেতাম তাতেই আমাদের দিন চলত। দীর্ঘদিন পরে আমরা কান্দাহার রাজ্যে উপস্থিত হলাম। সেখানকার রাজা ছিলেন

ফিরোজশাহ! তিনি অত্যন্ত মহানুভব ও দয়ার্দ্র হৃদয়। আমরা সেখানে উপস্থিত হবার দিনকয়েক পরই একদিন রাজ্যমধ্যে উৎসব আরম্ভ হল। আমি সেই উৎসব দর্শনের জন্য একা নানা স্থানে ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন খোজা প্রহরী এসে আমার হাতে একটি পত্র দিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেটি রাজকন্যা জেলেখার পত্র। পত্র পাঠ করে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এ কি করে সম্ভব? পত্রে জেলেখা আমাকে তার সঙ্গে একস্থানে দেখা করতে বলেছে। আমি তার কথা অনুসারে পরদিন একাকী একটি প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সামনেই সেই খোজা প্রহরীটি দাঁড়িয়েছিল। সে বলল—আপনি এই ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকন্যা জেলেখাকে দেখতে পাবেন। আমি প্রশ্ন করলাম—তিনি এদেশে এসে উপস্থিত হলেন কেমন করে? খোজা বলল—আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। একটু পরেই রাজকন্যা এসে উপস্থিত হবেন। তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবেন।

একটু পরেই রাজকন্যা জেলেখা ও সখী কেলিকারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। আমি তাঁকে দেখেই দীর্ঘদিনের বিরহজ্বালা ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে উঠে দাঁড়ালাম। তারপরে বললাম—জেলেখা, তোমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই আমি রাজধানী ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে কি করে উপস্থিত হলে? আর মৃত্যু কবলিতা হয়েও বেঁচে উঠলেই বা কেমন করে? রাজকন্যা জেলেখা তখন ধীরে ধীরে তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

রাজকন্যা জেলেখার কাহিনী

হোসেন, যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সেদিনের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। সেদিন তুমি চলে গেলে পর আমি তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি এবং আমার মনের কথা আমার সঙ্গিনীদের কাছে ব্যক্ত করি। তারা আমার কথা শুনে নানাভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। আমি তাদের বলি যে, প্রয়োজন হলে আমি তাদের পরিত্যাগ করে সামান্য রমণীর মত কালযাপন করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব।

আমার ব্যাকুলতা দেখে কেলিকারী বলল—সখি, এমন এক প্রকার বৃক্ষ আছে যার পত্র কাণের উপরিভাগে রাখলে মৃতের মত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পরে আর একপ্রকার বৃক্ষের পত্র কাণের উপরে রাখলেই পুনঃ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এ কথা শুনে বললাম—তবে আজ রাত্রে আমি সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হব। পিতা-মাতা আমাকে নিশ্চয় কবরে প্রোথিত করবেন। তোমরা তারপর কবর থেকে আমাকে তুলে এনে জীবিত করবে।

আমার এ প্রস্তাব শুনে প্রথমে কেলিকারী বলল—না-না, এত শীঘ্র এমন করা উচিত নয়। কিন্তু পরে আমার ব্যাকুলতা দেখে আর তারা স্থির থাকতে পারল না।

সেদিনই শেষ রাত্রে আমি সেই বৃক্ষের পত্র কর্ণমূলে স্থাপন করে পড়ে রইলাম। সখীদের মধ্যে একজন বাবার কাছে গিয়ে বলল —মহারাজ, রাজকন্যা অসুস্থা! এক্ষুণি রাজবৈদ্যকে আহ্বান করা হোক্।

রাজবৈদ্য এসে যথাশক্তি চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সেদিনই শেষ রাত্রে আমার মৃত্যু হল এবং পরদিনই আমার দেহ কবরস্থ করা হল।

অতঃপর কেলিকারী এবং অন্যান্য সখীরা রাত্রে কবরের কাছে গমন করে তার মধ্য থেকে আমার দেহটি বের করে আমাকে জীবিত করল। তখনই সখীদের মধ্যে একজন তোমাকে খোঁজ করতে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনল, আমার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তুমি শোকার্ত হয়ে বিদেশের দিকে যাত্রা করেছ।

তোমার সংবাদ না পেয়ে আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়লাম! অতি কষ্টে আমার দিন কাটতে লাগল। দিনের পর দিন শরীর ক্ষীণ ও অবশ হয়ে আসতে লাগল।

উপায়ান্তর না দেখে সখীরা কয়েকজন অনুচর ও কেলিকারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে বিদেশ-যাত্রা করতে বলল। এইভাবে দেশ-দেশান্তরে আমি তোমার খোঁজ করতে লাগলাম।

একদিন আমরা একজন মহাজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কান্দাহারের দিকে আসছি এমন সময় একদল দুর্দ্ধর্ষ দস্যু আমাদের আক্রমণ

করল। দস্যুরা প্রথমে মহাজনের বিনাশ সাধন করে, তারপর আমাদিগকে নিয়ে একজন দাসী-বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করল। দাসী-বিক্রেতা আমাদের বিক্রয়ার্থ কান্দাহাররাজ ফিরোজশাহের নিকটে নিয়ে এলো। আমার রূপ ও লাবণ্য দেখে ফিরোজশাহ বিমোহিত হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম—একজন বিদেশী বণিকের কন্যা আমি। নৃপতি তখন আমাদের ক্রয় করে এই প্রাসাদের মধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে রেখে দিলেন। তারপর থেকে আমরা এই প্রাসাদেই আছি।

* * *

রাজকন্যা জেলেখাকে জীবিত দেখে ও তার দর্শন পেয়ে আমার মনে যে কি পরিমাণ আনন্দ হল তা ভাষায় বর্ণনাতীত। আমি সেদিনের মত ফিরে এলাম বটে, সারারাত্র মুহূর্তের জন্যও চোখ বুঝতে পারলাম না। ক্রমে নিশা অন্তর্হিত হয়ে দিনের আগমন হল। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ প্রিয়তমার জন্য এমনভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল যে, আমি প্রতি মুহূর্তেই রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ক্রমে আবার রাত্রি নামল। আমি আবার উক্ত প্রাসাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে পূর্বের মতই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলাম ; আবার রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হল। আমি পাগলের মত তার পায়ে ধরে বললাম—এভাবে তোমার অদর্শনে একটি প্রহর যাপন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব আমি প্রতিটি মুহূর্ত তোমার সঙ্গে মিলিত হবার উদ্বেল-আশা নিয়ে কাটাই।

রাজকন্যা বলল—প্রাণেশ্বর, সব সময় তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। কেননা আমি রাজার প্রদত্ত প্রাসাদে বাস করছি। নানা কথার মধ্য দিয়ে কিভাবে যে রাত্রি গেল এবং প্রভাত এসে আমাদের সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করল তা টের পেলাম না। ভোর হতে না হতেই আমি সভয়ে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

সেদিন আমি ফিরে এলে আমার সঙ্গী সেই ফকীর বলল—সখা. তুমি দেখছি আজ রাজবেশ পরিধান করেছ। তুমি হঠাৎ কি করে এত অর্থ প্রাপ্ত হলে যে মূল্যবান বেশভূষা পরিধান করতে সমর্থ হয়েছ?

আমি তখন আমার সমস্ত কথা তাকে খুলে বললাম। আমার কথা শুনে ফকীর বলল—তুমি কি আমাকে সেই নারী-রত্নটি একবার দেখাবে? আমি এতে প্রথমে সম্মত হলাম না। কিন্তু তার বারবার কাতর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তাছাড়া সে আরও বলল যে তার ব্যবহারের মধ্যে কখনও কোনও অসৎ-ভাব প্রকাশ পাবে না। একথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হয়ে বললাম—বেশ আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে রাজভবনে গমন করবে।

সন্ধ্যা সমাগমে আমি ফকীরকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যার প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি ফকীরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একাকী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে রাজকন্যা জেলেখা উৎসুকভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল! আমি তার দিকে চেয়ে বললাম—প্রিয়ে, আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। আমি তোমাকে যে ফকীর বন্ধুর কথা বলেছিলাম;

সে বাইরে অপেক্ষা করছে। সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। এখন তোমার অনুমতি পেলেই আমি তাকে এখানে উপস্থিত করব।

রাজকুমারী বলল—হোসেন, কার মনে কি আছে বলা যায় না। অতএব তাকে এখানে প্রবেশ না করতে দেওয়াই ভাল।

কিন্তু আমি বারবার অনুরোধ করাতে রাজকন্যা আমার অনুরোধ এড়াতে না পেরে বলল—বেশ, তাকে নিয়ে এস। কিন্তু মাত্র একদিনের জন্য সে প্রবেশাধিকার পাবে।

রাজকন্যার অনুমতি পেয়ে আমি নিভৃত স্থান থেকে বন্ধুকে ডেকে এনে রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেলাম। রাজকন্যা তাকে দেখবামাত্র সাদর-সম্ভাষণে নিজের কাছে বসালেন। তারপর আহারাদি সমাপ্ত হলে আমরা নর্তকীদের গানবাজনা শুনতে লাগলাম। তারপর সুরা পরিবেশন করা হলে আমরা মনের সুখে কিঞ্চিৎ সুরাপান করলাম। কিন্তু ফকীর প্রচুর সুরাপান করে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তখন সে উন্মত্তের মত রাজকন্যার কর ধারণ করে জোর করে তার মুখ চুম্বন করল। এতে রাজকন্যা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সেই স্থান ত্যাগ করবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—হোসেন, এই ইতর লোকটিকে যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে না দেখি।

এইরূপে প্রেয়সী সেখান থেকে চলে গেলে আমি ফকীরকে বললাম—ভাই, তুমি মদোন্মত্ত হয়ে বাতুলের মত কাজ করেছ। এ কথা

শুনে ফকীর বলল—হোসেন, তুমি নারীদের মনের কথা বুঝতে পার না, তাই এমন কথা বলছ। আসলে সে মোটেই ক্রুদ্ধ হয়নি। তুমি সামনে ছিলে তাই এরূপ অভিনয় করেছে।

ফকীরের কথা শুনে সেদিন সারারাত আমার ঘুম হল না। পরদিন সকালে ফকীর বলল—ভাই, রাত্রিতে আমি মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে যা বলেছি বা যা করেছি সেই জন্য আমাকে ক্ষমা কর। এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারছি, এ সমস্তই মুহূর্তের উত্তেজনার ফল। আমি আজই এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আমি কয়েকবার তাকে এ কাজে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু সে তাতে রাজী না হয়ে তক্ষুণি প্রস্থান করল। আমি তখন অত্যন্ত বিষণ্ন মনে গৃহ মধ্যে পায়চারী করতে করতে গত রাত্রির অপ্রীতিকর ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করছি এমন সময় বাইরে কলরব শুনতে পেলাম। কিসের কলরব বুঝতে না পেরে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দেখি যমের মত রাজসেনাপতি দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—হোসেন, তোমাকে এক্ষুণি রাজসমীপে যেতে হবে। আমি বললাম—সেকি? আমি এমন কি অপরাধ করেছি তা তো বুঝতে পারছি না!

সেনাপতি বললেন—তা আমি জানি না। আমি রাজার আজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করছি। এ ছাড়া আর কিছুই অবগত নই। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে করলাম—হয়ত আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা রাজার কর্ণগোচর হয়েছে।

অনতিবিলম্বে আমি রাজসভায় নীত হলাম। রাজা আমাকে দেখতে পেয়েই গর্জে উঠে বললেন—শয়তান, তোর এতদুর সাহস ও স্পর্দ্ধা ? রাজ-অন্তঃপুরের নারীর প্রতি তোর দৃষ্টি। জেনে শুনে তুই যখন তোর মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত, তখন আমি বাধ্য হয়েই তোকে সেই দণ্ড দিচ্ছি। তোদের দু'জনকে একই সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।

আমি নৃপতির কথা শুনে বললাম—মহারাজ, আপনি আমার মৃত্যুদণ্ড দেন ক্ষতি নেই, কিন্তু জেলেখাকে রক্ষা করুন। তার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও দোষ নেই।

এমন সময় সখী কেলিকারীকে সঙ্গে নিজে জেলেখাও রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে বলল—মহারাজ, এই অধীনীরই সমস্ত দোষ। হোসেন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আপনি ওকে মুক্তি দিয়ে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

জেলেখার কথা শুনে রাজা রেগে উঠে বললেন—শয়তানী, তুই কোন্ সাহসে শত্রুর প্রাণদান করতে চাস্ ? তোদের দুইজনকেই উপযুক্ত শাস্তি আমি দিব।

এ কথা শুনে ভয় পেয়ে আমি বললাম—মহারাজ, অনর্থক রাজকন্যার প্রাণনাশ করবেন না।

রাজা আমার কাছ থেকে রাজকন্যার নাম শুনে জেলেখার দিকে চেয়ে মৃদু মধুর স্বরে বললেন—সুন্দরী, তোমার পিতার নাম কি ?

জেলেখা এ কথা শুনে আমার দিকে ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখে চেয়ে বলল—

হোসেন, তুমি কেন এই লজ্জাস্কর কথা সকলের সামনে প্রকাশ করলে? আমার মত অভাগিনীর পক্ষে অপমৃত্যুই শ্রেয়। অতঃপর সে তাঁর সমস্ত পরিচয় ও জীবনের সমস্ত ঘটনা রাজার কাছে বলল।

রাজা জেলেখার এই পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তখন রাজকন্যা বলল—মহারাজ, সঙ্কটে পড়ে সব কিছু বলতে হল। সে কথা যাক্, এখন আমার প্রাণদণ্ড দিয়ে হোসেনকে রক্ষা করুন।

ফিরোজশাহ বললেন—রাজকন্যা, তোমাদের প্রেমের কাহিনী শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তোমাদের প্রাণনাশ দুরে থাকুক, আমি তোমাদের দুজনকেই এই মুহুর্তে মুক্তি দিচ্ছি। তারপর তিনি ফকীরের দিকে চেয়ে বললেন—দুরাত্মা, বন্ধুর সৌভাগ্য দেখে তোর ঈর্ষা হয়েছিল বলে তুই যে অক্লেশে তার প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিলি তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই মুহুর্তে তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।

আমরা নরপতির সুবিচার দেখে তাঁকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে পুলকিত মনে বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু সেখানে এসে দেখলাম, পূর্বেই রাজসৈন্যরা সবকিছুই ধ্বংশ করেছে। এমন সময় মহারাজের একজন দূত এসে আমাদের বাসের জন্য একটি বাড়ী ও অজস্র স্বর্ণমুদ্রা আমাদের দান করলেন।

এইভাবে মনের সুখে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আমরা কান্দাহার দেশ ত্যাগ করে স্বদেশ বোগ্‌দাদের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌছিলে আমার পূর্বতন বন্ধুরা আমাকে জীবিত দেখে বিস্ময় প্রকাশ

করতে লাগল। তাদের কাছে শুনলাম, যে দুইটি বণিক আমাকে ছলনা করে আমার সর্বস্ব অহরণ করেছিল, তারাই ফিরে এসে আমার মৃত্যুসংবাদ রটনা করেছে। আমি তখন কাজীর কাছে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করলাম। বিচারের সময় সমস্ত কথা প্রকাশ পেল। আমি বললাম—পিতার সমস্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিয়ে আমি বাণিজ্যযাত্রা করেছিলাম। আমার অর্থাদি আমার সঙ্গী এই বণিক দু'জন অপহরণ করেছে।

কাজীর আদেশে তখনি তারা আমার সমস্ত অর্থাদি প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হল।

আমি এইরূপে শত্রুজাল হতে মুক্ত হয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে পরমসুখে কালযাপন করতে লাগলাম বটে, কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই আমার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হল। আমি একদিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরে এসে দেখি ভৃত্যাদি আহত এবং কেলিকারী নিহত তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। আমার সাধের জেলেখার কোনও খোঁজ পেলাম না। আমি উন্মাদের মত সারা বাড়ী খোঁজ করেও তাকে দেখতে পেলাম না। সেই শয়তান বণিক দু'জনেরই এই কীর্তি। তারপর আজ অবধি প্রাণাধিকা জেলেখার কোনও খোঁজ আমি পাই নি।

মনের দুঃখে কিছুদিন বাদে বিদেশযাত্রা করলাম! ইতিমধ্যে আপনার রাজ্যে এসে একটি রাজকার্যে নিযুক্ত হই। পরে আমার কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি আমাকে মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করেছেন ও আতাউলমূলক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আমি আপনার কাছেই কর্মে নিযুক্ত

আছি। কিন্তু আজ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সাধের জেলেখার দুঃখেই বিন্দুমাত্র সুখও মুহূর্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় না। প্রতি মুহূর্ত আমার হৃদয় বিরহানলে দগ্ধীভূত হচ্ছে। জানি না রাজকন্যা আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে! তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেলেও হয়ত কিছু শান্তি পেতাম। কিন্তু তারও উপায় নেই।

° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° °

এইভাবে উজীর আতাউলমুল্‌ক রাজা বদরুদ্দীনের কাছে তার সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করে অবশেষে বললেন—মহারাজ, আমার ধারণা এই পৃথিবীতে পরিপূর্ণ সুখী মানুষ কেউ নেই। প্রত্যেকের মনেই কিছু না কিছু দুঃখ রয়েছে।

রাজা এ কথা শুনে বললেন—রাজপুত্র ছয়ফলমুলুক ত সর্বদা হাসিমুখে মনের আনন্দে থাকে, তার মনে নিশ্চয়ই কোনও দুঃখ নেই।

মন্ত্রী এ কথা শুনে বললেন—হাসিমুখে থাকলেই প্রমাণ হয় না যে সে-ই সর্বতোভাবে সুখী। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই এর উপযুক্ত প্রমাণ পাবেন।

রাজকুমার ছয়ফলমুলুককে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—মহারাজ, আমি আপনার অধীনে একজন করদ রাজা। মনের সুখেই আমার দিন কাটে সত্য, তবুও আমার মনের কোণে যে ব্যথা দিবারাত্র ঘুড়ে বেড়ায় সে সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করছি। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বললে আপনি স্বীকার করবেন মন্ত্রীর কথাই সত্যি।

ছয়ফলমুলুক
রাজকুমারের কাহিনী

জনাব, আমি মিশরাধিপতি অস্‌বেন ছয়ফলের পুত্র। পিতার বৃদ্ধ অবস্থা হলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। তখন আমার বয়স ষোল বৎসর মাত্র।

একদিন আমি পিতার কোষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে বিবিধপ্রকার বহুমূল্য রত্নরাজি দেখছিলাম, এমন সময় একটি কোণের সিন্দুকের মধ্যে একটি আংটি ও একটি চিত্রপট সযত্নে রক্ষিত দেখলাম। আমি আংটিটি সযত্নে অঙ্গুলিতে ধারণ করে চিত্রটির দিকে মনোযোগ অর্পণ করেই চম্‌কে উঠলাম। এরূপ অপরূপ সুন্দরী ও লাবণ্যবতী নারী যে পৃথিবীতে কোথাও আছে তা আমার জানা ছিল না।

আমি সেই চিত্রটি নিয়ে সৈয়দ নামে আমার এক বন্ধুকে দেখিয়ে বললাম—আমি এই নারীর ছবিটি দেখবার পর মুহূর্তেই তার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু এ কে এবং সে কোথায় থাকে তা জানি না। তুমি আমার কাছে তা প্রকাশ করে বলতে পার কি ?

ছবিটি দেখে সৈয়দ বলল—আমি জানি না বটে, তবে বসোরা নগরে পদ্মনুবা নামে যে লোকটি বাস করে তার বয়স একশত সতর বৎসর ! সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই এর পরিচয় পেতে পার।

একথা শুনে আমি তক্ষুণি সেই প্রবীণ ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—ইনি হচ্ছেন কাবাল দেশের রাজকন্যা। এঁর নাম বদরুলজামান। কাবালরাজ্য সিংহল দ্বীপের নিকটে কোনও একস্থানে অবস্থিত বলে শুনেছি। এর বেশী আর কিছুই আমি জানি না।

আমি পরদিনই বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সুরাটগামী একটি জাহাজে চড়ে যাত্রা করলাম। সেখান থেকে গোয়া বন্দরে পৌঁছে একখানি নৌকা নিয়ে সিংহল দ্বীপের দিকে যাত্রা করলাম। পথে একবার ভীষণ ঝড় উঠল, কিন্তু তাতেও আমাদের নৌকা ডুবল না। তারপর একটি সুন্দর দ্বীপের কাছে আমরা পৌঁছে দিনকয়েকের জন্য বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় সেখানে নামলাম। কিন্তু সেই দ্বীপ ছিল ভয়ঙ্কর কাফ্রীদের দ্বারা অধ্যুষিত। একদল কাফ্রী এসে আমাদের জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে আমাদের রাজ-সকাশে নিয়ে গেল। রাজা একে একে আমাদের সমস্ত সঙ্গীকেই তাদের দেবতা অজগর সর্পের মুখে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু আমি আর আমার বন্ধু সৈয়দকে অজগরের মুখে নিক্ষেপ করা হল না। আমরা কাফ্রীদের মুখে শুনতে পেলাম, আমাকে দেখে নাকি কাফ্রীদের রাজকন্যা মুগ্ধ হয়েছেন।

সেইদিনই সকালে দু'জন কাফ্রী এসে আমাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল। তারা আমাকে নিয়ে যেতে যেতে বলল—নিশ্চয়ই তোমার কোনও পুণ্যফল ছিল, না হলে রাজকন্যার মত নারীরত্ন তোমার প্রতি সদয়া হবেন কেন? নানাচিন্তা করতে করতে মৌনভাবে রাজ-

গৃহে উপস্থিত হলাম।

গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম রাজকন্যা একটি মস্ত বড়ো ঘরে পশু চর্মে আচ্ছাদিত একখানি অনুচ্চ আসনে অর্ধ উপবিষ্ট ও অর্ধ শায়িত অবস্থায় রয়েছেন। মহারাজ সেই রাজকন্যার রূপের কথা কি আর বলব? সেই রূপের কথা স্মরণ করলে আজও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সমস্ত শরীর কাজলের মত কালো। চোখ ছুটি কোটর প্রবিষ্ট। কপাল যেন কৃষ্ণবর্ণের প্রাঙ্গণ। ভ্রূ-যুগলে লোমের চিহ্নমাত্র নেই। স্থূল ওষ্ঠাধরদ্বয় সম্মুখে ঝুলে পড়ে, মুখের কদর্যতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কেশগুলি একে কুটিল ও কদর্য, তার উপরে জীবনে তার মধ্যে চিরুণী প্রবেশ না করাতে তার চেহারা আরও বিশ্রী। গলায় নানাবর্ণের মালা শ্রেণীবদ্ধভাবে দোত্বল্যমান। এরূপ বিষসদৃশ আকৃতি দর্শন করলে কার না মনে ভয়ের উদ্রেক হয়? বদরুল-জামানের মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী যার হৃদয়ে দিবারাত্র বিরাজ করছে তার কি কখনও এই বিশ্রী একটি নারীর সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব?

রাজকন্যা আমার হাত ধরে আমাকে জোর করে তার পাশে বসিয়ে বলল—এ রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তিই আমার রূপে মুগ্ধ তবুও আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধা। এ মন-প্রাণ তোমাকেই সমর্পণ করেছি। মুহূর্তের জন্য আর কোনও পুরুষ আমার মনে স্থান পাবে না। অতএব তোমার জীবনের জন্য আর চিন্তা ক'রো না। তুমি নিঃশংসয়ে মনের আনন্দে আমার সহবাসে কাল কাটাও। আর আমার প্রিয় সহচরীর

সঙ্গে তোমার সঙ্গী সৈয়দের বিবাহ দেব।

ভয়ে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠলেও প্রাণের ভয়ে আমি কিছু বলতে পারলাম না। তক্ষুণি আমার বন্ধু সৈয়দকেও আনা হল এবং রাজকন্যার সহচরী তাকে তার পাশে বসাল। অতঃপর নানাপ্রকার খাদ্য, মাংস ও মদ্য আনীত হলো। এরূপ কাঁচা মাংস যে কেউ আহার করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কাফ্রী রাজকন্যা সেই সব খাদ্য হাসিমুখে খেতে খেতে আমাকেও খেতে অনুরোধ করল। আমি বললাম—আমার এখন ক্ষুধা নেই, পরে খাব।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাজকন্যা ও সহচরী সভার দিকে গমন করলেন। আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমি সৈয়দকে লক্ষ্য করে বললাম—এরূপ প্রেতিনীর প্রেমে বদ্ধ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়ঃ।

সৈয়দ বলল—অজগরের সাম্‌নে নিক্ষিপ্ত হতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আর এক মুহূর্তও এরূপ কদাকার রমণীদের সাম্‌নে বসে থাকতে পারব না।

সন্ধ্যার পর আবার তারা ফিরে এলো এবং খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তারা আপন আপন কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য অনেক প্রকার হাবভাব প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু সেই পিশাচিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করা আমাদের সাধ্য নয়। তাই আমরা নানারূপ কথায় তাদের ভুলিয়ে কালক্ষেপ করতে লাগলাম। কিন্তু এতে রাজকন্যা আরও ক্রুদ্ধা হয়ে বলল—পাপিষ্ঠ, আমার নবোদ্গিত যৌবন

ও অসামান্য রূপ দর্শন করেও যখন তোরা সন্তুষ্ট হলি না, তখন তার উপযুক্ত প্রতিফল পাবি।

রাজকন্যার সখী বলল—রাজকন্যা, তোমার রূপের তুলনা নেই! কি সুন্দর মুখশ্রী! কি চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠব! এর মহিমা যে বুঝতে পারল না তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

তক্ষুণি রাজকন্যা দু'জন অনুচরকে ডেকে বললেন—ওদের দু'জনকে প্রচুর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে। এদের দু'জনের দ্বারা দিবারাত্র জাঁতা পেষাইয়া লও। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম দিও না।

রাজকন্যার কথা শুনে অনুচর আমাদের নগরের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ওরূপ কাজে নিযুক্ত করল। দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও আমরা বিশ্রাম পেতাম না। এইরূপে পাঁছ ছ দিন কেটে গেল। একদিন মাত্র একজন কাফ্রী আমাদের পাহারায় ছিল। আমরা দু'জনে তাকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করে ফেললাম। তারপরে এক দৌড়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলাম একটি নৌকা তীরে সংলগ্ন রয়েছে। কিন্তু তাতে জনমানব কেউ নেই। তা দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তরীতে উঠে দ্রুত এগিয়ে চললাম। কিছুদূরে গিয়ে দেখি ধীবর বেশ ধারী একজন কাফ্রী আমাদের উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে। আমি বুঝতে পারলাম এটা তারই নৌকা। আমরা তার কথায় কর্ণপাত না করে দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে চললাম। ক্রমে রাত্রি নামল। সারারাত আমরা প্রচুর পরিশ্রম করে নৌকা বেয়ে চললাম। সকালে আমরা একটি

সুন্দর দ্বীপে অবতরণ করলাম। অজস্র ফলফুলে দ্বীপটি শোভিত। আমরা ফলমূল দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করে দ্বীপের ভেতরে এগিয়ে চললাম।

সুন্দর বৃক্ষরাজি নানাবর্ণের মৎস্যে পূর্ণ সরোবর ইত্যাদির দ্বারা দ্বীপটি এমন সুশোভিত যে আমরা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সৈয়দকে বললাম—ভাই, এমন চমৎকার দ্বীপে কি মানুষ থাকে না? এরূপ সুন্দর দৃশ্যাদি এই পৃথিবীর মধ্যে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমি বললাম—তাহলে আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত সাবধানে ভ্রমণ করা কর্তব্য।

দু'জনে এইরূপ স্থির করে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করলাম বটে, কিন্তু কোনখানেও মানুষ বা বন্য জন্তুর চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলাম না। ক্রমে রাত্রি আসন্ন হলে একস্থানে রাশিকৃত তৃণ ও পুষ্প পতিত রয়েছে দেখে তার উপরে শয়ন করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে এমন গভীর ঘুমে আছন্ন হয়ে পড়লাম যে ক্ষণকালের মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। তখন আমি জেগে উঠে দেখলাম আমার প্রিয় সহচর সৈয়দ নিকটে নেই। তার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বনমধ্যে ভ্রমণ করতে লাগলাম, কিন্তু তবুও তার সন্ধান পেলাম না। তখন আমি মনে করলাম নিশ্চয়ই কোনও হিংস্র জন্তুর হাতে সে প্রাণ হারিয়েছে। তার শোকে অস্থির হয়ে পাগলের মত আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। মনে মনে স্থির করলাম, যদি সৈয়দের দেখা না পাই তবে এ পাপ প্রাণ আর রাখব না। আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম সাম্‌নে একটি অত্যন্ত মনোহর প্রাসাদ। প্রাসাদ প্রস্তর-

নির্মিত এবং তার দ্বার চন্দনকাঠের তৈরী। দ্বারের উপরে বিরাট একটি তালা ঝোলান। তালাটি এত বৃহৎ যে মনে হলো তা খোলা অসাধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তালায় আমি যেই হাত দিলাম সঙ্গে সঙ্গে সেটি ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনা পরিশ্রমে দ্বারটি খুলে গেল। তা দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখলাম একটি গৃহে একটি নারী পালঙ্কের উপরে শয়ন করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। এই রূপবতী নারীকে এই সুন্দর স্থানে কে আনল তা জানবার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হল। আমি তার নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই সে বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারলাম না। তখন মনে মনে স্থির করলাম, আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যাই, পরে ঘুম ভেঙে গেলে এসে সমস্ত বিষয় অবগত হতে পারব।

আমি মনে মনে এইরূপ স্থির করে বনের মধ্যে এসে দেখি দলে দলে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করছে। আমি তা দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা আমার কোনও অনিষ্ট ত করলই না, আমাকে দেখেই তারা বনের মধ্যে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি এ সব দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম। তারপর কিছু বন্য ফলমূল আহার করে আবার প্রাসাদে এলাম।

তারপর আবার সেই নারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখি যে পূর্বের মত নিদ্রানিমগ্না। আমি আর কালবিলম্ব না করে নানাভাবে তার নিদ্রা-

ভঙ্গের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই তার নিদ্রাভঙ্গ হোল না দেখে তার শয্যার পার্শ্বে বসে তার হাত ধরে নাড়া দিলাম। কিন্তু তাতেও যখন ঘুম ভাঙল না, তখন বুঝতে পারলাম এ নিশ্চয়ই মায়ানিদ্রা। এমন সময় ঘুমন্ত নারীটির পাশে শয্যার উপরে একটি হরিৎবর্ণের প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেলাম। তা দেখে যেমন আমি প্রস্তরটি স্পর্শ করেছি, অমনি নারী চৈতন্য লাভ করে আমার দিকে চেয়ে বলল —আপনি কি দেব না দানব? হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ, এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করা ত সাধারণ মানুষের কাজ নয়!

আমি বললাম—সুন্দরী, আমি দেব বা দানব কিছুই নই—সামান্য একজন মানুষ মাত্র। এখানে আসতেও আমাকে কোন ক্লেশই পেতে হয়নি। যেটুকু ক্লেশ পেয়েছি, তা শুধু তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করবার জন্য। যা হোক, এখন তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কৌতুহল নিবৃত্ত কর।

নারী বলল—সমুদ্রের বুকে সরন্দীপ নামে যে একটি সুন্দর দ্বীপ আছে, আমার পিতা সেই দ্বীপের অধীশ্বর। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা। এইজন্য পিতা আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন এবং ক্ষণকালের জন্যও চোখের আড়াল করতেন না। একদিন আমি বস্ত্র পরিবর্তন করে একজন সখীর সঙ্গে স্নানাগারের দিকে গমন করছি, এমন সময় আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে দেখছি এমন সময় একটি বৃহৎ পক্ষী এসে তার চঞ্চু দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আকাশ দিয়ে উড়ে চলল। তারপর দেখতে দেখতে সে এই

প্রাসাদের মধ্যে আমাকে অবতরণ করিয়ে দৈত্যরূপ ধারণ করল। সে বলল—সুন্দরী, আমি দৈত্যদের রাজা, সুতরাং স্বেচ্ছায় আমরা নানা-প্রকার রূপ ধারণ করতে পারি। সেজন্য তুমি মোটে ভয় পেও না। আমি আজ ভ্রমণ করতে করতে তোমার অনিন্দ্য-রূপরাশি দেখে মোহিত হয়ে তোমাকে তুলে এনেছি। আজ থেকে আমি তোমার চরণের দাস হলাম, এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

আমি বললাম—দৈত্যরাজ, তোমার এ আশা দুরাশামাত্র। দৈত্য আর মানবের মধ্যে কখনই প্রণয় সম্ভবপর নয়। অতএব আমি প্রাণ থাকতে তোমার কথায় সম্মত হতে পারব না। যদি সবলে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ আত্ম-জীবন পরিত্যাগ করে নিজ সতীত্ব রক্ষা করব।

দৈত্য হেসে বলল—সুন্দরী, সময়ে হয় না এমন কাজই নেই। যা এক সময় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়, কালক্রমে তাই সম্ভবপর হয়ে থাকে। কালক্রমে তোমার মানসিক ভাবেরও যে পরিবর্তন হবে তাতে আর সন্দেহ কি? যাহোক্, আমি এখন স্থানান্তরে গমন করছি তুমি নিঃসঙ্কচিত্তে এখানে বসে থাক। এ বলে দৈত্য পুরী থেকে বের হয়ে গেল এবং পরে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার এনে আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করল।

কিন্তু আমি তাতেও প্রসন্ন হলাম না দেখে সে আমাকে মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রেখে চলে গেল। এ স্থান মানুষের অগম্য। তাই নিশ্চিন্তে সে আপন কাজে যায়। মাঝে মাঝে এসে আমাকে জাগিয়ে

আমার ইচ্ছা কি তা জিজ্ঞাসা করে। আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হই না দেখে সে আবার পূর্বের মতই মায়ানিদ্রায় আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখে চলে যায়।

রাজকন্যা আমার পাশে বসে এইসব কথা বলছেন, এমন সময় পুরী ভীষণ গর্জনে কেঁপে উঠল। তা শুনে ভীতভাবে রাজকন্যা বলল—রাজকুমার, সর্বনাশ, দৈত্য উপস্থিত। দৈত্যরাজ স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছে। পুরী-দ্বার উন্মুক্ত দেখে নিশ্চয়ই সে ক্রুদ্ধ হয়েছে, তাই এরূপ গর্জন করে উঠল।

আমি রাজকন্যার পালঙ্কে বসে কি করা যায় চিন্তা করছি, সেই সময় সাক্ষাৎ যমদুতের মত ভীষণ শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে দৈত্য প্রবেশ করল। আমি ভীত হয়ে তখন প্রতি মূহুর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম! কিন্তু খোদার মহিমা বোঝা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। আমার হাতের আংটিটির দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সেই ভীষণ মূর্তি তিরোহিত হল। তখন সে অতি নম্রভাবে বলল—যুবরাজ, আমি আপনার আজ্ঞাকারী দাস। অতএব আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন। আমি তার এই অভাবনীয় রূপান্তর দর্শনে এবং অত্যাশ্চর্য বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হয়ে নানা প্রকার চিন্তা করছি, এমন সময় সেই দৈত্য আমার মানসিক ভাব বুঝতে পেরে বলল—জনাব, আপনার অঙ্গুলিতে সোলেমানের নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরি রয়েছে ওর এমনি প্রভাব যে, যে উহা অঙ্গুলিতে ধারণ করে তার মহাবিপদ ও মৃত্যু ভয় থাকে না। সে মহাঝড়ের সময় সমুদ্রের ভয়ানক

তরঙ্গে পতিত হলেও জলমগ্ন হয় না। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ সর্বদা তাকে ভয় করে এবং আমার ন্যায় দুর্দান্ত দৈত্যগণ পর্যন্তও ঐ অঙ্গুরীয়কের আজ্ঞাকারী হয় এবং ওটি হস্তে থাকলে এই ভূমণ্ডলে যতপ্রকার যাদুশক্তি আছে তার কিছু মাত্র বল থাকে না। দৈত্যের এই সমস্ত কথা শ্রবণে আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তবে কি আমি অঙ্গুরীয়কের মাহাত্মে অকুল জলধিতে নিমগ্ন হই নাই? দৈত্য তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করলে আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—দৈত্য, তুমি কি বলতে পার আমার প্রিয় বন্ধু সৈয়দের কি দশা ঘটেছে? সে কি এখন জীবিত আছে?

দৈত্য কৃতাঞ্জলি-পুটে বলল—আমরা ত্রিকালজ্ঞ, অতএব কিছুই আমাদের অজ্ঞাত নয়। রাত্রে যখন তিনি আপনার কাছে শয়ন করেছিলেন তখন একটি ব্যাঘ্র তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।

প্রিয় বন্ধুর এই ধরণের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তারপর কিছু ধৈর্য অবলম্বন করে দৈত্যকে কাবালরাজা ও তার কন্যা বদরুলজামানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

দৈত্য বলল—তিনি সোলেমান রাজার আমলে সিংহলে রাজত্ব করতেন। বদরুলজামান নামে তার এক কন্যা ছিল রাজা সোলেমানের পত্নী। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই।

এ কথা শুনে আমি যে কি পরিমাণ দুঃখ পেলাম তা বর্ণনাতীত। কিছুক্ষণ পর শোক সংবরণ করে দৈত্যকে বললাম—আমাকে আর রাজকন্যাকে রাজকন্যার পিতার রাজ্য সরন্দীপে রেখে এসো। আমার কথা

শুনে দৈত্য আমাদেয় সরন্দীপে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল। তারপর হাত জোর করে বলল—প্রভু আদেশ করুন আমাকে আর কি কি কাজ করতে হবে।

আমি তাকে বিদায় দিয়ে বললাম—যখন তোমাকে ডাকব তখনই আমার কাছে আসবে। দৈত্য সম্মতি জানিয়ে প্রস্থান করল।

আমি রাজকন্যাকে একটি সরাইয়ে রেখে পরদিনই রাজার সঙ্গে দেখা করলাম। রাজা কন্যার শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমি যখন বললাম যে পরদিনই তিনি তাঁর কন্যাকে দেখতে পাবেন তখন তিনি আনন্দিত মনে পরদিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

পরদিন আমি রাজকন্যাকে নিয়ে রাজার কাছে গেলাম এবং সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললাম। সমস্ত শুনে রাজা বললেন—আমি যে কি পরিমাণে আনন্দিত হয়েছি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার ইচ্ছা—আমার একমাত্র কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয় এবং তুমিই এই রাজ্যের অধীশ্বর হও।

আমি তখন রাজাকে বললাম—আমি যে নারীকে প্রথম জীবনে ভালবেসেছিলাম, পরে শুনলাম সে আর জীবিত নেই। তাই তার মূর্তি দিনরাত আমার মনকে পীড়িত করবে। আমি মনে করি না যে, রাজকন্যা অথবা আপনি এসব কথা জেনে অতঃপর আমার সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হবেন। অতএব আমাকে বিদায় দিন আমি নিজ রাজ্যে ফিরে যাব।

রাজা তখন আমার কাহিনী শুনতে চাইলেন, তাই তাঁর কাছে

সমস্ত কাহিনী খুলে বললাম। সমস্ত শুনে তিনি পরদিনই প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃ-রাজ্যে ফিরে এসে শুনতে পেলাম আমার পিতা স্বর্গে গমন করেছেন। আমি তখন সব ঘটনা বড় ভাইকে খুলে বলে আংটি আর ছবি তাকে ফেরত দিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর ভাই আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে আমি তাঁকে সরিয়ে সিংহাসনে বসবার লোভেই রাজ্যে ফিরে এসেছি।

আমি তখন নিজ-রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালাম। তারপর আজ অবধি আপনার অধিনে করদ-রাজ্যরূপে আমি বাস করছি! কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই চিত্র-পটের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি।

এইভাবে ছয়ফলমুলুক রাজপুত্র তার কাহিনী শেষ করলেন।

° ° ° ° ° ° ° ° °

ছয়ফলমুলুক রাজপুত্রের কাহিনী শেষ হলে রাজা উজীরকে বললেন —যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে, তবুও আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। আমার রাজ্যমধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে হাসিমুখে সব সময় দিন কাটায়?

রাজ্যমধ্যে খোঁজ চলতে লাগল। অনেক খোঁজ করে মালেক নামক এক তন্তুবায়কে রাজার অনুচরেরা রাজার সামনে এনে উপস্থিত করল।

মালেক তন্তুবায়ের দিকে চেয়ে রাজা বদরুদ্দীন বললেন—মালেক, তুমি কি দিনরাত্রি হাসিমুখে অতিবাহিত কর ?

হাসিমুখে তন্তুবায় বলল—হ্যাঁ। আমার মুখে কখনও দুঃখের ছায়া পড়ে না। আপনার রাজ্যে আমি পরম সুখেই বাস করছি।

রাজা বদরুদ্দীন প্রশ্ন করলেন—তোমার মনে কি বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই ?

এ কথা শুনে জোড়হাতে মালেক বলল—না মহারাজ, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। সেরিণী নামে এক রাজকন্যা দিবারাত্র আমার হৃদয় অধিকার করে বসে আছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আর তাকে পাওয়া আমার অসাধ্য। তাই আমি চব্বিশ ঘণ্টাই মনে মনে দুঃখ অনুভব করি। আমার হাসি শুধু বাইরের একটা আবরণ মাত্র।

রাজার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে মালেক তখন তার জীবনের সেই প্রাচীন কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।

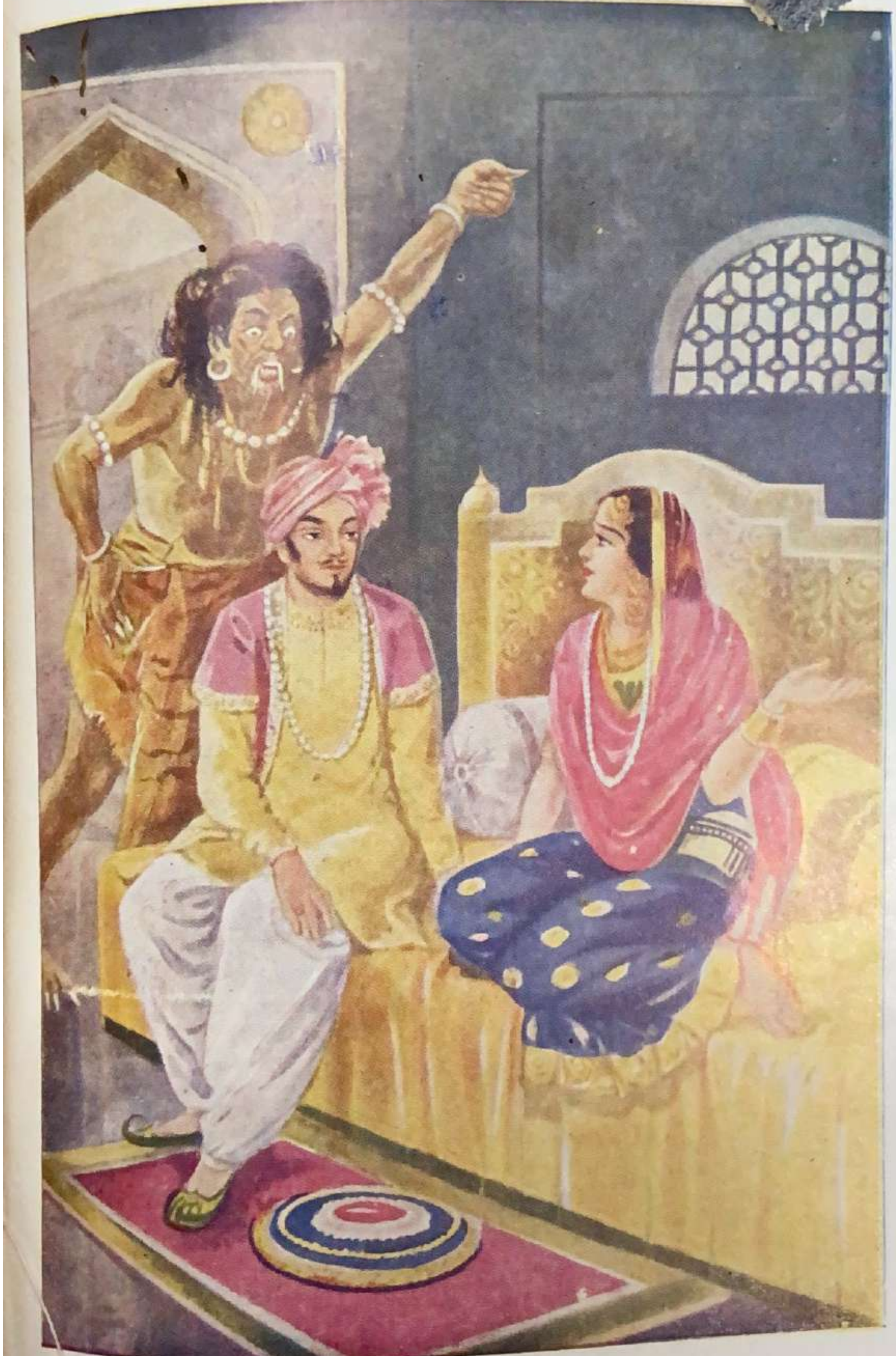

যমদূতের মত ভীষণ শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে ...

মালেক তন্তুবায় ও সৌরিণী রাজকন্যার কাহিনী

মহারাজ, সুরাটনগরে যে একজন ধনী রত্নবণিক বাস করতেন, আমি তাঁরই একমাত্র পুত্র। পিতা পরলোক গমন করলে আমি তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলাম বটে, কিন্তু আপন সংসর্গদোষে অল্পদিনের মধ্যেই অধিকাংশই অপব্যবহার করে ফেললাম। তারপর আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার বাড়ীতে একজন ভ্রমণকারীর আগমন হল। একদিন আমি সেই ভ্রমণকারী ও আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প করছি, এমন সময় দেশভ্রমণের কথা উঠল। আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিদেশ ভ্রমণ করেছেন তারা একে একে তাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। অবশেষে ভ্রমণকারী নিজে তাঁর সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করে আমাদের অশেষ আনন্দ দিলেন।

তাঁদের সেই সব কাহিনী শুনে আমি বললাম—ভাই, ভ্রমণে যে এত সুখ আছে তা আমি সত্যিই জানতাম না। কিন্তু তাতে দস্যুভয় না থাকলে আমি এই মুহূর্তেই সুরাটনগর ত্যাগ করে বিদেশের দিকে যাত্রা করতাম।

আমার মুখে এই কথা শুনে বন্ধুরা সব হো হো করে হেসে উঠল। তা দেখে ভ্রমণকারী বললেন—প্রিয় বন্ধু, তোমার যদি সত্যিই দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা হয়ে থাক, তবে আমি এমন উপায় করে দেব যে তাতে

তোমার বিন্দুমাত্রও দস্যুভয় থাকবে না।

এ কথায় আমার বিশ্বাস জন্মাল না। মনে মনে ভাবলাম বুঝি ভ্রমণকারী আমার সঙ্গে পরিহাস করছে। কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে এই কথা বলে যাবার সময়—কাল আবার আসব বলে চলে গেলেন।

ভ্রমণকারী তাঁর কথা অনুসারে পরদিন সকালে আবার উপস্থিত হয়ে বললেন—যাতে তুমি তিনদিনের মধ্যে দেশভ্রমণে বের হতে পার, আমি তার সদুপায় করে দিচ্ছি। কিন্তু এখনই একজন সূত্রধরকে ডেকে আন ও কিছু কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে এস। সূত্রধর এলে ভ্রকণকারী তাকে বললেন—যাতে তুমি শীঘ্র এই কাষ্ঠফলকগুলির সাহায্যে একটি চার হাত দীর্ঘ, দুই হাত প্রস্থ ও দুই হাত উঁচু কাঠের সিন্দুক তৈরী করতে পার সেই ব্যবস্থা কর। তার মাঝে মাঝে বায়ু চলাচলের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র থাকবে।

সূত্রধর সিন্দুক তৈরী করতে লাগল। আর ভ্রমণকারী নিজে লৌহ-নির্মিত কতকগুলি যন্ত্র স্বয়ং তৈরী করতে লাগলেন। পরদিন সিন্দুক স্থাপন করলেন। তারপর সূত্রধরকে বিদায় দিয়ে দু'জনে সিন্দুকটি ধরাধরি করে নগরের প্রান্তে একটি বনের মধ্যে নিয়ে গেলাম।

তখন ভ্রমণকারী নিজে সিন্দুকটির মধ্যে প্রবেশ করে ডালাটি বন্ধ করে দিলেন। একটু পরেই সিন্দুকটি শোঁ শোঁ শব্দে বায়ুতরঙ্গ ভেদ করে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে সিন্দুকটি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছি, এমন সময় আবার সিন্দুকটি উড়তে উড়তে

এসে আমার সামনে নামল। এই দৃশ্য দেখে আমার মনে যে কি পরিমাণ আনন্দ হল তা বর্ণাতীত।

তারপর পথিক সেই সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—মালেক, তুমি এই অভূতপূর্ব সিন্দুকটি দেখে অবশ্যই অবাক হয়েছ। কিন্তু এতে তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই নেই। কেবল যন্ত্রবলেই এটি পরিচালিত হয়ে থাকে। তোমার যদি দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে এই সিন্দুকটিতে আরোহণ করে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। এই বলে ভ্রমণকারী সেটি আমাকে প্রদান করে, কি করে সেটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ ও অধঃ এই সব কয় দিকে চালান যায় সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝিয়ে বললেন।

তখন আমি নিজে ঐ সিন্দুকটির গুণ পরীক্ষা করবার ইচ্ছা নিয়ে তাতে আরোহণ করলাম এবং কলটি টিপলে সিন্দুকটি বায়ুবেগে উর্দ্ধে উঠতে লাগল। তখন আমি নানাদেশ, নগর ও বনজঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চললাম। তারপর ফিরে সিন্দুকটি একটি গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম এবং সেই ভ্রমণকারীকে পুরস্কার-স্বরূপ এক হাজার মুদ্রা প্রদান করলাম। তিনি স্বদেশের দিকে চলে গেলেন।

আমার দিন পূর্ববৎ কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকে আমার অবশিষ্ট অর্থ বিনষ্ট হতে বেশীদিন লাগল না। তখন আমি ঋণ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেও কাউকে এক কপর্দকও ফেরৎ দিলাম না। তা দেখে ঋণ-

দাতারা আমার নামে কাজীর কাছে নালিশ করল। আমিও তখন ভীষণ বিপদে পড়ে দিশাহারা হয়ে পড়েলাম। অবশেষে আমি অবশিষ্ট ধনরত্ন নিয়ে ও সঞ্চিত খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করে রাত্রি-যোগে ঐ সিন্দুকে আরোহণ করলাম। দেশত্যাগ করে শূন্যপথে চলতে লাগলাম।

সমস্ত রাত্রি এইভাবে চলার পর প্রভাত হল। নীচের দিকে চেয়ে দেখি কেবল পাহাড়, পর্বত আর বন। লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ল না। অগত্যা সমস্ত দিন ও সারারাত্রি সিন্দুকে করে চলতে লাগলাম। তৃতীয় দিন সকালে দেখলাম নীচে একটি সুন্দর নগর ও একটি বৃহৎ অট্টালিকা। ঐ নগরের অধীশ্বর কে তা জানবার জন্য আমি প্রথমে একটি বনের মধ্যে নামলাম। তারপর সিন্দুকটি বেশ ভাল করে লুকিয়ে রেখে আমি নগরের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিছুদুর গিয়ে দেখি একজন কৃষক ভূমি চাষ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভাই, তুমি বলতে পার, এই নগরের নাম কি এবং এটি কার অধিকৃত ?

একথা শুনে কৃষক বলল—সে কি জনাব, আপনি কি গজনী নগরের নামও শোনেননি। প্রবল পরাক্রান্ত বাহমান রাজা এই নগরীর অধীশ্বর, তাও কি আপনি জানেন না ?

আমি বললাম—ভাই, জানলে কি আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ? যাক, নগরীর কেন্দ্রস্থলে ঐ বৃহৎ বাড়ীটা কার তা কি বলতে পার ?

একথা শুনে কৃষক বলল—রাজকন্যা সেরিনী ঐ প্রাসাদে বাস করেন। এঁর যখন অতি শৈশব তখন গণকগণ নানাপ্রকার গণনা দ্বারা স্থির করেছিলেন যে, যৌবনের প্রারম্ভে দুরাচার ব্যক্তিগণ নানাবিধ কৌশল করে এঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবে। সেই ছলনা নিবারণের জন্য মহারাজ এই সাতমহলা বাড়ী নির্মাণ করে রাজকন্যাকে তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। পুরীর চারিদিকে পানিপূর্ণ পরিখা এবং প্রতি মহলের সামনে এক একটি লৌহদ্বার। শত শত দ্বারপালর সেই দ্বার রক্ষা করছে। সবচেয়ে উপরের ঘরে রাজকন্যা ও তাঁর সহচরী থাকেন।

আমি কৃষকের কথা শুনে নগরের মধ্যে গমন করে নানাপ্রকার ক্রীড়া ও কৌতুক ইত্যাদি দেখলাম। তারপর সন্ধ্যার সময় বনমধ্যে গিয়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য বের করে আহার করলাম। আহার শেষ করে নিদ্রাতিভূত হবার জন্য শয়ন করলাম বটে, কিন্তু রাজকন্যা সেরিনীর কথা চিন্তা করে মুহূর্তের জন্য দুই চক্ষু এক করতে পারলাম না। তারপর রাত্রি প্রভাত হলে আমি মনে ভাবলাম—আজ রাত্রেই আমি রাজকন্যা সেরিনীর পুরীতে যাব। যদি কোনও মতে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তবে মনের সুখে সেখানেই বাস করব।

আমি সিন্দূকে উঠে উড়তে উড়তে নির্বিঘ্নে রাজকন্যার প্রাসাদের ছাদে অবতরণ করলাম। ছাদে সিন্দুক রেখে নীচে নেমে দেখলাম দ্বার অবারিত। গৃহের মধ্যে কতকগুলি সুগন্ধিপূর্ণ প্রদীপ জ্বলছে। সেই গৃহে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী একটি নারী বহুমূল্য শয্যার উপরে

নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্না। তা দেখে আমি গৃহে প্রবেশ করে চিত্রপুত্তলীর মত একদৃষ্টে সেই অসামান্যা রূপরাশি দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আমি এমন অধৈর্য হয়ে পড়লাম যে রাজকন্যার শয্যার পাশে উপবেশন করে তার কর ধারণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজনন্দিনীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি ঘরের মধ্যে পুরুষ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে সহচরীকে আহ্বান করলেন। সহচরী পাশের ঘরেই নিদ্রামগ্না ছিল। সে ছুটে আসতে আসতে বলল—রাজকন্যা, আমাকে আহ্বান করলে কেন ?

রাজকন্যা বললেন—আমার ঘরের মধ্যে একজন অচেনা পুরুষ প্রবেশ করল কেমন করে ? নিশ্চয়ই এতে তোমার কোন কারসাজি আছে।

সহচরী বলল—রাজকন্যা, তা কি করে সম্ভব ! পুরীর চারিদিকে পানিপূর্ণ পরিখা। প্রত্যেক দ্বারে যমের মত প্রহরীরা দণ্ডায়মান। আমি কিভাবে এইসব বাধা অতিক্রম করে অচেনা পুরুষকে এখানে আনব ?

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে একটি দুষ্টবুদ্ধির উদয় হল। ভাবলাম, নিজেকে দরবেশদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশ বলে পরিচয় দিব। এই মনে করে রাজকন্যাকে সম্বোধন করে বললাম—সুন্দরী, আমাকে দেখে তুমি ভীত হয়ো না। আমি ঠক বা প্রতারক নই যে উৎকোচ দিয়ে প্রহরীদের বশীভূত করে রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করে তোমার ধর্ম নষ্ট করব। আমি সর্বশক্তি সম্পন্ন দরবেশ। তুমি রাজকন্যা হয়েও বন্দিনীর

মত কষ্টে দিন কাটাচ্ছ, তোমার এ অসাধারণ রূপ ও যৌবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে দেখে আমার মনে দুঃখের উদয় হল। তাই আমি তোমার বন্দীদশা ও দুষ্ট লোকদিগের প্রতারণা থেকে রক্ষা করবার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। অতএব তুমি ভয় দুর করে আমাকে ভক্তি কর। তাহলে তোমার সুখের অবধি থাকবে না!. তোমার পিতাও রাজাদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।

আমি যখন এই সমস্ত কথা বলতে লাগলাম তখন রাজকন্যা এবং সহচরী দু'জনে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর দু'জনে আমার পা ধরে অতি করুণস্বরে বলল—প্রভু, এ অধিনীর অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমি দু'জনকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে রাজকন্যা সেরিণীর সঙ্গে মনের সুখে রাত্রি অতিবাহিত করলাম। অতি প্রত্যুষে উঠে আবার ছাদে গিয়ে সিন্ধুকে চড়ে প্রস্থান করলাম।

তারপর বনের মধ্যে নেমে সিন্দুকটি সেইস্থানে লুকিয়ে রেখে নগরের মধ্যে গমন করলাম। এবং আটদিনের উপযুক্ত খাদ্য, পানীয়, উত্তম পোষাক ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি কিনলাম। তারপর বনের মধ্যে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও বেশভূষা করতে করতে মধ্যরাত্রি হয়ে গেল। তারপর সিন্দুকে আরোহণ করে রাজকন্যা সেরিণীর কাছে গেলাম। রাজকন্যা আমাকে দেখবামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু, আজ এত বিলম্ব কেন? আপনার বিলম্ব দেখে ভাবলাম, বুঝি আপনি আমার কথা ভুলে গেছেন।

আমি বললাম—প্রিয়ে, সে ভয় ক'রো না। আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমার কথা বিস্মৃত হই নাই।

তখন রাজকন্যা বললেন—প্রভু, আমি গুরুজনের মুখে শুনেছি যে, দরবেশ অতি বৃদ্ধ হয় ও তাঁর চিবুকে পক্ক দাড়ি থাকে। কিন্তু আপনার তা দেখছি না এর কারণ কি ?

আমি উত্তরে বললাম—প্রিয়ে, এই আমার বাস্তবিক রূপ বটে। কিন্তু বৃদ্ধ দেখলে যুবতীদের মনোরঞ্জন হয় না। তাই আমি রূপান্তর গ্রহণ করেছি। আমি ইচ্ছামত যে কোনও রূপান্তর গ্রহণ করতে পারি। এইসব কথাবার্তা শেষ করে আমি সেরিণীর সঙ্গে মনের সুখে রাত্রিযাপন করলাম।

কিছুদিন এইরূপ গমনাগমনের পর আমার প্রতি রাজকন্যা সেরিণীর বিশ্বাস এমন বদ্ধমূল হ'ল যে, সে ক্ষণকালের জন্যও আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করতে দ্বিধা করত না।

অতঃপর একদিন বাহমানরাজ পাত্র-মিত্রাদির সঙ্গে তাঁর মেয়েকে দেখতে এলেন। পুরীতে প্রবেশের সময় দ্বারের উপরে নিজের নামের মোহরটি বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললেন—দেখ মন্ত্রীগণ, যতদিন এই মোহর ঠিকমত থাকবে ততদিন সেরিণী রাজকন্যা সম্বন্ধে জ্যোতিষীদের গণনা সফল হবে না।

এই বলে রাজা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পাত্র-মিত্ররা দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজকন্যা রাজাকে প্রবেশ করতে দেখেই মা এবং অন্যান্য পরি-

আমি বললাম—প্রিয়ে, সে ভয় ক'রো না। আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমার কথা বিস্মৃত হই নাই।

তখন রাজকন্যা বললেন—প্রভু, আমি গুরুজনের মুখে শুনেছি যে, দরবেশ অতি বৃদ্ধ হয় ও তাঁর চিবুকে পক্ক দাড়ি থাকে। কিন্তু আপনার তা দেখছি না এর কারণ কি?

আমি উত্তরে বললাম—প্রিয়ে, এই আমার বাস্তবিক রূপ বটে। কিন্তু বৃদ্ধ দেখলে যুবতীদের মনোরঞ্জন হয় না। তাই আমি রূপান্তর গ্রহণ করেছি! আমি ইচ্ছামত যে কোনও রূপান্তর গ্রহণ করতে পারি। এইসব কথাবার্তা শেষ করে আমি সেরিণীর সঙ্গে মনের সুখে রাত্রিযাপন করলাম।

কিছুদিন এইরূপ গমনাগমনের পর আমার প্রতি রাজকন্যা সেরিণীর বিশ্বাস এমন বদ্ধমূল হ'ল যে, সে ক্ষণকালের জন্যও আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করতে দ্বিধা করত না।

অতঃপর একদিন বাহমানরাজ পাত্র-মিত্রাদির সঙ্গে তাঁর মেয়েকে দেখতে এলেন। পুরীতে প্রবেশের সময় দ্বারের উপরে নিজের নামের মোহরটি বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললেন—দেখ মন্ত্রীগণ, যতদিন এই মোহর ঠিকমত থাকবে ততদিন সেরিণী রাজকন্যা সম্বন্ধে জ্যোতিষীদের গণনা সফল হবে না।

এই বলে রাজা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পাত্র-মিত্ররা দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজকন্যা রাজাকে প্রবেশ করতে দেখেই মা এবং অন্যান্য পরি-

জনকের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তার ভাব ভঙ্গী কেমন যেন অপ্রতিভ বলে মনে হল। তা দেখে রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—মা, তোমাকে যে আজ এমন বিষণ্ণ দেখছি এর কারণ কি ?

রাজার এই কথা শুনে রাজকন্যা আরও লজ্জিতা হলেন। তখন রাজা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন! রাজকন্যা আর কি করেন ? তিনি তখন দরবেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন।

রাজা এসব কথা শুনে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বললেন—দুশ্চারিণী, তুই একজন বুদ্ধিমতী নারী হয়েও সামান্য একজন মানুষের দ্বারা প্রতারিত হলি ? আমি এত চেষ্টা করেও তোর সতীত্ব রক্ষা করতে পারলাম না।

এই বলে রাজা পাত্রমিত্রদের ডেকে বাড়ীর সমস্ত স্থানে খোঁজ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কোন স্থান দিয়ে যে লোকটি যাতায়াত করে তার কোনও খোঁজ পেলেন না।

রাজা তখন মন্ত্রীকে ডেকে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্রী, এখন উপায় কি বল দেখি ?

সব কথা শুনে মন্ত্রী বলল—মহারাজ, এ কথা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। দরবেশরা বিভিন্ন আকৃতিতে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে। এও তেমন কিছু হতে পারে।

মন্ত্রীর কথা শুনে সকলেই সায় দিলেন। কেবল ভগ্নপাদ নামে একজন মন্ত্রী বললেন—যারা সত্যিকার দরবেশ হয় তারা কখনও কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। নিশ্চয়ই কোন যাদুকর দরবেশ

রূপে রাজকন্যাকে বশীভূত করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য।

রাজা তখন পাত্রমিত্রদের বিদায় দিয়ে রাজকন্যা সেরিণীর বাড়ীতেই বসে রইলেন।

সমস্ত দিন রাজা ইতস্ততঃ পায়চারী করে কাটালেন। রাজকন্যাকে তিনি দরবেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন—রাজকন্যা, তুমি কি কখন দরবেশকে তোমার গৃহে আহার করাতে পেরেছ?

রাজকন্যা বললেন—না, আমি রোজ চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ সুখাদ্য সাজিয়ে রাখলেও তিনি কোন দিন তা থেকে সামান্য অংশও গ্রহণ করেন না।

এইরূপ কথোপকথন করতে করতে দিন শেষ হল। তখন রাজা দীপটি সামনে রেখে একখানি তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন—যদি তিনি দরবেশ না হয়ে কোনও সামান্য লোক হন তবে আমি এই অসির এক আঘাতে তার মস্তক ছেদন করব।

কথা শেষ হতে না হতেই জানালা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল আকাশের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন একটি উজ্জ্বল আলোক রাজকন্যার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাজা মনে করলেন সত্যই বুঝি দরবেশ আকাশ আলো করে এদিকে আসছেন।

রাজা মনে মনে যখন এমনি চিন্তা করছেন, তখন আমি সিন্দুক নিয়ে ছাদে নামলাম এবং সিন্দুকটি ছাদে রেখে সেরিণীর ঘরে প্রবেশ

করলাম। রাজা আমাকে দেখা মাত্র এমন ভীত হয়ে পরলেন যে তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে মাটিতে পরে গেল।

তখন তিনি কাঁপতে কাঁপতে আমার পা ধরে বললেন—হুজুর আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন। আমার কন্যার প্রতি যেমন কৃপা করেছেন, আমার প্রতিও যেন তেমনি চিরকাল আপনার অনুগ্রহ থাকে।

আমি সব শুনে বুঝতে পারলাম, রাজা রাজকন্যার কাছ থেকে সব কথা শুনেছেন। আমি রাজাকে ভূমি থেকে তুলে বললাম—দেখ বাহমান, তুমি আমার ভক্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অতএব তোমার কন্যার তুঃখ যাতে বিমোচন হয়, সেজন্য আমার পিতার কাছে একদিন অনুরোধ করলাম। তখন পিতা আমাকে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে একান্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখে বললেন—দেখ পুত্র, খোদা যার অদৃষ্টে যা লিখে দেন কোন প্রকারেই খণ্ডন হবার নয়। তবে তুমি যদি কৃপাবান হয়ে রাজকন্যা সেরিণীকে স্বয়ং বিবাহ কর, তবে সে প্রতারকদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে, অন্যথায় নয়। আমি পিতার কথা অনুসারে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই তোমার কন্যাকে বিবাহ করেছি।

রাজা আমার কথা শুনে আনন্দে গদ-গদ হয়ে পুনরায় ভক্তিভরে আমাকে সালাম করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—আমার কি সৌভাগ্য যে এমন দরবেশ আমার জামাতা হলেন।

আমি রাজাকে ধরে ভুমি থেকে তুললাম। তিনি তখন রাজবাড়ীর

দিকে যাত্রা করলেন। আমিও রাজকন্যা সেরিণীর সঙ্গে পরম সুখে রাত্রি যাপন করতে লাগলাম। কিন্তু তবু আমি নিঃশঙ্ক হতে পারলাম না। পাছে প্রভাত হলে কেউ সিন্দুকটি দেখে ফেলে এই ভয়ে ভোর বেলাই আবার সিন্দুকে আরোহণ করে প্রস্থান করলাম।

পরদিন সকালে রাজকর্মচারীরা গতরাত্রির তথ্য জানবার জন্য রাজ সভায় এলে রাজা প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন—দেখ মন্ত্রী তোমার কথাই ঠিক। আমার সব সন্দেহ দূর হয়েছে। তিনিই যে সত্যিকারের দরবেশ এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই। এই বলে তিনি গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বললেন! কিন্তু ভগ্নপাদ মন্ত্রী এসব কথা বিশ্বাস না করায় অন্য সকলে তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

তারপর রাজা পাত্রমিত্রদের সঙ্গে ভ্রমণে বের হলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই হঠাৎ প্রবল বাতাস বইতে লাগল। যে অশ্বটির পৃষ্ঠে ভগ্নপাদ মন্ত্রী বসেছিল সে হঠাৎ এমন লাফিয়ে উঠল যে তার পৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে তাঁর একটি হাত ও পা ভেঙ্গে গেল।

অন্যান্য মন্ত্রীগণ তা দেখে বললেন—তুমি দরবেশের যে নিন্দা করেছিলে তার ফলেই তোমাকে এই শাস্তি পেতে হল। আর কখনও এমন কথা বলবে? তারপর সকলে তাকে ধরাধরি করে নগরের মধ্যে ফিরে এলেন! তারপর তিন দিন ধরে নগরের মধ্যে মহা ধুমধাম চলতে লাগলো।

আমি নগরীর মধ্যে এই সব খবর শুনতে পেলাম। সে দিন

সচিত্র পাং [illegible] ল

রাত্রে রাজকন্যার কাছে এসে তাঁকে বললাম—মন্ত্রী ভগ্নপাদ আমার নিন্দা করেছিল তার ফল সে পেয়েছে। এখন যে কেউ আমাকে অবিশ্বাস করবে তার প্রতিফল সে পাবে।

রাজা ও মন্ত্রীরা পরদিন কন্যার কাছ থেকে এই সব কথা শুনতে পেলেন। তাঁদের বিশ্বাস এতে আরও দৃঢ় হল। আমি মনের সুখে দিনের পর দিন রাজকন্যার সহবাসে কাটাতে লাগলাম।

কিন্তু সময়ের গতিরোধ করে কার সাধ্য? দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। তখন আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আমাকে অত্যন্ত দুরাবস্থায় পড়তে হলো। অবশেষে একটি বুদ্ধি স্থির করে সেদিন রাত্রে রাজকন্যাকে বললাম—দেখ প্রিয়, বিবাহ হয়ে গেলে যৌতুক প্রদান করা একটি লৌকিক আচার। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে কোনও যৌতুকই দেননি। এতে অন্য দরবেশগণ আমাকে নানা বিদ্রূপ করছে।

রাজকন্যা বললেন—প্রভু, তার জন্যে চিন্তা কি? আমি পিতাকে বলে উপযুক্ত ধনসম্পত্তি প্রদান করাব!

আমি বললাম—প্রিয়ে, এই সামান্য বিষয়ের জন্য রাজাকে জানাবার আবশ্যকতা কি? তোমার গায়ে যে সব অলঙ্কার আছে তা থেকে দু একটি দিলেই ত কার্য সিদ্ধ হতে পারে।

আমার কথা শুনে রাজকন্যা হাসিমুখে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে দিতে চাইলেন। আমি তা দেখে হেসে বললাম—এত জিনিস নিয়ে আমি কি করব? শুধুমাত্র কিছু যৌতুক দেওয়া হয়েছে

তার চিহ্ন দেখালেই ত হল। এই বলে আমি সবচেয়ে মূল্যবান দুটি প্রস্তর গ্রহণ করলাম। মনে মনে বুঝতে পারলাম, এই দুটি প্রস্তর বিক্রী করলে আমার অন্ততঃ দু'বছর কোনও অর্থাভাব থাকবে না।

এইরূপে আরও দু'মাস কেটে গেল। রাজকন্যা আমার এত অনুরক্ত হয়ে পড়ল যে মূহুর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইত না। কিন্তু আমি তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে দিনের বেলা খাদ্যাদির জন্য বাইরে কাটাতাম ও রাত্রিতে রাজকন্যার গৃহে আসতাম।

ইতিমধ্যে কাসেম নামে একজন মহাপরাক্রান্ত রাজা রাজকন্যার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে তাঁকে বিবাহ করবার জন্য গজনী দেশে একজন দূত পাঠালেন। দূত রাজসভায় এসে বাহমান রাজার সামনে যোড়-হাতে দাঁড়িয়ে বলল—মহারাজ, সেরিণী নামে আপনার যে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, আমার প্রভু তাঁকে বিবাহ করতে চান। এই জন্যই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে রাজা বললেন—দূত, ইতিপূর্বে আমি এক কামেল দরবেশকে আমার কন্যা সম্প্রদান করেছি। তাই তোমার প্রভুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, একথা শুনে দূত কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজাকে উন্মাদ মনে করে চুপ চাপ ফিরে চলল।

তারপর কিছুদিন অতীত হলে দূত নিজের রাজ্যে ফিরে এসে কাসেম রাজার কাছে সমস্ত ব্যক্ত করল। কাসেম ভূপতি এতে

নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। মিথ্যা কথা বলে তার মত প্রবল নৃপতিকে প্রতারণা করা হয়েছে। তিনি সে দিনই সসৈন্যে গজনী আক্রমণ করলেন।

এ সংবাদ পেয়ে বাহমান রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধ হলে তিনি নিমিষের মধ্যে পরাস্ত হবেন। তিনি পাত্রমিত্র ও মন্ত্রীদের ডেকে এই বিপদের কথা খুলে বললেন।

মন্ত্রীরা সকলে যখন চিন্তা করছেন, তখন ভগ্নপাদ মন্ত্রী বিদ্রূপ করে বললেন—এত বড় দরবেশ যার জামাতা তার আর চিন্তা কি মহারাজ? আপনি তার শরণাপন্ন হলেই ত বিপদ দূর হবে।

ভগ্নপাদ মন্ত্রী বিদ্রূপ করে এ কথা বললেন বটে কিন্তু রাজা সে সমস্ত সত্য বলে মনে করে তক্ষুণি কন্যার কাছে গিয়ে বললেন—রাজকন্যা, আমি মহাবিপদে পড়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। কাসেম রাজা তোমাকে বিবাহ করতে এসে ব্যর্থ হয়ে গজনী আক্রমণ করেছে। সে গজনার কাছেই শিবির স্থাপন করেছে। সকালেই যুদ্ধ আরম্ভ করবে। কিন্তু আমার যুদ্ধোপকরণ কিছুই প্রস্তুত নেই। কি করে তাকে বাঁধা দেব? শ্রদ্ধেয় দরবেশের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া রক্ষা পাবার আর কোনও উপায় নেই। তাঁর মনে যাতে দয়ার উদ্রেক হয় সে চেষ্টা তুমি করবে।

রাজকন্যা বললেন—পিতা, এর জন্যে আর চিন্তার কি আছে? প্রভু অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুকুল নির্মূল করবেন।

আমি সেই দিনই রাজকন্যা কর্তৃক এই বিষয়ে অনুরুদ্ধ হলাম। আমার মনে এবার অজস্র চিন্তার উদয় হল। অবশেষে বুদ্ধি স্থির করে আমি বনের মধ্যে গিয়ে সিন্দুকের মধ্যে অসংখ্য বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড নিয়ে উড়তে উড়তে কাসেম রাজার শিবিরের উপরে উপস্থিত হলাম! তারপর এরূপ প্রচণ্ড বেগে প্রস্তর-বৃষ্টি করতে লাগলাম যে, শত্রুরা মনে করল নিশ্চয়ই দরবেশের কৃপাদৃষ্টি তাদের উপরে পতিত হয়েছে। সে দিনই রাত্রিতে তারা মহাভীত হয়ে পলায়ন করল।

পরদিন সন্ধ্যায় রাজা কন্যার কাছে এসে গতরাত্রির সমস্ত ঘটনা মনের আনন্দে বর্ণনা করছিলেন এমন সময় আমি উপস্থিত হলাম। রাজা আমাকে দেখবামাত্র ভক্তিভরে সালাম করলেন। তারপর বললেন—হুজুর, আপনারই কৃপায় আমি এ যাত্রা দুর্দান্ত দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি।

আমি এ কথা শুনে মনের আনন্দে তাকে মাটি থেকে তুলে বললাম—রাজা, আমি যখন জানলাম যে কাসেম রাজা সসৈন্যে তোমার রাজ্য আক্রমণ করেছে এবং তোমাকে পরাস্ত করে তোমার কন্যাকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখতে চায়, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না। আমি তার অহঙ্কার চুর্ণ করেছি। ভবিষ্যতে কেহ এরূপ করলে আমি তার উপরে অগ্নিবৃষ্টি করব।

এইভাবে কিছুক্ষণ কথোপকথনে শেষ হলে রাজা প্রস্থান করলেন। আমিও সেরিণীর সঙ্গে পরম সুখে রজনী যাপন করলাম। পরদিন সকালে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি সেখানে নানারূপ আমোদ

প্রমোদ চলেছে এবং সকলেই দরবেশের কৃপাদৃষ্টির জন্য আনন্দ করছে। আমি আরও কিছু কৃতিত্ব দেখাবার ইচ্ছায় কিছু বারুদ ক্রয় করলাম এবং বনের মধ্যে গিয়ে নানাপ্রকার বাজী প্রস্তুত করলাম। তারপর রাত্রিতে শূন্যে উঠে বাজীতে অগ্নি দিয়ে নীচের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলাম। পরদিন সারা নগরীতে রটে গেল—দরবেশ গত রাত্রে শূন্যে বসে আগুন নিয়ে খেলা করেছেন। কেউ বা বলল—আমি দরবেশকে শূন্যে দেখতে পেয়েছি।

আমি এইরূপে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করে বনে ফিরে এসে দেখি আমার প্রাণাপেক্ষা সিন্দুকটি অগ্নিতে পুড়ে গেছ। তা দেখে আমার মনে যে শোকের উদয় হল তা বর্ণনাতীত।

অগত্যা আমি রাজকন্যার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরদিনই স্বদেশের দিকে যাত্রা করলাম।

তারপর আজ অবধি আপনার রাজ্যে বাস করছি এবং তন্তুবায়বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকার সংস্থান করে থাকি। আমি সব সময় হাসিমুখে কাটাই বটে, কিন্তু রাজকন্যা সেরিণীর অদর্শনে মুহূর্তের জন্যও আমার মনে সুখ নেই। ভেবেছিলাম জীবনে কারও কাছে এ পাপের ইতিহাস প্রকাশ করব না, কিন্তু আজ আপনার অনুরোধে তা প্রকাশ করতে হল।

মালেক তন্তুবায় এইভাবে সেরিণী রাজকন্যার কাহিনী শেষ করলে রাজা বদরুদ্দীন তাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

* *

* * * * * *

মালেক তন্তুবায়ের কথা শেষ হলে রাজা বদরুদ্দীন উজীরের দিকে চেয়ে বললেন—দেখ উজীর, এতগুলি লোককে পর পর অনুসন্ধান করেও কোনও প্রকৃত সুখী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি বটে, তবে তাই বলেই আমি স্বীকার করি না যে পৃথিবীর সমস্ত লোকই অসুখী। নিশ্চয়ই প্রকৃত সুখী লোক অন্ততঃ একজন আমাদের দৃষ্টিগোচর হবেই। অতএব ইহার বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য আমি স্বয়ং দেশভ্রমণে বহির্গত হব।

রাজা বদরুদ্দীন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হলেন। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করবার পর তাঁরা বোগ্‌দাদ নগরীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি সরায়ে বাসা নিয়ে তাঁরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, একস্থানে প্রচুর লোক একজন সন্ন্যাসীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা কি ব্যাপার জানবার জন্য ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন সন্ন্যাসী উপস্থিত লোকদের নানা প্রকার উপদেশ দিচ্ছে। সন্ন্যাসী বলছে—মানুষ নানা মায়ায় বদ্ধ হয় বলেই দুঃখ পায়। যে ব্যক্তি কোন মায়ায় কবলিত না হয়, এ পৃথিবীতে তাকে কোনও দিনই দুঃখের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে হয় না। তোমরা কোনও কিছু কামনা ক'রো না, তাহলে দুঃখের মুখ দেখবে না।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলে তাকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে চলে গেল। রাজা ও মন্ত্রী তখন সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে চললেন। একটু পরেই সন্ন্যাসী তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। রাজা তখন তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার জীবনে কি কোনও দুঃখ নেই।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন—মহারাজ, আমার ন্যায় দুঃখী পৃথিবীতে কে আছে? দিবারাত্র আমি দুঃখ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। আমি নিজে মায়ার দাস, অথচ অর্থ উপার্জনের জন্য লোককে মায়ার শৃঙ্খল কাট্‌তে বলছি।

রাজা এইরূপ কথা শুনে চিন্তিত-মনে সরায়ে ফিরে এলেন। সেখানে এসে তিনি শুনতে পেলেন দু'জন লোক নানা কথোপকথনে ব্যস্ত আছে। প্রথম জন বলল—এই পৃথিবীতে সুখী লোক কেউ নেই।

তার উত্তরে দ্বিতীয় লোক বলল—সুখী লোকের সংখ্যা কম এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলে সুখী লোক কেউ নেই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অস্তাখান দেশের অধিপতি হর্মজ রাজাকে দেখলে ও সন্দেহ তোমার মনে থাকত না।

এ কথা শুনবামাত্র রাজা ও মন্ত্রী অস্তাখান দেশের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে একটি সরায়ে তাঁরা আশ্রয় নিয়ে দেখতে পেলেন, রাজ্যজুড়ে উৎসব ও আনন্দ চলছে।

রাজা একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি বলতে পার

এই রাজ্যে এই উৎসব হচ্ছে কি কারণে ?

সে উত্তরে বলল—জনাব, আপনি কি জানেন না, এই দেশে দুঃখী লোক কেউ নেই। বারোমাসই এ রাজ্যে এমনি উৎসব-আনন্দ চলে। তবে সব চেয়ে আমুদে লোক আমাদের রাজা স্বয়ং। তিনি জীবনে কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নি।

পরদিন রাজা ও মন্ত্রী রাজ সভায় গেলেন। তাঁরা দেখলেন একটি অমূল্য সিংহাসনের উপরে রাজা উপবিষ্ট। তার চারদিকে সভাসদরা আসীন। সামনে নর্তকীরা নৃত্য করছে। সারাদিন এমনি আনন্দ চলল। অবশেষে সন্ধ্যায় সভাভঙ্গ হল এবং রাজা অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

এইরূপে পরপর সাতদিন তাঁরা সভায় গিয়ে রাজাকে নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁর মুখে দুঃখের ছায়ামাত্র দেখতে পেল না। তা দেখে রাজা মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—যার মুখে মূহুর্তের জন্যও মালিন্যের ছায়া পড়ে না, এই পৃথিবীতে সে নিশ্চয়ই সুখী।

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, বাইরে থেকে কাউকে বিচার করবেন না।

রাজা বললেন—কিন্তু ওঁর মনের ভাব কি করে জানা যাবে ?

সয়ফলমুলুক রাজপুত্রও অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি কিছু উপহার দিয়ে রাজার কাছে নিজ পরিচয় দিন।

সেদিনই রাজা সভার শেষে একটি বহুমূল্য রত্নাদিপূর্ণ স্বর্ণকৌটা

ও একখানি কপোত-ডিম্বের মত হীরা অস্তাখান-রাজ হর্মজকে প্রদান করে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—জনাব, আপনি কি বাস্তবিকই সুখী?

হর্মজ-রাজ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অবশেষে বললেন—আমি পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী লোক কেউ আছে কিনা তা খুঁজতে বের হয়েছি।

হর্মজ-রাজা বললেন—জনাব, আমি এক মুহূর্তের জন্যও সুখী নই। আগে আপনারা এই গৃহ মধ্যে কি আছে তা দেখে আসুন, তারপর আমি আমার কাহিনী বর্ণনা করব।

এই কথা অনুসারে রাজা বদরুদ্দীন, মন্ত্রী ও সয়ফলমুলুক রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, সেই ঘরের মধ্যে পরমা সুন্দরী একটি নারী সখীগণের সঙ্গে একটি অপূর্ব সিংহাসনের উপরে বসে আছে।

তা দেখে এসে রাজা বদরুদ্দীন অস্তাখান-রাজের কাছে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলেন। তা শুনে রাজা বললেন—জনাব, এই নারীটিই আমার দুঃখের কারণ।

রাজা অবাক হয়ে বললেন—সে কি? এইরূপ অপরূপ-সুন্দরী যার গৃহে সর্বদা বিরাজ করে তিনি কখনও দুঃখী হতে পারে না!

রাজা হর্মজ বললেন—বেশ, বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? আমার সঙ্গে এলেই বুঝতে পারবেন।

এই বলে রাজা হর্মজ বদরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে যেমন ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন, অমনি সেই নারীর মুখের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে লাগল। এতক্ষণ তিনি সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করছিলেন, কিন্তু তার সে ভাব তিরোহিত হল! তখন অস্তাখান-রাজ হর্মজ তার পাশে বসে বললেন—প্রিয়ে, একবার তোমার সুন্দর মুখটি তুলে আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর! আমি মূহুর্তের জন্য তোমার বিরহ-যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছি না।

হর্মজ-রাজের এ কথার কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করা দুরে থাকুক, ধীরে ধীরে রমণী শবাকার ধারণ করতে লাগল।

তখন বদরুদ্দীন রাজা হর্মজকে এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে রাজা হর্মজ বললেন—মহারাজ, আপনি আমার জীবনের কাহিনী শুনলেই এর কারণ বুঝতে পারবেন।

হর্মজ রাজার কাহিনী

পাঁচ বছর আগে আমার বৃদ্ধ পিতা এই রাজ্য শাসন করতেন। আমি তখন একদিন দেশ-ভ্রমণের নেশায় বিদেশের দিকে ভ্রমণের জন্য যাত্রা করব বলে পিতার কাছে আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করি। পিতা এতে মত দিলেন। বন্ধু হাসান, প্রচুর সৈন্য-সামন্ত ও অর্থাদি সঙ্গে নিয়ে আমি ভল্‌গা নদী অতিক্রম করে নানাদেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম।

কিন্তু এটা আমার মনোমত হচ্ছিল না। যদি সাধারণভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশাই করতে না পারতাম তবে আর দেশ-ভ্রমণের উপযোগিতা কি?

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করে আমি একদিন বন্ধু হাসানকে নিয়ে ছদ্মবেশে যাত্রা করলাম। এইভাবে নানাদেশ ভ্রমণ করে একদিন একটি বৃহৎ নগরীর প্রান্তে উপস্থিত হলাম। নগরের প্রান্তে একটি বৃহৎ কক্ষের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমরা একসঙ্গে কতকগুলি কাতোরেক্তি শুনতে পেলাম। কেউ বলছে—হায়, তাকে কেন দেখলাম? না দেখাই যে আমার পক্ষে ছিল ভাল। কেউ বলছে সুন্দরী, আর একবার মুহূর্তের জন্য আমার সামনে এসে দাঁড়াও। কেউ বা বলছে—তোমার সেই স্বর্গীয় গঠন-ভঙ্গী

আর কি [illegible]ন দিনও দেখতে পাব না ?

আমি এসব কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একটি বৃদ্ধকে সেখানে দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—জনাব, আপনি কি বলতে পারেন, এই গৃহের মধ্যে এরূপ অসংলগ্ন বাক্য বলছে কারা ?

বৃদ্ধ এ কথার উত্তরে বলল—জনাব, প্রবল পরাক্রান্ত আর্শিনল নামে রাজা এ নগরের অধীশ্বর। তাঁর নয়নমুগ্ধকর একমাত্র কন্যার নাম রেজিনা। তিনি প্রত্যহ একবার বায়ুসেবনের জন্য রাজপথে বের হন। সেই সময় তাঁর অলৌকিক রূপ ও যৌবন যারা দেখতে পায় তারাই এমনি উন্মাদ হয়ে যায়। এই বাড়ীটি সেই সব উন্মাদের আবাসস্থল।

একথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম—জনাব, সেই রাজকুমারীকে দেখবার উপায় কি ?

এ কথার উত্তরে বৃদ্ধ বলল—না জনাব, আমি কিছুতেই আপনাকে সেই রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারি না। কারণ আমি পূর্বেই বলেছি, রাজকন্যাকে একবার দর্শন করলেই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হতে হয়। এরূপ অনুপম সৌন্দর্য যে কোনও মানুষের বাহ্যজ্ঞান লোপ করতে সক্ষম। আমরা দুইজনে সেইস্থানে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা রেজিনা সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বাক্যালাপ করছি এমন সময় আমাদিগের অনতিদূরে একটা ভয়াবহ কোলাহল শব্দ শুনতে পেলাম, পরে লোক-পরম্পরায় জানতে পেলাম যে, সেই পরমা সুন্দরী

রাজকন্যা বায়ুসেবনের জন্য বের হয়েছে। তাঁকে [illegible] জন্য শত শত লোক হুড়াহুড়ি করছে। এই কথা শুনবামাত্র আমি আমার প্রিয় সঙ্গি হাসানকে বললাম—ভাই চল আমরা একবার সেই অনুপমা সুন্দরীকে দর্শন করে নয়ন, মন চরিতার্থ করি।

হাসান আমার এ কথা শুনে অতি বিনীতভাবে উত্তর করল—যুবরাজ, আমরা রাজকুমারীর অনুপম সৌন্দর্যের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করলাম তাতে তা দর্শনীয় বটে, কিন্তু যদি তার প্রভাবে আমাদিগকেও উন্মাদ রোগগ্রস্থ হতে হয় তাহলে আমাদিগকে বিষম বিপদে পতিত হতে হবে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এরূপ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক হয়ে কখনই ওরূপ আপাততঃ মনোহর অথচ পরিণাম বিরসকর-কার্যে প্রবৃত্ত হবেন না।

হাসান নানাবিধ সৎযুক্তি প্রয়োগ দ্বারা আমাকে বিরত করবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হল না। যেহেতু রাজকন্যার অপরূপ রূপরাশি দর্শনার্থ আমার মন এরূপ চঞ্চল হয়েছিল যে, আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে যে দিকে কোলাহল হচ্ছিল সেই দিকেই দৌড়িতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কতিপয় পদ অগ্রসর হতেই শুনতে পেলাম যে রাজকন্যা বায়ু সেবন করে পুরী-প্রবেশ করেছেন, আজ আর বহির্গতা হবেন না। তখন আমি ক্ষুণ্ণমনে বন্ধুর নিকট প্রত্যাগমন করে সমস্ত কথা ব্যক্ত করলাম। তখন প্রিয় বন্ধু হাসান বলল—খোদার কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেলেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিন। আমি

হা[illegible] অনুরোধে সেদিন বাসায় ফিরে গেলাম। কিন্তু কিভাবে যে সেই রাজকন্যাকে দেখতে পাব এই চিন্তাই দিনরাত্রি ঘুরেফিরে আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে লাগল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজকন্যাকে দেখবার ইচ্ছা নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে রাজপুরীর দিকে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে কখন রাজ-কন্যা বের হবেন; এই চিন্তায় সময় অতিবাহিত করতে লাগলাম।

কিন্তু একটু পরেই রাজবাড়ী থেকে একজন লোক বের হয়ে ঘোষণা করল—আর্শিনল রাজার আদেশে আজ থেকে রাজকন্যা বায়ু-সেবনের জন্য আর রাজবাড়ী থেকে বের হবেন না। এই ঘোষণা শুনে মনের দুঃখে আমি ফিরে এসে সব কথা বন্ধুকে বললাম।

প্রিয় বন্ধু হাসান রাজকুমারীর নগরভ্রমণ বন্ধ হল শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলল—বন্ধু, আল্লার অশেষ দয়া, যে তিনি তোমাকে রক্ষা করেছেন। চল, এবার আমরা দেশের দিকে যাত্রা করি।

আমি বললাম—ভাই, তুমি আর বৃথা বাক্য ব্যয় করোনা। কারণ আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, রাজকন্যার রূপরাশি দর্শন না করে কখনই গৃহে ফিরব না। তার জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হব না।

হাসান আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নিতান্ত হতাশ্বাস হয়ে বাসায় গেল। আমি সেইস্থানে দাঁড়িয়ে কি উপায়ে রাজকন্যা রেজিনার দর্শন-

লাভ করব চিন্তা করছি, এমন সময় একটি লোকের [illegible] আমার সাক্ষাৎ হল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—সে রাজবাড়ীর উদ্যান-রক্ষক। তখন তার কাছে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। কিন্তু উদ্যানপাল আমার কথা শুনে শিউরে উঠল এবং আমাকে ভৎ‍‌র্সনা করে বলল—তুমি এ সমস্ত কথা আর কখনও ব'ল না। কারণ রাজকন্যাকে দর্শন করালে আমার প্রাণদণ্ড হবে। তখন আমি বস্ত্রের মধ্য থেকে কতক গুলি বহুমূল্য প্রস্তর বের করে উদ্যান-রক্ষককে দেখিয়ে বললাম—ভাই; যদি তুমি একবার সেই রাজকন্যাকে দর্শন করাতে পার তাহলে এই সমস্ত বহুমূল্য প্রস্তর তোমাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করব। তখন উদ্যান-রক্ষক আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমাকে পর দিবস তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলল।

আমি যথাসময়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সে একখণ্ড ক্ষতপূর্ণ পশু-চর্ম দিয়ে আমার মাথা আবৃত করে দিল। তারপর একখানি অত্যন্ত জীর্ণবস্ত্র দিয়ে আমার মাথা আবৃত করে আমাকে একটি সামান্য মালী বলে পরিচিত করে রাজ-উদ্যানের কাজে নিযুক্ত করল। আমাকে বলল—সাবধান, যদি তোমার ছদ্মবেশ কেউ টের পায় তবে তুমি এবং আমি দু'জনই বিপদে পড়ব।

তারপর আমি উদ্যান-রক্ষকের কথা অনুসারে একটি কোদাল গ্রহণ করলাম এবং বাগানের আগাছাগুলি পরিষ্কার করে সেখানে নানা সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রোপণ করলাম। এইরূপে আমি সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় উদ্যানের কোণে একটি সরোবরের তীরে

বসে বাঁশী বাজাতাম।

শৈশবে আমার গীতবাদ্যের দিকে খুব আকর্ষণ ছিল। তাছাড়া তাল, লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাই আমার বাঁশী শুনে উদ্যান-রক্ষক খুব খুশী হল। সে আমার এ কাজে আপত্তি করত না।

একদিন বাঁশীর সুললিত স্বরে মুগ্ধ হয়ে প্রধান মন্ত্রী আমার বাঁশী শুনলেন এবং আমাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিলেন। রাজা নিজেও একদিন বাগানে বেড়াতে এসে বাঁশীর মধুর-স্বরে আকৃষ্ট হয়ে উদ্যান-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন—বাঁশী বাজাচ্ছে কে?

বাগানের অধ্যক্ষ বলল—নব নিযুক্ত মালী খুব সুন্দর বাঁশী বাজায় মহারাজ। রাজা বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে আমার বাঁশী শুনে আমাকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। রাজার পাত্রমিত্ররাও আমার বাঁশী শুনে খুব প্রশংসা করলেন।

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেল। সেদিন পূর্ণিমা রাত্রি। একে আমি বাঁশী বাজাতাম ভাল, তার উপরে বাসন্তী পূর্ণিমায় আমার মনে যেন খুশীর বান ডেকেছিল। আমার বাঁশীর সুর-লহরী দিক থেকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত করতে করতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এইভাবে কতক্ষণ বাঁশী বাজিয়েছিলাম সে হুঁশ আমার ছিল না। হঠাৎ পেছনে নারী কণ্ঠে আমার তন্ময়তা কেটে গেল! চেয়ে দেখি একটি সুবেশা তরুণী আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছে।

আমি প্রশ্ন করলাম—আমাকে কিছু বলবেন?

তরুণী মৃদু হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে তুলে বললে—তোমার বাঁশীর মধুর মূর্ছনা রাজকন্যাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি ঐ প্রাসাদে থাকেন। আমি তাঁর একজন সহচরী মাত্র। যদি তুমি তাঁকে বাঁশী শুনিয়ে সন্তুষ্ট করতে পার তবে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রাজকন্যা রেজিনাকে দর্শন করবার দুর্নিবার ইচ্ছা নিয়েই আমি দিনের পর দিন ছদ্মবেশে এইরূপ কষ্টকর জীবন যাপন করছিলাম। তাই এ প্রস্তাবে যে কি পরিমাণ আনন্দ লাভ করলাম তা বুঝতেই পারছেন। আমি তখনই রাজকন্যার সহচরীর সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে সালাম করে দাঁড়ালাম। তিনি হেসে বললেন—তুমি কি আমাদের বাগানেই কাজ কর ?

আমি বললাম— হাঁ, আমি এই বাগানেরই একজন সামান্য মালী। একথা শুনে তিনি একবার ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমার সুন্দর চেহারার সঙ্গে সেই কিম্ভূতকিমাকার পোষাক বেমানান দেখাচ্ছিল। যা হোক্, আমি রাজকন্যার অনুমতি নিয়ে বাঁশীতে সুর যোজনা করলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা টের পাইনি। আমার তৃষিত চোখদুটি রাজকন্যার মুখের দিকে নিবদ্ধ। আর রাজকন্যা ও তাঁর সহচরীরা আমার সুরে তন্ময়।

বাঁশী শেষ হয়ে গেলে রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি অন্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাতে পার ?

আমি বললাম—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রাজকন্যা বললেন—আজ থাক। কাল সন্ধ্যার সময় ওই জায়গাতে

অপেক্ষা কর। আমার সহচরী তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে। আমি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি তোমার জন্য প্রস্তুত রাখব।

প্রচুর বকশীষ নিয়ে আমি হৃষ্টচিতে রাজপুরী থেকে বাগানে ফিরে এলাম। আমার মনে তখন রাজকন্যার অনিন্দ্য সুষমা যেন নিপুন তুলিকায় আঁকা হয়ে গেছে।

রাজকন্যার মধুর মুখখানি ধ্যান করে সেদিন সারারাত আমি নিদ্রিত হতে পারলাম না। পরদিন বাগানের কাজ শেষ করে ঠিক সন্ধ্যার পরই আমি সেই জায়গায় গিয়ে রাজকন্যার সহচরীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সেই সহচরী আমার কাছে এসে তার সঙ্গে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করল। ইঙ্গিত মাত্রই আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে তার সঙ্গে রাজকুমারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

রাজকন্যা একে একে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রাদি আমার সামনে রাখলেন। আমি সেগুলি একে একে বাজিয়ে রাজকন্যাকে মুগ্ধ করলাম। অবশেষে একটি বাদ্য বাজাতে বাজাতে গান গাইলাম। আমার গান শুনে রাজকন্যা আরও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন —আচ্ছা, তুমি কি নৃত্য করতে পার?

আমি রাজকন্যার কথায় সম্মতি জানালাম। রাজকন্যা রেজিনার অনুরোধে ধীরে ধীরে নৃত্য আরম্ভ করলাম। কিন্তু নৃত্যের ঝোঁকে কোনও দিকই খেয়াল ছিল না। আমার ছদ্মবেশ একসময় হঠাৎ খুলে পড়ে গেল। তা দেখে রাজকন্যার সখীরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু রাজকন্যা রেজিনা প্রজ্জলিত

হুতাশনের মত রাগে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন প্রহরী এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সমস্ত ঘটনা শুনে আমার এবং উদ্যানরক্ষকের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিলেন।

আমাদের মৃত্যুদণ্ড হয়ে যেত সত্যি, কিন্তু একটা অভূতপূর্ব ঘটনায় আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম। ঠিক যেদিন আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবার কথা ছিল সেইদিনই গজনী অধিপতি ও কান্দাহারের রাজা একযোগে সেই রাজ্য আক্রমণ করল। লোকপরম্পরায় তাঁরা রাজকুমারী রেজিনার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনেছিল। তাই যুদ্ধে আর্শিনল রাজাকে পরাজিত করে রাজকুমারীকে লাভ করবার ইচ্ছা তাদের মনে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। আর্শিনল রাজা দেখলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করা সুকঠিন। তাই তিনি যুদ্ধে সৈন্য-প্রেরণ করে যাগযজ্ঞ, অর্থদান এবং বন্দীদের কারামোচন ইত্যাদি সদনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিলেন। অন্যান্য বন্দীদের সাথে আমরাও মুক্তিলাভ করলাম।

আমি মুক্তি পেয়ে বন্ধু হাসানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। সে সমস্ত শুনে বলল খোদার কৃপায় এ যাত্রা কঠিন সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছ সত্যি, কিন্তু এখানে আর এক মুহুর্তও বিলম্ব না করে স্বদেশের দিকে যাত্রা করা যাক।

আমি তার কথায় রাজি হয়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করলাম এবং দিনকয়েকের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে দেখলাম পিতা মারাত্মক ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। আমি ফিরে আসার দিন কয়েক পরেই তিনি ইহলীলা

সংবরণ করলেন। পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোক পেলাম। পিতার মৃত্যুর পূর্বে আমাকে যথেষ্ট সংযম অবলম্বন করে রাজ্য চালাতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর কথা অনুযায়ী প্রচুর চিন্তা করে এবং অত্যন্ত স্থিরভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার খ্যাতি দূর দূরান্তর দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজকন্যা রেজিনার কথা মুহূর্তের জন্যও আমি ভুলতে পারছিলাম না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সবসময় যেন রেজিনার কোমল, সুন্দর মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল।

বহুদিন পরে একদিন আমি বন্ধু হাসানকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। হাসান হেসে বলল—সে জন্যে আর চিন্তা কি মহারাজ? আপনি রাজা এবং দেশ জোড়া আপনার খ্যাতি। আপনি আর্শিনল রাজার কাছে দূত পাঠাইলে তিনি নিঃসন্দেহে আপনাকে কন্যা দান করিবেন।

বন্ধুর এই সৎ পরামর্শ শুনে আমি তাকেই দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত করে কার্জন দেশে পাঠালাম। কিন্তু কিছুদিন পর প্রিয়বন্ধু হাসান অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ফিরে এসে বলল—মহারাজ, কার্জন দেশের রাজা আর্শিনল গজনীরাজের সঙ্গে দিনের পর দিন যুদ্ধ করে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে তিনি গজনীর রাজার সঙ্গেই রাজকন্যার বিবাহ দেবেন বলে স্থির করেছেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠানাদি শেষ হবে।

এই সংবাদ শোনামাত্র আমার মন এমন অধৈর্য হয়ে পড়ল যে

আমি সমস্ত রাজকার্য পরিত্যাগ করে দিনরাত্রি একটা নিভৃ [illegible]ার কক্ষের মধ্যে কালক্ষেপ করতে লাগলাম। আমার এইরূপ অবস্থা দেখে বন্ধু হাসান দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য তরুণী এনে আমাকে দেখাতে লাগলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমার মনোরঞ্জন করতে পারল না। দিবারাত্র রেজিনার সুন্দর মুখখানির চিন্তায় আমার মন দগ্ধীভূত হতে লাগল।

এইভাবে আমার জীবন যখন করুণ দুর্দিনের সম্মুখীন, তখন বিধাতার করুণার এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল।

একদিন প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে একা বিবর্ণভাবে বসে আছি এমনি সময় প্রধানমন্ত্রী এসে বলল—মহারাজ, আজ সকালে ভ্রমণ করতে করতে নগরের প্রবেশদ্বারে দেখলাম অদ্ভুত প্রস্তরনির্মিত নূতন এক অট্টালিকা। তার মধ্যে রয়েছে সুনির্মল পানির ঝরণা। ঠিক্ একই রকম চেহারার চল্লিশটি বালক এবং একজন বৃদ্ধ সেখানে বসে রয়েছে।

আমি তক্ষুণি সেখানে গিয়ে নানাকথায় বৃদ্ধকে পরিতুষ্ট করে এর কারণ জানতে চাইলাম। বৃদ্ধ বললেন—মহারাজ, এই চল্লিশটি বালক আসলে চল্লিশটি বৃক্ষের শাখা—মন্ত্র বলে বালকে রূপান্তরিত হয়েছে। আর পৃথিবীতে এমন কোনও কার্য নেই যা ওরা করতে পারে না। একরাতের মধ্যে এই বিশাল বাড়ী এরা তৈরী করেছে।

আমি পরম ভক্তিভরে বৃদ্ধের সেবা করলাম। বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে

বললেন মহারাজ, আপনার যদি কোনও ইচ্ছা থাকে তাও আমি পূর্ণ করতে পারি।

আমি বললাম—আপনি যদি আর্শিনল রাজার মেয়ে রেজিনাকে এখানে আনতে পারেন তবে খুব সন্তুষ্ট হব।

বৃদ্ধ বললেন—এ ত অতি সামান্য কাজ। তিনি তক্ষুণি তার চল্লিশটি বালককে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা রাজসিংহাসনশুদ্ধ রাজকন্যা রেজিনাকে আমার সামনে এনে উপস্থিত করল।

রাজকন্যা রেজিনা আমাকে দেখে ও আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে খুব ভালবাসল। আমি তাকে আর্শিনল রাজার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল—গজনী ও কান্দাহার রাজারা নিজেদের মধ্যে অবশেষে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং তাতে গজনীরাজের মৃত্যু হয়। অবশেষে কান্দাহার রাজার সঙ্গে বাবা আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তোমাকে দেখা অবধি আমি তোমার কথাই ধ্যান করছিলাম, তাই আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ।

পরদিন রাজকন্যা রেজিনার সঙ্গে মহাসমারোহে আমার বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু এ দিকে আর এক ব্যাপার হল। কান্দাহার রাজা আর্শিনলের সাহায্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ

করল। আমি এ সংবাদ শুনে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলাম। সেই চল্লিশজন বালকের সাহায্যে আমিই যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। অবশেষে রাজা আর্শিনল বশ্যর্তা স্বীকার করলেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে দেখা করে মহানন্দে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। আমার রাজ্য জুড়ে আনন্দ ও ধুমধাম চলতে লাগল।

আমি রাজকন্যাকে এত ভালবাসতাম যে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কখনও ছাড়তে চাইতাম না। কিন্তু আমার এ সুখে বাদ সাধল সেই যাদুকর বৃদ্ধ আবেসিন। রাজকন্যার রূপলাবণ্য দেখে সেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি একদিন গোপনে রাজকন্যার কাছে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। রাজকন্যা তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি জোর করে রাজকন্যাকে চুম্বন করতে গেলেন। রাজকন্যা রেজিনা রেগে গিয়ে সজোরে ফকীরকে ভূমিতে নিক্ষেপ করল।

তখন বৃদ্ধ রেগে গিয়ে রাজকন্যাকে অভিশাপ দিলেন—যে হর্মজ রাজাকে ভালবেসে তুই আমাকে ঘৃণা করলি—তার প্রণয়-সম্ভাষণ শুনলেই তুই অজ্ঞান হয়ে পড়বি।

এই অভিশাপ দিয়ে বৃদ্ধ ফকীর রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তার পর থেকেই রাজকন্যার যে এই অবস্থা হয়েছে তা ত দেখতেই পেলেন।

* * * *

হর্মজ রাজার ইতিহাস শেষ হলে মন্ত্রী আতাউলমুল্‌ক বললেন—এ কথা স্বীকার করি যে রাজকন্যা রেজিনা একজন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী;

কিন্তু তাঁকে দেখে মুহূর্তের জন্যও আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। কারণ, রাজকন্যা জেলেখার যে মূর্তি আমার হৃদয়ে অাঁকা আছে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠা বলে আমার কাউকেই মনে হয় না।

রাজপুত্র সয়ফলমুলুক বললেন—আমারও ঠিক তাঁই। মুহুর্তের জন্যও সেই কামরালজামানের মূর্তি ভুলতে পারছি না।

এ কথা শুনে মন্ত্রী রাজা বদরুদ্দীনের দিকে চেয়ে বললেন—আচ্ছা মহারাজ, আপনার জীবনে এমন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কে এসেছিল যার কথা আপনি মূহুর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না।

রাজা বললেন—এমন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এসেছিল তা তুমি কি করে বুঝলে মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন—তা নইলে আপনি দিবারাত্র এরূপ চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন না। তাছাড়া কোনও নারীই যে আর আপনার মনস্তুষ্টি ঘটাতে পারে না তাও আমি লক্ষ্য করেছি।

রাজা বদরুদ্দীন বললেন—বেশ, এতদিন আপনাদের সকলের কাহিনী শুনলাম। এবার আমার কাহিনীটি আপনারা মন দিয়ে শুনুন।

আমার জীবনে অরোয়া নামে এক সুন্দরী এসেছিল, যার কথা মূহুর্তেয় জন্যও ভুলতে পারছি না।

এই বলে তিনি অরোয়া রূপসীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

অরোয়া রূপসীর কাহিনী

ডামাস্ক নগরে বান্নু নামে এক সমৃদ্ধশালী প্রাচীন সওদাগর ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে নানাস্থানে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তিনি নিজের স্বভাব ও দান করবার ইচ্ছার জন্য যে যা চাইত, তাকে তাই দান করতেন। তার ফলে তাঁর অর্জিত সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হয়ে যায়। অবশেষে যখন বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত অর্থই নিঃশেষ করে কষ্টে পতিত হলেন, তখন লজ্জার জন্য কারও কাছে কিছুই চাইতে পারলেন না। শেষে যখন দেখতে পেলেন কোন মতেই সংসার চলে না, তখন বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর কোনও বন্ধুর কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সাহায্য করা তে দূরে থাক, তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করল না। এইভাবে অতিকষ্টে কিছুদিন কেটে গেলে একদিন তাঁর মনে হল যে, দানেশনন্দ নামে একজন বৈদ্য তাঁর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী অরোয়াকে সম্বোধন করে বললেন—তুমি যদি ঐ বৈদ্যের কাছে গিয়ে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা জানিয়ে ঐ টাকা ফেরৎ চাও তবে তিনি নিশ্চয়ই তা ফেরৎ দেবেন।

সাধ্বী নারী অরোয়া এর আগে কখনও বাড়ী থেকে বাইরে পদার্পণ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু স্বামীর অনুরোধে বাধ্য হয়ে সে দানেশনন্দ

বৈদ্যের কাছে গিয়ে বলল—আপনি আমার স্বামীর কাছ থেকে ইতিপূর্বে যে দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছেন তা পরিশোধ করুন। তিনি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে আমাকে পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে বৈদ্য দানেশনন্দ বললেন—সুন্দরী, আমি তোমার স্বামীকে চিনি না, টাকা ধার করা ত দূরের কথা। তবে তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তবে দু'হাজার কেন, চার হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।

একথা শুনে সাধ্বী নারী তাঁকে অজস্র কটুবাক্য বলে বাসায় ফিরে এসে সব কথা স্বামীকে খুলে বলল।

সুন্দরী অরোয়ার কথা শুনে তার স্বামী সওদাগর বান্নু বলল—তুমি এক্ষুনি কাজীর কাছে গিয়ে দানেশনন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত কর। তিনি অত্যন্ত সাধু এবং ন্যায়পরায়ণ বক্তি। আসা করি আমরা তাঁর কাছ থেকে সুবিচার পাব।

বণিক-পত্নী এ কথা শুনে সমস্ত শরীর সুন্দর বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে বিচারালয়ে গিয়ে উপস্থিত হল এবং সেখানে মুখের কাপড় উন্মোচন করে প্রতারক দানেশনন্দের ঘটনা কাজীর কাছে খুলে বলল।

কাজী বণিক পত্নীর রূপ ও লাবণ্য দেখে এত মোহিত হয়ে গেলেন যে, তিনি তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—সুন্দরী, আমি অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করেছি। আমার কাছ থেকে সুবিচারও

তুমি পাবে। আমি তোমার রূপ দেখে এত মুগ্ধ হয়েছি যে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করলে তুমি আরও চার হাজার মুদ্রা পুরস্কার পাবে।

এ কথা শুনে বণিকপত্নী স্বামীর কাছে ফিরে এসে বলল—আমি অত্যন্ত হতভাগিনী, তা নইলে যার কাছে যাই সেই আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে কেন?

তখন বণিক বান্নু বলল—তুমি নগরীর প্রান্তে সাক্ষাৎ ধর্মের মত ন্যায়বান যে রাজ-প্রতিনিধি বাস করেন তাঁর কাছে গিয়ে দানেশনন্দ ও কাজী সম্বন্ধীয় বিষয় নিবেদন কর।

সেই কথা অনুসারে সুন্দরী অরোয়া সেই রাজ-প্রতিনিধির নিকট গিয়ে সমস্ত কথা বিবৃতি করল। রাজ-প্রতিনিধি বললেন—তুমি যদি আমার কাছে ধরা দাও তবে তোমার স্বামীর চার হাজার টাকা ত প্রত্যর্পণ করবই, তা ছাড়া দানেশনন্দ ও কাজীকে কঠোর দণ্ড দেবার ব্যবস্থাও করব এবং আজীবন তোমায় রাজরাণীর মত সুখে লালন-পালন করব।

সুন্দরী অরোয়া তখন গৃহে ফিরে এসে সারারাত্রি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। ভোরের দিকে তার মাথায় একটি সুন্দর বুদ্ধির উদয় হল। সে তখন সেই বুদ্ধিটি তার স্বামী ও তার পরিচারিকাকে খুলে বলল। তারা মত দিলে অরোয়া দোকানে গিয়ে তিনটি বৃহৎ কাঠের তৈরী সিন্দুক কিনে আনল। তারপর সেই সিন্দুক তার বাড়ীর তিনটি কক্ষে রেখে দিল।

সেইদিনই বিকালে সে রাজপ্রতিনিধির কাছে গিয়ে বলল—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি।

রাজপ্রতিনিধি তাকে তক্ষুণি জড়িয়ে ধরতে গেলে অরোয়া বলল—তা হবে না। আজ রাত্রি প্রথম প্রহরে আপনি আমার বাড়ী যাবেন। আর ওই চার হাজার টাকা সঙ্গে আনবেন। রাজপ্রতিনিধি এ কথায় আনন্দের সহিত সম্মত হলেন।

অতঃপর অরোয়া কাজীর বাড়ী গিয়ে তাঁকে বলল—আমি পূর্বে আপনার কথায় আপত্তি জানিয়ে যে অপরাধ করেছি তা মার্জনা করবেন। আমি আপনার মত সুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে আর কোথায় পাব? অতএব আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আমার বাড়ীতে একাকী আসবেন। আর সেই চার হাজার টাকাও সঙ্গে করে আনবেন।

কাজী আনন্দিত হয়ে বললেন—চার হাজার কেন, আমি আট হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে যাব।

অতঃপর অরোয়া বৈদ্য দানেশনন্দের বাড়ী গিয়ে বলল—আপনার প্রস্তাবে আমার কোনও আপত্তি নেই। আজ রাত্রে আমার স্বামী গুরুতর কোন কাজে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি রাত্রি তৃতীয় প্রহরে চার হাজার টাকা নিয়ে আমার বাড়ী এলেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে। বৈদ্যও এ প্রস্তাবে যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

সেদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজ-প্রতিনিধি চার হাজার টাকা নিয়ে এসে অরোয়ার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। অরোয়া তাঁর

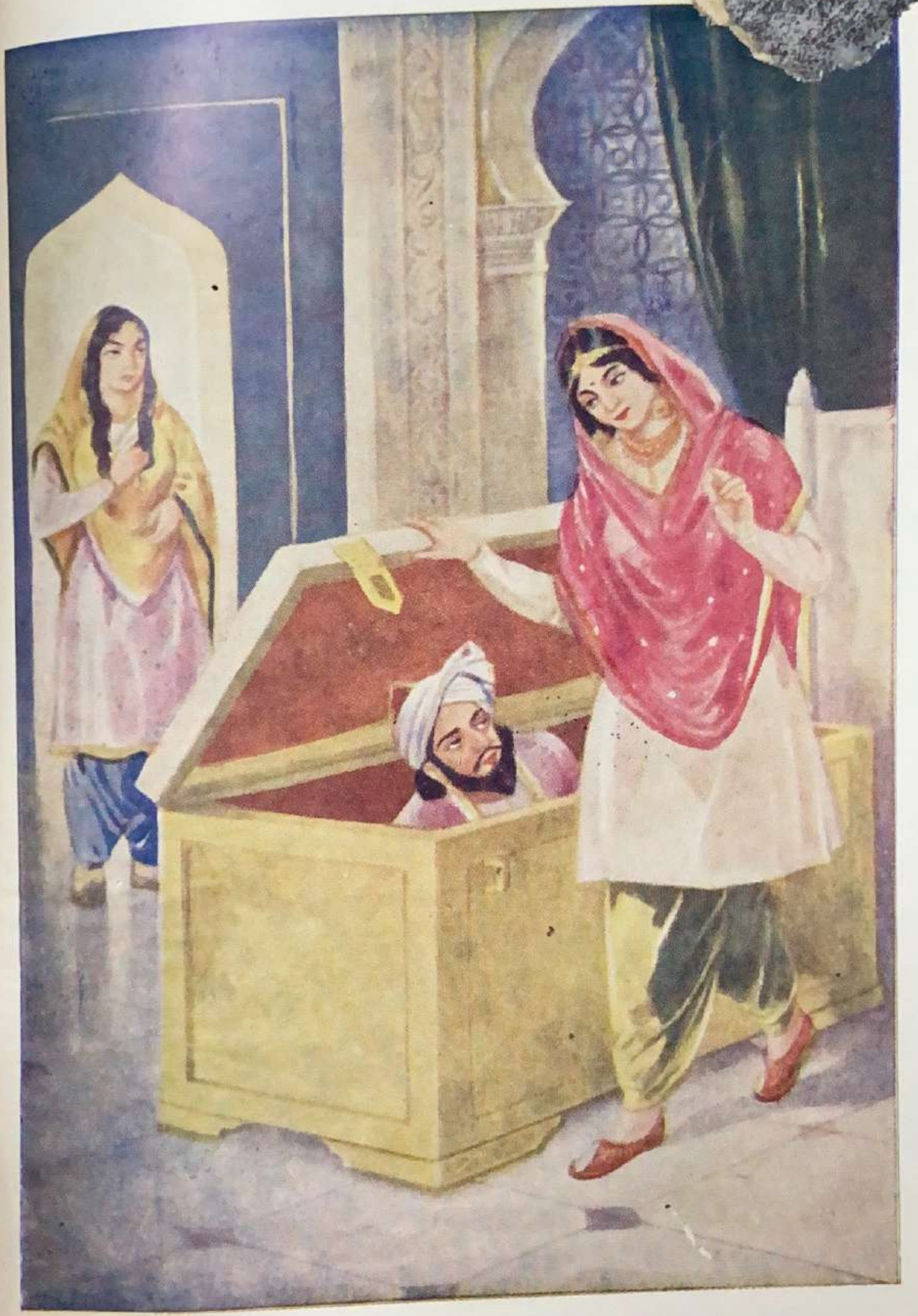

এই কথা শুনে কাজী শীঘ্র সেই সিন্দুকে প্রবেশ করলে...

কাছ থেকে টাকাগুলি নিয়ে তাঁর খাবার ব্যবস্থা করল। তারপর বলল—খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন, তারপর আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই অরোয়ার পরিচারিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে. বলল—মা, আপনার ভাই দীর্ঘদিন পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বাড়ীর দিকে আসছেন। তিনি এক্ষুণি এসে পৌঁছবেন। কিন্তু তিনি যদি এ অবস্থায় আপনাদের দেখতে পান তবে কি হবে ?

ভয়ে অরোয়া এবং রাজ-প্রতিনিধি দু'জনেরই মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল। অরোয়া রাজ প্রতিনিধির দিকে চেয়ে বলল—শীঘ্র ওই সিন্দুকের ভিতর আপনি প্রবেশ করুন। ভ্রাতা চলে গেলেই আপনাকে বের করে দু'জনে আনন্দে রাত্রি যাপন করব।

এ কথা শুনে রাজ-প্রতিনিধি শীঘ্র সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং অরোয়া তাঁকে সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় কাজী এসে উপস্থিত হলেন। অরোয়া তাকে মহাসমাদরে আহ্বান করল এবং খাবার ইত্যাদি তার সামনে ধরল। কাজী প্রথমেই অরোয়াকে সজোরে চুম্বন করলেন। অরোয়া তাতে আপত্তি করল না। অতঃপর কাজী খাওয়া-দাওয়া যেমন শেষ করেছেন এমন সময় পরিচারিকা দৌড়ে এসে বলল—মা, আপনার স্বামী এখনই এই ঘরের দিকে আসছেন।

অরোয়া তখন কাজীর দিকে চেয়ে বলল—আপনি শীঘ্র ওই সিন্দুকের ভিতরে প্রবেশ করুন। উনি চলে গেলে আপনাকে বের

করব। তারপর সারারাত্রি দু'জনে একত্রে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারব। এই কথা শুনে কাজী শীঘ্র সেই সিন্দূকে প্রবেশ করলে অরোয়া তাতেও তালা লাগিয়ে দিল।

এইভাবে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বৈদ্য দানেশনন্দ এসে একই ভাবে বণিকপত্নীর ফাঁদে ধরা দিলেন।

পরদিন সকালে বণিকপত্নী অরোয়া আমার সভায় এসে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলল এবং বৈদ্য দানেশনন্দ, কাজী এবং রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

এতগুলি সজ্জন লোকের বিরুদ্ধে এ ধরণের নালিশ আমি বিশ্বাস করলাম না। তাতে বণিকপত্নী বলল—আমি সুবিচারের আশাতেই রাজসভায় এসেছি। কিন্তু দেখছি সে আশা নেই।

আমি বললাম—আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু প্রমাণ দেখাও।

সুন্দরী অরোয়া তখন মৃদু হেসে বলল—বেশ, আমি এক্ষুনি প্রমাণ উপস্থিত করছি। এই বলে সে রাজসভা পরিত্যাগ করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কতকগুলি লোকের মাথায় চাপিয়ে সে তিনটি সিন্দুক এনে রাজসভার মধ্যে স্থাপন করল। তারপর বলল—এই সিন্দুকগুলিই আমার প্রমাণ। এই বলে সে নিজের হাতে সিন্দুকের তালা খুলে দিতেই তার মধ্য থেকে একে একে কাজী, দানেশনন্দ ও রাজপ্রতিনিধি

সচিত্র পা:

অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন।

আমি এবার বণিকপত্নীর কথায় বিশ্বাস করলাম। সভাশুদ্ধ লোক বণিকপত্নী অরোয়াকে সাধু সাধু করতে লাগল। আমি তৎক্ষণাৎ ওই লম্পট কাজী ও রাজ-প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করলাম এবং দানেশনন্দকে কারাগারে প্রেরণ করলাম।

কিন্তু সুন্দরী অরোয়ার রূপ-লাবণ্য আমাকেও মুগ্ধ করেছিল। আমি পরদিন গোপনে বণিক বান্নুকে রাজপ্রাসাদে ডেকে বললাম—তুমি যে কোনও পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কি তোমার পত্নীকে বিক্রী করতে সম্মত আছ? এরূপ লাবণ্যবতী নারী এ রাজপুরী কেন বোধ হয় ত্রিভুবনেও নেই।

বণিক বলল—আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করব। সে যদি রাজরাণী হতে চায় তবে আমার আপত্তি নেই।

সেইদিনই বণিক বাড়ী ফিরে অরোয়াকে বলল—রাজা তোমাকে প্রধান রাণী করতে ইচ্ছুক এবং আমাকে বলেছেন, যে কোনও পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রয় করতে। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে ত কিছু করতে পারি না। তুমি কি রাজরাণী হতে চাও?

সাধ্বী নারী বল—তোমাকে ছেড়ে আমি রাজঅন্তঃপুরেও যেতে চাই না। চল আমরা আজই এ রাজ্য ছেড়ে প্রস্থান করি।

সেইদিন সওদাগর বান্নু এবং রূপসী অরোয়া আমার রাজ্য ছেড়ে

চলে গেল। পরদিন আমার দুত তাদের খুঁজতে গিয়ে দেখে তাদের বাড়ী জনশূন্য।

সেই থেকে আজ অবধি আমি সুন্দরী অরোয়ার রূপের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি।

° ° ° °

° ° ° ° °

রাজ বদরুদ্দীন এইভাবে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, এ জগতে সর্বতোভাবে সুখী ব্যক্তি কেউ নেই।

এইভাবে ধাত্রী তাঁর কাহিনী শেষ করলে রাজকন্যা ফরোখনাজের সখীরা একবাক্যে বলতে লাগল এরূপ সুন্দর গল্প আমরা জীবনে শুনি নাই। এতগুলি সুন্দর চরিত্র পৃথিবীতে ছিল জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি।

কিন্তু রাজকন্যা ফরোখনাজ বললেন—এর মধ্যে একটি চরিত্রকেও আমি সুন্দর বলতে পারি না। পুরুষরা শুধুমাত্র ছলনা ও প্রতারণা করেই যে নারীর হৃদয় জয় করে এবং সারাজীবন তাদের অসহ্য যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা দেয় এ গল্পগুলি তারই প্রমাণ। গল্পগুলি উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু আদর্শ প্রণয়ী পুরুষ এর মধ্যে একজনও আমার দৃষ্টিগোচর হলো না।

এ কথা শুনে ধাত্রী রাজ কন্যার অনুমতি নিয়ে আবার নূতন একটি গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

এডিস ও ডঁহী দৈত্যের কাহিনী

একদিন খলিফা হারুণ-অর-রশীদ তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী প্রাসাদে বসেছিলেন। এমন সময় অলিন্দ থেকে দেখলেন নদীর কিনারার দিকে এক যুবক ও এক বৃদ্ধ গল্প করছে এবং যুবকের গল্প শুনে বৃদ্ধটি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বৃদ্ধও তখন যুবককে আর একটি গল্প বলল এবং তা শুনে যুবকটিও হেসে উঠল। খলিফা হারুণ-অর-রশীদ তখন উভয়কে সেখানে আনিয়ে গল্প দুটি শুনতে চাইলেন। তখন খলিফা ও তাঁর পত্নীকে অভিবাদন করে যুবক তার গল্পটি সুরু করল।

গলকুণ্ডা প্রদেশের রাজধানী মসলিপট্টমের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একটি দরিদ্র বিধবা রমণী বাস করত। তার দুটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম ফাতিমা, বয়স সতেরো। আর কনিষ্ঠার নাম খাদিজা, বয়স পনেরো। তারা দু'জনেই একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে বাস করত। মসলিপট্টমের ভদ্রলোকদের বস্ত্রাদি ধুয়েই তাদের দিন চলত।

একদিন সেই রমণী কুটীরের কাছেই একটি গাছে পুষ্প-চয়ন করছিল, এমন সময় একটি সর্প এসে সহসা তাকে দংশন করল। সেই

সর্প-দংশনের ফলেই সেই বিধবার মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে সেই বিধবা রমণী তার মেয়েদের ডেকে বলল—আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। এজন্য তোমরা বৃথা শোক ক'রো না! মানুষ মাত্রই মরণশীল। তোমাদের যে ধর্ম-শিক্ষা আমি দিয়েছি, তাই তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সহায়।

অতঃপর সে কনিষ্ঠা মেয়েকে ডেকে বলল—তুমি তোমার আপাকে ঠিক মায়ের মত দেখবে এবং তার কথা অনুসারে সব সময় চলবে। এই কথা বলেই বৃদ্ধা শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

মেয়েদের দিন কোনওরূপ সুখে-দুঃখে কাট্‌তে লাগল। একদিন এক বৃদ্ধ তাদের কুটীরে এসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ফাতিমা নিজের সত্যকারের পরিচয় দিলে বৃদ্ধ বলল—তোমরা সত্যিই অসহায়। অতএব তোমরা যদি আমার কুটীরে যাও তবে তোমাদের যত্নে প্রতিপালন করি এবং তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নিকে আমি বিবাহ করে তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করি।

বৃদ্ধের কথা শুনে ফাতিমা খাদিজাকে বলল—বোন তুমি সত্যই অসহায়। আর এই বৃদ্ধও পরম ধার্মিক। অতএব তুমি এঁকে বিবাহ করলে মনের সুখে দিন কাটাবে! খাদিজা এতে অস্বীকৃত হলে বৃদ্ধ বলল—পরমেশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে পরম সুখে রাখব এবং বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি যা তুমি চাইবে তাই দিয়ে তোমাকে তুষ্ট করব।

ফাতিমা তখন বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বলল—আপনি [illegible]দজার সঙ্গে কথা বলুন, আমি মহাজনদের কাপড়গুলো নিয়ে আসি। ফাতিমা চলে গেলে খাদিজা কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু দিন শেষ হয়ে রাত নামল, তবুও ফাতিমা ফিরে এলো না। এতে দুঃখিতা হয়ে খাদিজা কাঁদতে লাগল। বৃদ্ধ বলল—দেখ, তিনি নিশ্চয় বিপদে পড়েছেন। তুমি আমার সঙ্গে আমার বাসায় চল। কারণ, তোমার এখানে একা থাকা অসম্ভব। তোমার অমতে আমি তোমাকে বিবাহ করব না।

খাদিজা বৃদ্ধের বাড়ীতে এসে দিন কাটাতে লাগল। বৃদ্ধ প্রত্যহ তাকে প্রচুর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি এনে দিত, তাতেও খাদিজা মনে সুখ পেত না। দিনরাত বোনের জন্য হা-হুতাশ করে তার সময় কাট্‌তে লাগল।

একদিন রাত্রে খাদিজা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। একটি সুন্দর যুবক তার সামনে এসে বলল—খাদিজা তুমি কি তোমার বোনের কথা ভুলে গেছ? সে এখন সুমাত্রা দ্বীপে বাস করছে। অতএব শীঘ্র সেখানে গিয়ে তাকে দর্শন কর। আর আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী।

ঘুম থেকে উঠে খাদিজা বৃদ্ধের সঙ্গে সুমাত্রা দ্বীপে যেতে চাইল। বৃদ্ধ সে কথায় কোনও আপত্তি না করে তক্ষুণি একটি জাহাজে চড়ে যাত্রার ব্যবস্থা করতে লাগল। পরদিন তারা সুমাত্রার দিকে রওনা হল। জাহাজে খাদিজাকে বলল—সুন্দরী; আমি এত চেষ্টা

করছি, তবুও তোমার মন ফেরাতে পারলাম না। যাহোক্ তুমি আমায় যে বৃদ্ধ অবস্থা দেখে ঘৃণা করছ, আমি বাস্তবিকই তেমন বৃদ্ধ নই। আমার পূর্বের সৌন্দর্য দেখলে যে কোন সুন্দরী আমাকে ভালবাসত। কোন এক দুর্ঘটনার ফলেই আমার সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু কোনও রকমে তোমার প্রণয়প্রাপ্ত হলেই আমি পূর্বের সৌন্দর্য ফিরে পাব।

খাদিজা তখন বৃদ্ধের কাহিনী শুনতে চাইলে বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করল :

সুন্দরী, আমি মানব-কুলে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি এবং আমার এক জমজ ভাই দু'জনই দৈত্যকুলে জন্ম নিই। আমার নাম ডেহী ও আমার ভায়ের নাম এডিস। আমরা যদিও সাধারণ মানুষের চেয়ে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলাম, তবুও ভিসাপর নামে একজন বৃদ্ধ দৈত্য ছিল আমাদের অধীশ্বর। আমরা দু'জনই বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ দৈত্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলাম। একদিন তিনি কার্জনা নামে তার অতিশয় সুন্দরী যুবতী নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের উপর দিয়ে অন্যত্র যাত্রা করেন। কার্জনা বৃদ্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। আমাদের সৌন্দর্য দেখে কার্জনা মুগ্ধ হয়ে গোপনে প্রেম পিপাসা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করল। প্রথমে এডিস তার ফাঁদে ধরা দিল। আমি তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতাম। কিন্তু একদিন সে আমাকে নির্জনে দেখতে পেয়ে এভাবে আমার পা জড়িয়ে ধরে

সাটিন

কাঁদতে লাগল যে আমি বাধ্য হয়ে তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃ

এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। একদিন আমরা উলঙ্গ অবস্থায় জলকেলি করছি এমন সময় দৈত্যরাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের এই অবস্থায় দেখে ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে বললেন—নীচাশয়, তোরা যেমন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, তেমনি তোদের মানুষ আকার ধারণ করে মর্ত্যে কাটাতে হবে। তোদের এই সুন্দর রূপ অন্তর্হিত হবে—তোরা বৃদ্ধে রূপান্তরিত হবি। তখন আমরা তার পা ধরে কাঁদতে লাগলাম। তিনি অতঃপর কিছুটা সদয় হয়ে বললেন—সুন্দরী নারী-প্রণয়প্রাপ্ত হলে তোরা আবার নিজ-রূপ ফিরে পাবি। সেই জন্যই তোমার ভালবাসা পাবার আশায় এত চেষ্টা করেছি। এইরূপে গল্প শেষ করে ডেহী নিরস্ত হল। কিন্তু এতেও খাদিজার মনের পরিবর্তন হল না!

পনর দিনের দিন তাদের জাহাজ একটি ঘুর্ণিবাত্যায় তাড়িত হয়ে সুমাত্রা ছাড়িয়ে অন্য একটি দ্বীপের সামনে উপস্থিত হল। দ্বীপটি সুন্দর। তারা সেখানে জাহাজ ভিড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে বন্য লোক এসে তাদের সকলকে একটি কারাগারে নিয়ে গেল। খাদিজাকেও তারা কারাগারে প্রেরণ করল। কেবল বৃদ্ধ দৈত্যকে তারা সম্মান দেখিয়ে তাদের রাণীর কাছে নিয়ে গেল। এরূপ ব্যাপার দেখে বৃদ্ধ অবাক হয়ে গেল। তারপর তারা তার

তাকে তাদের রাণী, স্কাহারবানুর কাছে নিয়ে গেল। স্কাহারবানু ডেহীকে দেখেই মহাসমাদরে তাকে বসাল এবং অনেকভাবে তার মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধা রাণী স্কাহারবানুর প্রতি ডেহীর কোনও আকর্ষণ না দেখে সে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কারাগারে গিয়ে ডেহী দেখল, সেখানে এডিসও বৃদ্ধের বেশে বন্দী রয়েছে। দু'জনকে দেখে দু'জনেই আনন্দে চোখের পানি ফেলতে লাগল। এডিসও এর আগে এসে একইভাবে বন্দী হয়েছিল।

পরদিন দু'জনকেই বধ্যমঞ্চে উপস্থিত করা হল। তাদের ঘিরে দ্বীপবাসীরা আনন্দে উৎসব সুরু করল। অবশেষে তারা যখন তাদের দু'জনকে বধ করতে গেল তখন তাদের চেহারা হঠাৎ পাল্টে গেল। দু'জনই পূর্ব চেহারা ফিরে পেল। হঠাৎ এই রূপান্তর দেখে দ্বীপবাসীরা ভয় পেয়ে পলায়ন করল। তখন বৃদ্ধ দৈত্যরাজ এসে বলল— তোমাদের দুর্দশা দেখে আমার দয়া হল, তাই তোমাদের উদ্ধার করলাম। তারপর ফাতিমা ও খাদিজাকে মুক্ত করে সেখানে নিয়ে এলেন। খাদিজা দেখল তার স্বপ্নের যুবকই হচ্ছে দৈত্য ডেহী। সে ডেহীর নবরূপ দেখে সন্তুষ্ট হল। তারপর ফাতিমা ও খাদিজার সঙ্গে এডিস ও ডেহীর বিবাহ হল এবং তারা দৈত্য রাজ্যে গিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

গল্প শুনে বাদশাহ ও বেগম খুশী হয়ে যুবককে পুরস্কার দিলেন। তখন বৃদ্ধ তার গল্প আরম্ভ করল।

বাদশাহ্ নসিরদ্দৌলা, আব্দুর রহ্মান ও তার প্রেমিকা জয়নবের কাহিনী

বহুদিন পূর্বে আবদুর রহমান নামে একজন বণিক বোগ্‌দাদ নগরে বাস করতেন। তিনি প্রচুর ধন-ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং সুখেই তাঁর দিন কাটত। প্রতিদিন অনেকগুলি অতিথির সেবা না করে তিনি কখনও আহার করতেন না। তাঁর গৃহ তাই অসংখ্য সাধু-সজ্জনে পরিপূর্ণ থাকত।

একদিন মৌজল দেশের এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কয়েকদিন মনের আনন্দে কাটিয়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করবার সময় তিনি বললেন—মৌজল দেশের একজন রাজকর্মচারী আমি। সেখানে গেলে অবশ্যই রাজসভায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

কিছুদিন পরে আবদুর রহমান মৌজল দেশের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানকার রাজসভায় গিয়ে দেখে ওই লোকটিই স্বয়ং মৌজল দেশের অধিপতি। মৌজলাধিপতি পরম সমাদরে আবদুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিছুদিন সেখানে মনের আনন্দে কাটিয়ে আবদুর রহমান স্বদেশে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে একজন নারীবিক্রেতা একটি অতি সুন্দর অষ্টাদশবর্ষীয়া

াছে বিক্রীর জন্য নিয়ে এল। তিনি তার অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য দেখে এমন মোহিত হয়ে গেলেন যে, একলক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করে তাকে বিবাহ করলেন। এই নারীটির নাম জয়নব। জয়নব এতই সুন্দরী যে আবদুর রহমান শয়নে, স্বপনে জাগরণে কখনও তাঁকে চোখের আড়াল করতেন না। জয়নবও আবদুর রহমানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত।

এর কিছুদিন পরে মৌজলাধিপতি আরেকদিন বোগদাদে এসে আবদুর রহমানের গৃহে অতিথি হলেন। তিনিও তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নানাবিধ সমাদর প্রদর্শন করলেন। অবশেষে কথায় কথায় নারীর সৌন্দর্যের কথা উঠলে বাদশাহ বললেন—আমার অন্তঃপুরের নারীদের ত আপনি দেখেছেন। তাদের অনিন্দ্য রূপের তুলনা হয় না।

এ কথা শুনে হেসে আবদুর রহমান বললেন—কিন্তু তারা কেউ সৌন্দর্যে আমার স্ত্রী জয়নাবের সমকক্ষ নয়। এই বলে আবদুর রহমান বাদশাকে তাঁর অন্তঃপুরের সব কটি নারী দেখালেন। অবশেষে দেখালেন জয়নবকে। বাদশাহ জয়নবকে দেখে এত বিস্মিত হলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরিত হল না। তিনি অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে আবদুর রহমানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলেন না। অবশেষে বললেন—আমি আজই স্বদেশ যাত্রা করব।

সচিত্র পারস্য

আবদুর রহমান অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—সে কি? আপনার সমাদরের কোনও ত্রুটি হয়েছে কি?

মৌজলাধিপতি কুণ্ঠিতস্বরে বললেন—না আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্যেই আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। অতএব অনুমতি পেলে যাত্রা করি। এখানে থাকলে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারব না। অগত্যা আবদুর রহমান বাদশাহের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু দিনকয়েক পরেই আবদুর রহমান জয়নবকে দূতের সঙ্গে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটি পত্রে লিখলেন—আমার স্ত্রী জয়নবই আপনার সঙ্গে আমার সৌহার্দ্যের মধ্যে রেখাপাত করেছে। অতএব আমি তাকে আপনার করেই সমর্পণ করলাম।

আবদুর রহমানের চিঠি পড়ে ও জয়নবকে দেখে মৌজলাধিপতি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জয়নবের সঙ্গে প্রণয় স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু জয়নব দিবারাত্র আবদুর রহমানের বিরহে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগল। অবশেষে সে বাদশাহকে বলল—রমণীদের একটিমাত্র স্বামী থাকতে পারে এবং সে নারী একটি পুরুষকেই মন-প্রাণ সমর্পণ করে সে-ই সাধ্বী নারী। তাই আমি আশা করি, আপনি আমার সঙ্গে প্রণয়-স্থাপনের মিথ্যা চেষ্টা করবেন না।

এদিকে জয়নবের বিরহে মনের দুঃখে আবদুর রহমানের দিন

কাট্‌তে লাগল। পর পর অনেকগুলি ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেল। অবশেষে সে মৌজল নগরের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু তার আগমণ-সংবাদ ও সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মৌজলাধিপতি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে লোকের হাতে তার কাছে দুশো টাকা পাঠিয়ে তাকে ব্যবসা করতে বললেন। অগত্যা আবদুর রহমান তাই করলেন এবং তাঁর পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হল। এ সংবাদ শুনে বাদশাহ আবার তাঁকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন। এবারে আবদুর রহমানের দেড়শো টাকা লাভ হল। বাদশাহ আবদুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—তোমার এবার দুঃসময় কেটে গেছে। তাই এবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আপত্তি নেই। বাদশাহ জয়নবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন, এবং প্রচুর ধন-দৌলত দান করলেন। মনের সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

গল্পটি শুনে খলিফা হারুণ-অর-রশীদ ও তার পত্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করলেন।

পুরস্কার পেয়ে বৃদ্ধ বলল—খলিফা যদি অনুমতি করেন ত আমি আপনাদেরকে আর একটি ধর্ম প্রাণা নারীর কাহিনী শোনাতে পারি।

খলিফা অনুমতি দিলে বৃদ্ধ বলতে শুরু করল:

রেপসিমার কাহিনী

বহুদিন পূর্বে বসরা নগরীতে হুকিন নামে একজন ধনবান বণিক বাস করত। রেপসিমা নামে তাঁর এক কন্যা ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি কন্যাকে নানা-ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ফলে রেপশিমা কালক্রমে একটি ধর্ম প্রাণা ও বিবিধ সদগুণান্বিতা নারীতে পরিণত হল। বণিক মৃত্যুর পূর্বে তমিম নামে একজন সুন্দর যুবক বণিকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। ওই যুবকও ছিল রেপসিমার মতই সুন্দর ও ধর্ম-পরায়ণ. ফলে মনের সুখেই তাদের দিন কাটতে লাগল।

বিবাহের এক বৎসর পর তমিম বাণিজ্যের জন্য বিদেশের দিকে যাত্রা করল। যাত্রা করবার আগে সে নিজ ভাই রেভিস্তিকে ডেকে বলল—ভাই, আমি বাণিজ্য করতে বিদেশে যাচ্ছি। অতএব তুমিই রেপসিমার রক্ষণাবেক্ষণ ক'রো। ভাই এতে আনন্দের সঙ্গে সম্মত হলে তমিম বিদেশ-যাত্রা করল।

এইরূপে ভাইএর হাতে রেপসিমাকে সমর্পণ করে তমিম যাত্রা করলে, রেভিস্তি রেপসিমার অসাধারণ রূপ দেখে একদিন তার প্রণয় প্রার্থনা করল। কিন্তু রেপসিমা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলে রেভিস্তি তাকে জব্দ করবার জন্য তার নির্মল চরিত্রের বিরুদ্ধে

কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াতে লাগল এবং কাজীর কাছে নালিশ করল। কাজী রেপসিমাকে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় থাকতে আদেশ দিলেন। আজ্ঞা পেয়ে রেভিন্তি একটি সদর রাস্তার উপরে তাকে অর্ধপ্রোথিত করে রেখে গৃহে ফিরে এলো।

এদিকে মধ্যরাত্রে এক দস্যু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে রেপসিমাকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করল। রেপসিমা বলল—আমাকে মুক্ত করলে আল্লা তোমার ভাল করবেন। দস্যু তাকে মুক্ত করে নিজ পত্নীর কাছে এনে রাখল। ধর্মপ্রাণা দস্যু-পত্নী তার আদর যত্ন করতে লাগল।

এদিকে কালিদ নামে দস্যুর একটি ভৃত্য রেপসিমার রূপ দেখে তার কাছে প্রণয়-প্রস্তাব করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সে দস্যুর একটি পুত্রকে কেটে তার রক্ত ঘুমন্ত রেপসিমার কাপড়ে লাগিয়ে রাখল। পরদিন সকালে দস্যু-পত্নী যখন কাঁদতে লাগল কালিদ তখন রেপসিমাকে দেখিয়ে বলল—ওর কাপড়ে যখন রক্ত তখন ওই বোধ হয় হত্যাকারিণী। কিন্তু দস্যু-পত্নী তা বিশ্বাস না করে রেপসিমার হাতে একশো স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে বলল—নিশ্চয়ই এ শয়তান কালিদের অপকর্ম। তুমি আজই এখান থেকে পলায়ন কর বোন, না হলে বিপদে পড়বে।

তখন অনন্যোপায় হয়ে রেপসিমা রওয়ানা হল এবং কিছুদুর গিয়ে দেখল একজন যুবকের মৃত্যু-দণ্ড হতে চলেছে। সে এর কারণ

জিজ্ঞাসা করলে রাজকর্মচারী বলল—পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা ধার করে শোধ না করায় এর মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে। রেপসিমা তখন নিজ টাকা থেকে পঞ্চাশটি স্বর্ণ-মুদ্রা তাদের হাতে দিতেই যুবকটি মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়ে সে রেপসিমাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়েই তার প্রণয়-প্রার্থনা করল। রেপসিমা ক্রুদ্ধ হয়ে তা অস্বীকার করায় সে নিকটস্থ একটি জাহাজের অধ্যক্ষকে গিয়ে বলল—আমার একটি নারীকে আমি বিক্রয় করব। অধ্যক্ষ তার সঙ্গে এসে রেপসিমাকে দেখে মুগ্ধ হল এবং যুবকের হাতে পাঁচশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রেপসিমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলল।

জাহাজের অধ্যক্ষ পরদিন রেপসিমার প্রণয়-প্রার্থনা করলে সে অস্বীকৃত হল। তখন সে জোর করে রেপসিমার সতীত্ব-নাশ করতে উদ্যত হল। কিন্তু খোদার কৃপায় সেই সময়ে প্রবল এক ঝঞ্ঝায় জাহাজটি ডুবে গেল এবং অধ্যক্ষ পানিতে ডুবে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কিন্তু রেপসিমা একটি কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপে গিয়ে উঠল। এই দ্বীপটা ছিল একটি রাণীর শাসনাধীনে। তিনি রেপসিমার কাহিনী শুনে এবং তার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তাকে নিজ বোনের মত পালন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাণীর মৃত্যু হলে প্রজারা রেপসিমাকেই তাদের রাণীর পদে বরণ করল। ধর্ম ও খোদার-কৃপায় রেপসিমা যাকে যা বলত সেই কথাই সত্যে পরিণত হত। এতে সে প্রজাদের প্রিয় রাণী হয়ে উঠল। দেশ-বিদেশ থেকে বহুলোক রোগগ্রস্ত হয়ে তার কাছে আসত আরোগ্য হবার আশায়।

একদিন রেপসিমা রাজ-সিংহাসনে বসে আছে, এমন সময় শুনতে পেল কয়েকজন লোক তার দর্শন-প্রার্থী। রেপসিমা নিজ মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করে তাদের আসতে বলল। প্রথম ব্যক্তি এসে বলল—আমার ভাইয়ের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমার প্রিয়তমা পত্নীর অসতীত্ব দেখে সে কাজীর কাছে যায় এবং কাজী তার প্রাণদণ্ড দেন। সেই শোকে কাঁদতে কাঁদতেই ও অন্ধ হয়ে গেছে। রেপসিমা দেখল এরা দু'জন তমিম এবং তার ভাই রেভিন্তি। রেপসিমা তাদের আশ্বাস দিয়ে পরদিন আসতে বলল। তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি এসে বলল—আমার ভৃত্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। রেপসিমা দেখল, এ সেই দস্যু ও তার শয়তান ভৃত্য। রেপসিমা তাদেরও পরদিন আসতে বলল। অবশেষে পঞ্চম ব্যক্তি এসে বলল—আমার প্রাণদাত্রীকে আমি এক জাহাজের অধ্যক্ষের কাছে বিক্রয় করেছিলাম, ফলে আমি উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হয়েছি। রেপসিমা দেখল এ সেই লোক, যাকে সে পঞ্চাশ মুদ্রা দিয়ে রক্ষা করেছিল। রেপসিমা তাকেও আসতে বলল।

পরদিন সভায় সকলে সমবেত হলে রেপসিমা বলল—প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাহিনী অকপটে খুলে বল, নইলে আরোগ্যের আশা নেই। সত্য কাহিনী বললে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্যলাভ করবে। এ কথা শুনে প্রথমে রেভিন্তি সত্যি কথা খুলে বলল। তার কাহিনী শুনে তমিম তাকে তক্ষুণি খুন করতে উদ্যত হলে রেপসিমা কৌশলে তাকে নিবৃত্ত করল। অতঃপর দস্যুর ভৃত্য তার কাহিনী খুলে বলল। দস্যু তার প্রাণনাশ করতে গেলে রেপসিমা তাকেও নিবৃত্ত করল। সব শেষে

সেই লোকটিও তার নিজের কাহিনী খুলে বলল। তখন সকলেই আপন আপন ব্যাধি-মুক্ত হয়ে গেলে রেপসিমা মুখের আবরণ খুলে ফেলল। তমিম তাকে দেখে আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অবশেষে তার জ্ঞান ফিঁরে এলে রেপসিমা সকলকে বলল—পৃথিবীর মধ্যে ধর্মই সবচেয়ে বড়। ধর্ম-পথে মতি থাকলে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। এই বলে রেপসিমা সকলকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করল এবং মনের সুখে স্বামী ও দেবরকে নিয়ে রাজত্ব করতে লাগল। অতঃপর শুভদিনে রেপসিমার একটি সুন্দরী প্রধানা সহচরী নারীর সঙ্গে সে দেবর রেভিস্তির বিবাহ দিয়ে দিল।

এইভাবে রেপসিমার কাহিনী শেষ করে বৃদ্ধ বলল—খলিফা যদি অনুমতি করেন ত আমি আপনাদের আর একটি ধর্মপ্রাণ পুরুষের কাহিনী শোনাতে পারি।

খলিফা অনুমতি দিলে বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করল।

আবুল ফাউরিসের প্রথম বানিজ্য যাত্রা

বসরা দেশে একজন বণিকের এক পুত্র ছিল। তার নাম আবুল-ফাউরিস। তার পিতা নিজ অধ্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছিলেন! সেই সময় আবুল ফাউরিস পিতার সঙ্গে নানা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে বিভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপ চিনেছিল। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তার পিতা বিদেশ-ভ্রমণে অসমর্থ হলে আবুল ফাউরিসকে বলল—বৎস সিংহলে মিগ্‌নেয়ার হাবিব নামে যে একজন বণিক আছে, তার সঙ্গে হিসাবপত্র পরিষ্কার করবার জন্য তোমার একবার সিংহলে যাওয়া প্রয়োজন।

এ কথায় আবুল ফাউরিস আনন্দিত মনে সম্মতি জ্ঞাপন করল। অল্পদিনের মধ্যেই সে সিংহলের দিকে যাত্রা করল এবং সেখানে নিরাপদে গিয়ে উপস্থিত হল। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে তার সমস্ত কাজকর্ম শেষ হয়ে গেল। অতঃপর একদিন আবুল ফাউরিস বিকেলের দিকে হাবিবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার বাড়ীর দিকে চলেছে, এমন সময় দেখতে পেল অত্যন্ত সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিতা একটি রমণী তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে আনন্দিত হয়ে আবুল ফাউরিস বলল—আহা, কি সুন্দর মূর্তি। বোধ হয়, এই সৌন্দর্যময়ী কোনও

সাঁ

রাজার কন্যা।

নারী তার কথা শুনে তার দিকে একবার ফিরে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেই নারীর একজন ভৃত্য আবুল ফাউরিসের কাছে এসে বলল—আজ রাত্রে আমার কর্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আপনার কোন ভয় নেই। আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

আবুল ফাউরিস জিজ্ঞাসা করল—তোমার কর্ত্রীর বাড়ী এখান থেকে কতদূর?

ভৃত্য বলল—এই নগরের প্রান্তে যে বিশাল অট্টালিকা আছে সেই বাড়ীতেই তিনি বাস করেন।

আবুল ফাউরিস বলল—বেশ, তোমার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আজ রাত্রে তুমি এসো। আমি তোমার সঙ্গে তোমার কর্ত্রীর কাছে যাব।

আবুল ফাউরিসের দেশের দিকে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেই অপূর্ব সুন্দরী নারীর সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা তাকে আরও কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকতে বাধ্য করল।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর সে নগরের প্রান্তে সেই বিশাল বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। তাকে বাড়ীর ভিতরে সুন্দর একটি কক্ষে অপূর্ব সৌন্দর্যময় একটি সিংহাসনের উপরে বসান হল। তার কিছুক্ষণ

[illegible] সঙ্গীর সঙ্গে সেই অপূর্ব-সুন্দরী নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আবুল ফাউরিসের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সে বলল—আপনি যে আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন এজন্যে আমি নিজকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করছি। কিন্তু কি জন্য আমার মত হীন ব্যক্তিকে এখানে আহ্বান করেছেন তা আমি জানি না। আপনি দয়া করে আপনার পরিচয় ও আমার প্রতি আপনার এ দয়ার কারণ ব্যক্ত করুন।

সুন্দরী বললেন—প্রথমে আপনার পরিচয় দিন, তারপর আমি আমার সম্বন্ধে সব কথা বলছি।

আবুল ফাউরিস নিজের পরিচয় এবং দ্বীপে আগমন সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলে বললে সুন্দরী বলতে আরম্ভ করলেন—আমি এদেশের একজন অমাত্যের কন্যা। আমার নাম খাঁজাদা। কিছুদিন পূর্বে আমার পিতার মৃত্যু হলে আমার রূপ-লাবণ্য দর্শনে ও আমার পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় অনেকেই আমাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে কাউকেই বিবাহ করিনি। তাদের মধ্যে কাউকেই আমার সত্যিকারের সুন্দর বলে মনে হয়নি। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন সত্যিকারের সুন্দর একটি পুরুষকে দর্শন করলাম। অন্য কেউ এভাবে প্রকাশ্যে আমার রূপের সমালোচনা করলে আমি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতাম। কিন্তু আপনার সৌন্দর্য

দেখে তা ত' দিলামই না, উপরন্তু আমার এই রূপ-যৌবন ও সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিশ্বর আপনি হোন, এই আমার ইচ্ছা।

খাঁজাদার কথা শুনে কিছুক্ষণ আবুল ফাউরিস বিস্ময়ে কথা বলতে পারল না। অবশেষে বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কাটল। সে তখন সুন্দরীর সঙ্গে নানাকথা বলতে লাগল। পরে খাঁজাদার আদেশে বারোজন ভৃত্য নানাবিধ সুখাদ্য ও সুরা এনে তাদের সামনে উপস্থিত করল। খাঁজাদা নিজের হাতে সেই সব খাদ্য আবুল ফাউরিসকে খাইয়ে বললেন—আপনি আজ রাত্রির মত বিশ্রাম করুন। আমি আমার শয়ন কক্ষে যাই।

এইভাবে আবুল ফাউরিস সাত রাত সুন্দরীর সঙ্গে কাটাল বটে, কিন্তু সুন্দরী একদিনের জন্যও তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করল না। অবশেষে সপ্তম দিনের শেষে সে বলল—আবুল ফাউরিস, এতদিনে বুঝতে পারলাম তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাস। তাই কাল তোমার সঙ্গে আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব।

সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে আবুল কাউরিসের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিবাহে তার অমত ছিল। তার কারণ এই যে, খাঁজাদা পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী, আর আবুল কাউরিস নিজে ইসলাম ধর্মের উপাসক।

আবুল কাউরিস কারণ খুলে বললে সুন্দরী হেসে বলল—সেজন্যে ভাবনা কি? সে বিষয়ে আমি আগেই চিন্তা করেছি। তুমি মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে আজই পৌত্তলিক-ধর্মে দীক্ষিত হবে।

কাউরিস বলল—না আমি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও ধর্ম-ত্যাগ করতে পারিনা। তুমিই বরং ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা নাও। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হলেই আমরা এ দেশ ত্যাগ করে স্বদেশের দিকে যাত্রা করব।

সুন্দরী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—এটা কখনই প্রেমিকের যোগ্য কথা নয়। তুমি নিশ্চয়ই তবে এতদিন আমার সঙ্গে ছলনা করেছ। সত্যিই যারা প্রেমিক, তারা প্রেমিকার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

এইভাবে দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদ চলল। কিন্তু সুন্দরী কিছুতেই আবুল-কাউরিসকে রাজী করাতে পারল না। তখন সে রেগে তাঁর দু'জন প্রহরীকে বলল—একে বন্দী করে নীচের কক্ষে রেখে দাও। এইভাবে বন্দী অবস্থায় আবুল কাউরিস তিনদিন ও তিন রাত্রি যাপন করল।

চতুর্থ দিনে সুন্দরী তাকে একটি জাহাজের অধ্যক্ষের কাছে বিক্রি করল। জাহাজের অধ্যক্ষ তাকে কিনে নিয়ে নিজের জাহাজে তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল। এইভাবে পিতামাতার কাছ থেকে বহুদূরে আবুল কাউরিস এক অচেনা স্থানের দিকে চলল।

জাহাজের অধ্যক্ষের সাথে আবুল ফাউরিস খুব ভাল ব্যবহার করত। এজন্য আবুল ফাউরিস তার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এইভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে তারা অধ্যক্ষের নিজের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। জাহাজের অধ্যক্ষের একটি সুন্দরী কন্যা ছিল তার নাম ফকরন্নিসা। অধ্যক্ষ তার সঙ্গে আবুল ফাউরিসের

বিবাহ দেবেন মনস্থ করলেন। আবুল ফাউরিস কি করিবে চিন্তা করছে এমন সময় ফকরন্নিসা একদিন তার সঙ্গে দেখা করে বলল—আপনি পিতার সিদ্ধান্তে ভয় পাবেন না। আমি এক ধনি বণিক পুত্রকে ভালবাসি। কিন্তু বাবার সঙ্গে বনিকের বিবাদ আছে বলে বাবা তার সঙ্গে বিবাহ দিতে চান না। আপনি আমাকে বিবাহ করুণ। পরদিনই আমি চলে যাব। আপনি বাবাকে বলবেন যে, আমি পালিয়ে বণিকপুত্রের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে পুনর্বিবাহ করেছি। তাই আপনি আমাকে আর ফিরে নিতে সম্মত হবেন না। অগত্যা বাবা উক্ত বণিকের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করবেন।

এতে আবুল ফাউরিস খুব আনন্দিত হয়ে ফকরন্নিসার কথামত কাজ করল। পরদিন বণিকের সঙ্গে জাহাজের অধ্যক্ষের সদ্ভাব স্থাপিত হল। আবুল ফাউরিস এই সদ্ভাব স্থাপনের মূল কারণ বুঝতে পেরে অধ্যক্ষ আনন্দিত মনে তাকে মুক্তি দিল ও প্রচুর অর্থাদি দিল। খাঁজাদার জন্য আবুল ফাউরিসের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সে পরদিন অর্থাদি নিয়ে সিংহলের দিকে যাত্রা করল।

কিন্তু যে দিন সে সিংহলে ফিরে এল সেদিন সে শুনতে পেল, খাঁজাদার এক বৃদ্ধ অমাত্যের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমন সময় একদিন সে খাঁজাদার সেই প্রিয় ভৃত্যকে দেখতে গেল।

আবুল ফাউরিস তাকে বলল—তোমার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলো যে আমি তাঁর বিরহে অসহ্য দুঃখে কালযাপন করছি।

আমার ধন-দৌলতের প্রতি কোনও মোহ নেই। শুধু তাঁকে পেলেই আমার জীবন ধন্য হবে। ভৃত্য এ কথা কর্ত্রীকে জানাবে বলে চলে গেল।

কিন্তু পরদিনই এক অঘটন ঘটল। আবুল ফাউরিস শুনতে পেল যে, সেই দেশের এক অমাত্যের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর প্রিয় পত্নী পতীর সঙ্গে একই চিতায় সহমৃত্যু হবেন। এটাই ছিল সেই দেশের প্রথা। আবুল ফাউরিস অন্যান্য লোকদের সঙ্গে শ্মশান ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সে কেবল এই অমাত্যের স্ত্রী আর কেউ নয়, স্বয়ং খাঁজাদা। এইভাবে খাঁজাদা তার চোখের সামনে অগ্নি-দগ্ধ হবে? দুঃখে আবুল ফাউরিসের চোখ দিয়ে অঝোর-ধারে পানি পড়তে লাগল। একটু পরেই খাঁজাদা চিতায় গিয়ে উঠল এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। মনের দুঃখে আবুল ফাউরিস বাড়ীতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে রইল। সারাদিন সারারাত তার অভুক্ত অবস্থায় কেটে গেল। সে না খেয়ে তিলে তিলে এইভাবে জীবন-বিসর্জন দিবে বলে স্থির করল।

কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে খাজাদার সেই ভৃত্য এসে তার সঙ্গে দেখা করে বলল—এভাবে আপনি তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছেন কেন?

আবুল ফাউরিস বলল—তোমার কর্ত্রীকে না পেয়ে আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে। আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ?

ভৃত্য বলল—আপনি যদি কর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তবে

এক্ষুণি আমার সঙ্গে চলে আসুন।

মনের আনন্দে আবুল ফাউরিস ভৃত্যের সঙ্গে শ্মশান-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখল, খাঁজাদা হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আবুল ফাউরিস বলল—আমি দেখলাম আমার চোখের সামনে তুমি চিতায় অগ্নি-দগ্ধ হলে, কিন্তু তারপর বেঁচে উঠলে কি করে ?

খাঁজাদা বলল—আমি ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থাদি দিয়ে চিতার তলদেশে বিরাট একটা সুরঙ্গ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলাম। স্বামীর মৃত্যু হলে আমি চিতায় উঠলাম বটে, কিন্তু সেটা শুধু লোকের চোখে ধুলি দেবার জন্য। আমি যথারীতি সুরঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে এসে এই কুটীরে আশ্রয় নিয়েছি। এখন আমি ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে তোমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত, কেননা আমি বুঝেছি যে, তুমি সত্যিকারের প্রেমিক। কিন্তু আমার পিতার সম্পত্তি তুমি পেলে না এই যা দুঃখ।

আবুল ফাউরিস এ কথা শুনে হেসে বলল—আমি যে তোমাকে পেয়েছি, এতেই আমার জীবন ধন্য। অর্থাদির প্রতি আমার কোনও লোভ নেই।

সেইদিনই খাঁজাদার সঙ্গে আবুল ফাউরিসের বিবাহ হল এবং আবুল ফাউরিস খাঁজাদাকে নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করল। অতঃপর মনের সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

এইভাবে আবুল ফাউরিসের প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা-শেষ করে বৃদ্ধ আবার দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা বলতে শুরু করল।

আবুল ফাউরিসের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা

খাঁজাদাকে নিয়ে আবুল ফাউরিসের দিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাটতে লাগল। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। কিছু দিন পরেই আবুল ফাউরিসের বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হল। সে তখন তার পিতার সম্পত্তি তার একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে সমানভাবে বণ্টন করে নিল।

কিন্তু আবুল ফাউরিসের ভাই নিজের সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করবার আশায় কিছুদিন পরই বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করল। বসরা থেকে যে একখানা জাহাজ ছাড়ছিল সে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে জিনিষ পত্রাদি কিনে সেই জাহাজে চেপে বসল। কিন্তু তার ভাগ্য ছিল তার প্রতিকুলে। দিনকয়েকের মধ্যেই প্রবল ঝড়ে তাদের জাহাজ ডুবে গেল। অনেক কষ্টে তার জীবন রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তাকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে হল। সে তখন দেশে ফিরে এসে সব কথা আবুল ফাউরিসকে খুলে বলল।

ভাইয়ের দুঃখে বিগলিত হয়ে আবুল ফাউরিস নিজ সম্পত্তির অর্ধেক তার ভাইকে দান করে বলল—তুমি আবার বাণিজ্য যাত্রা কর। এবার

সচিত্র পারস্য উ

হয়ত খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন।

আবুল ফাউরিসের ভাই আবার বাণিজ্যার্থে যাত্রা করল। কিন্তু এবারে জিনিসপত্রাদি বিক্রয় করে তার প্রচুর লোকসান হল। তখন সে ফিরে এসে নিজের অদৃষ্ট খারাপ মনে করে চুপচাপ বসে রইল। ধীরে ধীরে সে এত অলস হয়ে পড়ল যে, আর বাণিজ্য করা তার দ্বারা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হল।

আবুল ফাউরিস কিন্তু এবার যথেষ্ট অসুবিধায় পড়ল। ভ্রাতাকে দিতে দিতে তার অর্থও নিঃশেষ হবার উপক্রম হল। সে তখন নিজেই ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বাণিজ্যার্থে বের হবে বলে স্থির করল। তারপর সে খাঁজাদাকে তার ভাইয়ের কাছে রেখে বলল—তুমি এর তত্ত্বাবধান ক'রো।

আবুল ফাউরিসের প্রতি তার ভাইয়ের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তার ধারণা ছিল যে আবুল ফাউরিস নিজে বাণিজ্য-যাত্রা করলে অবশ্যই লাভবান হবে। সে তখন আনন্দিত মনে বলল—ওঁর যাতে এতটুকুও কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। আপনি নিজে বাণিজ্যার্থে বের হলে অবশ্যই লাভবান হবেন। কেননা আল্লা আপনার সহায়।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবুল ফাউরিস পরদিন একটি জাহাজে চড়ে প্রচুর মালপত্রাদি কিনে বাণিজ্যার্থে বের হয়ে পড়ল।

প্রথম তিনদিন অনুকুল বাতাসে জাহাজ সুন্দরভাবে চলতে লাগল। কিন্তু চতুর্থ দিনে তারা একটা দ্বীপের নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখল বিরাট দেহ একটি মানুষ পানিতে ভাসছে। জাহাজটিকে আসতে দেখে সে হাত পা ধীরে ধীরে নাড়তে লাগল। জাহাজের ক্যাপ্টেন তখন তাকে জাহাজে তোলবার আদেশ দিলেন। লোকটাকে জাহাজে তোলা হলে সে ধীরে ধীরে বসে বলল—আমি এভাবে পনেরোদিন পানিতে পড়ে থাকলেও আমার মৃত্যু হত না। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় আমার মৃত্যুর উপক্রম হয়েছে। আপনি শীঘ্র কিছু খেতে দিন।

জাহাজের ক্যাপে্‌টেন তখন একজন লোককে প্রচুর খাবার আনবার আদেশ দিলে সে প্রায় চারজন লোকের উপযুক্ত খাদ্যাদি এনে লোকটার সাম্‌নে রাখল। কিন্তু কয়েক মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করে দিয়ে লোকটি আরও খাদ্য আনতে বলল।

এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়-বার সমপরিমাণ খাদ্য নিঃশেষ করে লোকটি বলল—আরও খাদ্য নিয়ে এস।

তখন জাহাজের ক্যাপটেন বললেন—এখন তুমি আর খেতে পাবে না। এত খেলে জাহাজের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।

একথা শুনে লোকটির মুখ ক্রোধে রক্ত বর্ণ ধারণ করল—সে রেগে গিয়ে বলল—এক্ষুণি আরও খাদ্য নিয়ে আয়। না হলে

তোদের উচিত শাস্তি দেব। কিন্তু খালাসীরা কেউ যখন আর খাদ্য আনতে গেল না, তখন সে রেগে উঠে নখরাঘাতে একজন লোকের নাড়িভুঁড়ি চিরে তাকে মেরে ফেলল। তখন সকলে একসঙ্গে তরবারি নিয়ে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু সেই লোকটির দেহের চামড়া এমনি মোটা যে তরবারি তার দেহে বিঁধল না। সে তখন তরবারি ছুরে ফেলে দিয়ে বলল—শীঘ্র আরও খাদ্য আন, না আনলে সকলকে ওই লোকটির মত মেরে ফেলব। তখন প্রচুর খাদ্য এনে তাকে শান্ত করা হল।

কিন্তু ঘণ্টাদুয়েক বাদেই আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক হল। জাহাজের লোকেরা নিরুপায় হয়ে আবার তার খাদ্য এনে দিল। তখন ক্যাপটেনের ঘরে সকলে পরামর্শ করতে বসল। দু'দিনের মধ্যেই জাহাজের রসদ ফুরিয়ে গেলে কি উপায় হবে। তখন সকলে যুক্তি করল, রাত্রে ও ঘুমোলে ওকে পানিতে ফেলে দেওয়া হবে।

সকলে এরূপ যুক্তি করল বটে, কিন্তু তাকে আর পানিতে ফেলবার প্রয়োজন হল না। সেদিনই বিকেলে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। সকলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল সেটা মেঘ নয়—বিরাট একটা রক পাখি। এই অঞ্চলে রক নামে যে পাখিরা বাস করে তারা এত বিশাল যে একটা হাতীকে পর্যন্ত ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যেতে পারে। রক পাখিটা এসেই ছোঁ মেরে পিশাচটাকে শূন্য তুলে নিল। তখন আকাশপথে দু'জনের মধ্যে

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। আধঘণ্টা যুদ্ধের পর রকপাখি এবং পিশাচ দু'জনে নিহত হয়ে সমুদ্রের বুকে পড়ল। এইভাবে তারা পিশাচের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু পঞ্চম দিনে সমুদ্রের বুকে অকস্মাৎ এক প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের বেগে জাহাজটি পথ হারিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তারা একটি পাহাড়ের সংলগ্ন দ্বীপে এসে লাগল।

দ্বীপটির দিকে চেয়ে একজন বৃদ্ধ নাবিক বলল—সর্বনাশ এ অতি ভয়ানক দ্বীপ! এই দ্বীপে এসে লাগলে আর ফিরে যাওয়া যায় না বলে শুনেছি।

দ্বীপের মধ্যে যে পাহাড়টি ছিল তার মাথার উপরে ছিল একটি মন্দির। আবুল ফাউরিস অধ্যক্ষকে বলল—চলুন, আমরা ঐ মন্দিরে গিয়ে দেখি। আমার মনে হচ্ছে, এই মন্দিরে গেলে নিশ্চয়ই ফিরে যাবার কোনও উপায় পাওয়া যাবে। তখন তারা দু'জনে সেই মন্দিরে গিয়ে দেখল সেখানে একটি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে :

যে জাহাজ এই দ্বীপে এসে পড়বে তার ফিরে যাবার উপায় নেই, যাদুর প্রভাবে এই দ্বীপের এমনি গুণ। কিন্তু যদি কেউ এই মন্দিরের উপরে যে জয়ঢাক আছে তাতে তিনটি ঘা মারে তবে প্রথম আঘাতে জাহাজটি চলতে আরম্ভ করবে। দ্বিতীয় আঘাতে জাহাজ দৃষ্টির বাইরে যাবে এবং তৃতীয় আঘাতে জাহাজ ইচ্ছামত চলতে থাকবে। কিন্তু যে এই জয়ঢাকে আঘাত করবে তাকে এই দ্বীপেই থাকতে হবে।

আমরা জাহাজে ফিরে গিয়ে যখন এই কথা বললাম, তখন সকলেই আনন্দিত হল বটে, কিন্তু কে এই জয়ঢাকে ঘা মারবে তাই নিয়েই সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তখন আবুল ফাউরিস নিজে এই কাজ করতে রাজি হল। যথানিয়মে জয়ঢাকে আঘাত মারতেই জাহাজ দুরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু আবুল ফাউরিস পাহাড় থেকে নেমে এসে মহা চিন্তায় পড়ল। দেশের বুকে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় নেই। খাঁজাদার কথা মনে হতেই তার চোখ দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

পাহাড় থেকে নেমে এসে সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগল। হঠাৎ একটি ছোট পাহাড়ের নীচে এলে দেখা হল একজন বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলল—আমি একজন দৈত্য। কিন্তু তুমি এখানে একা এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?

দৈত্যের কাছে আবুল ফাউরিস তার কাহিনী খুলে বলল। দৈত্য বলল—ইব্রাহীম নামে এক যাদুকরের মায়ায় এ স্থানের এমনি অবস্থা হয়েছে। এমন সময় দৈত্যের আর দুই ভাই সেখানে এসে উপস্থিত হলে দৈত্য তাদের সঙ্গে আবুল ফাউরিসের পরিচয় করিয়ে দিল।

দৈত্যরা তাকে বলল—তুমি যদি আমাদের দাসত্ব করতে রাজী থাক তবে তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করে আমাদের দেশে নিয়ে যাই। আবুল ফাউরিস তাতে সম্মত হলে তারা তাকে দৈত্যপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে আবুল ফাউরিসের ভালভাবেই দিন কাটতে লাগল। পনর কুরিজন দৈত্য সেই পুরীতে বাস করত ! কিন্তু আবুল

ফাউরিস খোদার আরাধনা করলেই দৈত্যরা রেগে যেত। তারা ছিল অসদাচারী, অধার্মিক এবং নাস্তিক। তাদের সংস্পর্শে আবুল ফাউরিস যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

এইভাবে দিনকয়েক কাটাবার পর আর একদল দৈত্য হঠাৎ এই দৈত্যপুরী আক্রমণ করল? তারা নাস্তিক দৈত্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দৈত্যপুরী দখল করে ফেলল। তারা ছিল ধার্মিক এবং আল্লা বিশ্বাসী। তারা আবুল ফাউরিসের পরিচয় পেয়ে বলল—আমরা এসে না পড়লে আর কয়েকদিনের মধ্যেই শয়তানরা আপনার মত ধার্মিক লোককে বোধ হয় মেরে ফেলত। তাদের অধীশ্বর আবুল ফাউরিসকে খুব ভক্তি করত। কারণ, খোদা সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল সকলের চেয়ে বেশী। দৈত্যরা আবুল ফাউরিসকে তাদের ধর্মগুরুর পদে অভিষিক্ত করল।

এইভাবে দৈত্যপুরীতে কিছুদিন মনের আনন্দে কাটিয়ে আবুল ফাউরিস গৃহের দিকে যাত্রা করবে বলে মনস্থ করল। দৈত্যরা তখন একজন দৈত্যের পিঠে তাকে চাপিয়ে দিয়ে প্রচুর ধন ঐশ্বর্যাদি দিয়ে বিদায় দিল। দৈত্যের পিঠে চেপে আবুল ফাউরিস সে দিনই বসরা নগরে এসে উপস্থিত হল এবং শেষরাত্রে বাড়ীতে ফিরে এল।

কিন্তু বাড়ীতে এসে শুনতে পেল খাঁজাদা তাকে দীর্ঘদিন ফিরতে না দেখে তার মৃত্যু হয়েছে মনে করে মনের দুঃখে কাল কাটাচ্ছে। আর শহরের অন্য একজন ধনীপুত্র জোর করে খাঁজাদাকে বিবাহ

করবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। আবুল ফাউরিসকে পেয়ে খাঁজাদা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর দৈত্যদের প্রদত্ত অর্থরাশি দিয়ে তারা বিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করল এবং একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে আবুল ফাউরিসের ভাইয়ের বিবাহ দিল। তারপর তারা চারজনে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।

এইভাবে বৃদ্ধ আবুল ফাউরিসের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা শেষ করল।

গল্পটি শুনে হারুণ-অর-রশীদ ও তার পত্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করলেন।

* * *

এইভাবে ধাত্রী তার কাহিনী শেষ করলে রাজকন্যা ফরোখনাজের সখীরা একবাক্যে বলতে লাগল এরূপ সুন্দর গল্প আমরা জীবনে শুনি নাই। এতগুলি সুন্দর চরিত্র পৃথিবীতে ছিল জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি।

কিন্তু রাজকন্যা ফরোখনাজ কোন কথাই বললেন না।

তখন ধাত্রী রাজকন্যার অনুমতি নিয়ে গল্প বলা শেষ করলেন।

ফরোখনাজ

রাজকন্যার বিবাহ

এইভাবে ধাত্রী গল্পচ্ছলে রাজকন্যাকে অজস্র কাহিনী শুনিতে তাঁর মন থেকে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাব কাটিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের যে প্রচেষ্টা করেন অনেকাংশে তা সার্থক হয়ে উঠে। আদর্শবাদের একটা মোহ আছে। দেশ বিদেশের আদর্শ চরিত্রের কাহিনীগুলি রাজকন্যার অন্তরেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ক্রমে রাজকন্যাও গভীর ভাবে ভাবতে আরম্ভ করেন।

এমন সময় রাজকন্যা ফরোখনাজের ভ্রাতা কঠিন অসুখে পড়ল। তার মঙ্গলের জন্য ফরোখনাজ আল্লার কাছে প্রার্থনার জন্য এক মসজিদে গমন করল। সেদিন খোদার কাছে প্রার্থনাদি করে বাড়ী ফিরে এসে রাত্রে এক স্বপ্ন দেখে তার মন আকৃষ্ট হল। রাজকন্যা স্বপ্নে দেখল একটি হরিণ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছে, আর তার সঙ্গী হরিণীটি সভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

দেখে রাজকন্যার ভাব প্রবণ মনে এই ছবিটি কেমন যেন একটা নূতন রকমের আঘাত করল। স্বপ্নের এই ছবি তার মনের বদ্ধমূল

ধারণাকে আজ বুঝি পালটে দিল। রাজকন্যার মনে আজ প্রশ্ন জাগল—তাহলে ত শুধু পুরুষেরাই বিশ্বাসঘাতক হয় না, অনেক সময় নারীও ত বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীর মুখে শোনা গল্পের নায়ক নায়িকাদের কথা মনে পড়ল—যারা সত্যিকারের প্রেমিক ও প্রেমিকা তারা কখনও আদর্শ ছাড়া পথভ্রষ্ট হয় না। পরদিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন, এক দরবেশ এসে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—মা, বিবাহ হচ্ছে প্রকৃত ধর্মের পথ। প্রকৃতপক্ষে যে নারী একটি পুরুষকে ভালবাসে এবং যে পুরুষ একটি নারীকে ভালবাসে তারা জগতের আদর্শস্থল। তুমি এমনি পতিপ্রাণা মহিলা হিসাবে জগতের আদর্শ-দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। তুমি যদি এসম্বন্ধে মনস্থির কর তাহলে তোমার ভ্রাতা নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

রাজকন্যা ফরোখনাজ ধাম্মিক দরবেশের কথাগুলি চিন্তা করতে করতেই এই চিন্তাকেই করলে তার সাথী। সেদিন গভীর রাতে সে ঘুমের মধ্যে আবার একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখলো। অপূর্ব সুন্দর এক রাজপুত্র তাঁর শিওরে এসে দাড়িয়েছে। যাকে দেখবামাত্র ফরোখনাজ এরূপ মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে, তার মন-প্রাণ সবই তাকে নিঃশেষে স করে ফেলল। রাজপুত্র মৃদু হেসে বলল—আমি পারস্যদেশের তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী। আমার সঙ্গে তোমার শীঘ্রই বিবাহ তাই এভাবে আমাদের সাক্ষাৎকার হল। তোমার মনকে স সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্যেই এর আগে খোদা তো কে

স্বপ্ন দেখিয়ে তোমার মনে বিভ্রান্তি আনেন। তারই ফলে ধাত্রীর মুখে অজস্র গল্প শুনে তুমি সত্যিকারের আদর্শ নারীতে পরিণত হবার সুযোগ পাও। তাহারই ইচ্ছায় আজিকার এই স্বপ্ন তোমার মনের সমস্ত বিকার ঘুচিয়ে দিলে।

ঘুম ভেঙ্গে যেতেই রাজকন্যা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তার মনে হতে লাগল, সেই পরম সুন্দর রাজকুমারের মূর্তি যেন চোখের সামনে ভাসছে, তার মধুর কথাগুলির রেশ এখনো কানে বাজছে। হাত মুখ ধুয়েই তিনি পিতৃসকাশে গিয়ে বললেন—বাবা, পারস্যদেশের রাজপুত্রের সঙ্গেই আমার বিবাহ হবে।

রাজকন্যার কথা অনুসারেই রাজা পরদিনই পারস্যদেশে দূত পাঠালেন। নির্দিষ্ট দিনে ফরোখনাজ রাজকন্যার সঙ্গে পারস্যদেশের রাজপুত্রের বিবাহ হয়ে গেল।

রাজকন্যা ফরোখনাজ দেখলেন, এই রাজপুত্রই তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই রাজকুমার। তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করতে লাগলেন।

রাজা খুশী হয়ে বিবাহের দিন ধাত্রীকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

রাত্রে

একটি

আর তা

দেখে

নূ

কি